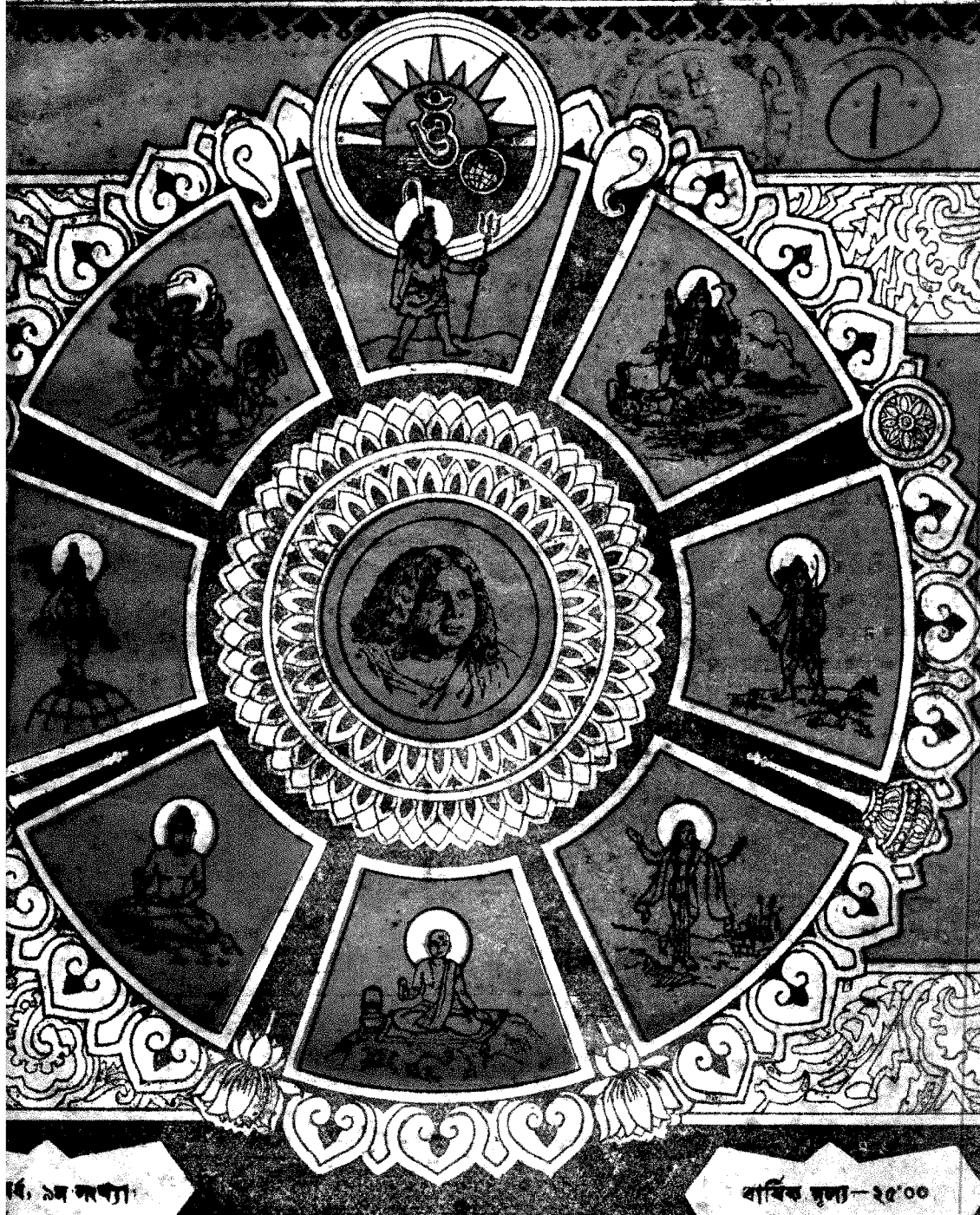


স্বত মেবাপ্রম সঙের মাগিক মুখপত্র

আজকাল

ধর্ম ও জাতীয়তার বাণী



নভেম্বর ধর্ম ও জাতীয়তামূলক গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীআচার্যদেবের জীবনী ও বাণীগুচ্চক	বারো মাসে তেরো পারগ কি ও কেন ?	১০.০০	অঞ্জলি সভ্য-সঙ্গীত চরিত্র এ স্বরলিপি
বৃগাচার্য জীবন-চরিত্র ৪৫.০০	হিন্দু ধর্মের মারত্ব	৪০.০০	
শ্রীশ্রীআচার্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত ২০.০০	Essence of Hinduism	75.০০	
মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী প্রণবানন্দ ১০.০০	গুরুপূজা ও গুরুভক্তিমূলক		বিবি
কণ্ঠে কণ্ঠে করুণা কথা ১ম খণ্ড ৮.০০	শ্রীশ্রীসদগুরু	৭.০০	হিন্দু নারীর আদ
২য় খণ্ড ৮.০০	অগ্নিহোত্র	২.০০	মুদ্রাধর্ম
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ শতরূপেশ তত্ত্বমুখ ১ম ২৫.০০	গঙ্গামাহাত্ম্য ও		শ্রীশ্রীসজ্জবানী
২য় খণ্ড ৩০.০০	গঙ্গামাগর তীর্থের কথা	৩.০০	কুব ভারত
৩য় খণ্ড ৩০.০০	গঙ্গা মাহাত্ম্য ও কুতা	৪.০০	শিবদ্বন্দ্ব মাধক স্বামী
শ্রীগুরুসঙ্গ ও শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে ৪০.০০	ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনমূলক		সাহিত্য
প্রণবানন্দোপদেশ ২.০০	হিন্দুধর্ম	৫.০০	সভ্য-মাধক চরিত্র
ভক্তগুরু প্রণবানন্দ ৭.০০	হিন্দু হাশিয়ার	৫.০০	খ্রিস্টসত্ত্ব ও খ্রিশ
শিবদ্বন্দ্ব প্রণবানন্দ ৪.০০	চেতনার ভাষে হিন্দু	৮.০০	গণপ্রথা সমাজের
দল্লগীতা ২০.০০	হিন্দুধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য	১৬.০০	
প্রণবানন্দ বৃত্তিচয়ন ১০.০০	মহাকাব্য গঠনে হিন্দুধর্ম	১৪.০০	
Reflections on Hinduism 15.০০	শ্রীচক	২.০০	শ্রীশ্রীআচার্য
Ten Divine Messages 9.00	আদর্শ শিক্ষাপ্রচারমূলক		জীবনমলীনা
Foundation of Religion 10.00	Ideals of Indian		বড় বসাকুটো
The Divine Life Bullder 5.00	Education & Culture 35.00		ছোট বসাকুটো
Acharya Pranabavanda 20.00	ছাত্রাধিকার	১২.০০	খ্রিশূল হাতে " (
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও	এ ২য়	১২.০০	খ্রিশূল হাতে " (
শ্রীশ্রীপ্রণব হঠ ৮.০০	আদর্শ বিজ্ঞানী	৭.০০	লকেট
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ ১২.০০	শিক্ষা সমস্যার সমাধানকোষপত্রঃ ১৫.০০		লকেট
শতাব্দীর নবজাগরণ ও	শাস্ত্রীয় গ্রন্থ		হিন্দী ও
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ১.০০	ক্রিয়ান্তরবদ্বীতা	৪০.০০	জীবন-চরিত্র
আত্মগঠনমূলক	ঐ গুরুস্বামী ভাস্কর	২৮.০০	বাণী ও নির্দেশ
ব্রহ্মচর্যম	শ্রীশ্রীগুরুগীতা	১৫.০০	ভারত য়ে গুরুপুত্র
মার্কিভাস	গুরুস্বামী রামায়ণ	১২.০০	হিন্দুধর্ম
কীর্ত্ত সাধনার পথে ১০.০০	গুরুস্বামী মহাভারত	১২.০০	ব্রহ্মচর্যম
পথপ্রদর্শক	শিবদ্বন্দ্বের রামায়ণ	৩.০০	সজ্জবানী
সাধনমালা ৪.০০	শিবদ্বন্দ্বের মহাভারত	৫.০০	কবি প্রণবানন্দব
পথপ্রদর্শনমূলক করেতক্যামি প্রণব	জাতিদেব রামায়ণ	১০.০০	জীবন ব
স্বপ্নদেবী ও ভাষের বাচক ১০.০০	ঈশ্বরগীতা	১৪.০০	ঈশ্বর সাধনা কে
কুই দেবী ৮.০০	কবিতা ও গান		গঙ্গা মাহাত্ম্য ও
	কবিতা	১.০০	গঙ্গামাগর কী
	সত্যবিষয়	৪.০০	

জ্ঞানভাষ্য বিবরণ—ভাষ্যভাষ্য স্বতন্ত্র দিতে হয়। দশ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভি-পি-পি কব
ভিটিপথে পুরা ক্রম টিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—(ক) কলকাতা—কলকাতা-১১, কলিকাতা-১২, কোল-
(খ) কলকাতা-১১, কলিকাতা-১২, কোল-৩১-
(গ) কলকাতা-১১, কলিকাতা-১২, কোল-৩১-
(ঘ) কলকাতা-১১, কলিকাতা-১২, কোল-৩১-

(ঘ) কলকাতা-১১, কলিকাতা-১২, কোল-৩১-

প্রণব—পৌষ, ১৩৯৮

হুগলীপত্র

P 36,191

১। যুগবাণী	...	শ্রীশ্রীগাচার্য	৩২৩
২। জীবনের বাণী	...	সম্পাদক	৩২৪
৩। শ্রীশিবনামের আবির্ভাব	...	সম্পাদক	৩২৬
৪। শ্রীশ্রীগাচার্য-প্রসঙ্গ ও উপদেশামৃত	...	স্বামী আত্মানন্দ	৩৩০
৫। করুণা (কবিতা)	...	শ্রীহৃদীর গুপ্ত	৩৩২
৬। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ	...	শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	৩৩৩
৭। করুণা ভিক্ষা (কবিতা)	...	শ্রীঅজিত কান্তি সরকার	৩৩৬
৮। দেবতার দীপ হাতে	...	শ্রীবাজীরাও লেন	৩৩৭
৯। কঠোপনিষদ্	...	ডঃ দীতাননাথ গোস্বামী	৩৪০
১০। সংস্কৃতি	...	ডঃ হৃদীর কুমার রায়	৩৪৩
১১। গঙ্গাসাগর পুণ্য স্থান	...	শ্রীনরনারায়ণ চক্রবর্তী	৩৪৭
১২। হিন্দু জাতিগঠন কোন পথে ?	...	স্বামী বেদানন্দ	৩৪৯
১৩। হিন্দু-জগৎ : আশি লক্ষ বছরের ভারতীয় সভ্যতা	...	শ্রীপরমেশ চৌধুরী	৩৫৩
১৪। নব্যবার্তা	...		৩৫৫

প্রণবের নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি

১। বৈশাখে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক স্রোত ধায়। বার্ষিক চাঁদা পঁচিশ টাকা; প্রতি সংখ্যা দুই টাকা পঞ্চাশ পরমা ন্যায়।

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার রূপে পুরো নাম, ঠিকানা গ্রাহক নম্বর এবং নতুন গ্রাহক 'নতুন' কথাটি লিখবেন।

৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব থাকে—ওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় কঘরে খোঁজ নিন। বার বার থাকের গোলমাল হলে Post Master General, West Bengal Circle Calcutta-1 ঠিকানায় লিখুন।

৪। চাঁদার যেসবদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ দে। সেই অঙ্কসারে চাঁদা পাঠাবেন।

৫। প্রণব অফিসে এসে চাঁদা জমা দেওয়ার সময়—৭ থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মি: থেকে ৫-৩০।

৬। চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য বিল্লাই পোস্টকার্ড প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি

১। সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুরা-কীর্তি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখাপ্রকাশ করা হয়। লেখক-গণের মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক দায়ী নহেন। আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশিত হয় না।

২। রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করবেন। তা না হলে লেখা বিবেচিত হয় না।

৩। কাগজের একপিঠে দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখবেন। অম্পষ্ট ও ছর্বোধ্য হাতের লেখা গৃহীত হয় না।

৪। লেখক কপি রেখে তাঁর পুরো নাম ঠিকানা সহ লেখা পাঠাবেন। অননুমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। লেখার সাথে খাম, পোস্টকার্ড, ভাক টিকিট পাঠাবেন না। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানিয়ে দেব, কিন্তু লেখা ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে প্রত্যালাপের জন্য অস্বীকার করবেন না। ইতি—প্রণব সম্পাদক

FOR PEACE OF MIND

Whether an individual or a corporate body, an entrepreneur or a farmer you and your property are always exposed to various risks. The anxiety of a calamity, accident or burglary is always there haunting you and your own.

Now you have someone to whom you can transfer this risk.

Making your anxiety sure and providing you with a sense of well-being in return, is the very heart of

our business. We take over the risk that threaten your life and property, business and profits and convert them into a worry-free security. Valuable as it is, this peace of mind is easy to acquire, when you have the friendly guidance of National Insurance. To help you get the best protection anytime, anywhere. Get to know us. And get peace of mind.

NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD.

(A Subsidiary of General Insurance Corporation of India)

Head Office :—3, Middleton Street, Calcutta—700 071

Dedicated to a growing sense of security.

ପ୍ରଣବ

ଧର୍ମ କି ?

ତ୍ୟାଗ

ସଂଯମ

ସତ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ



ମହାପୁଣ୍ୟ କି ?

ବୀରତ୍ବ

ପୁରୁଷତ୍ବ

ମନୁଷ୍ୟତ୍ବ

ଯୁୟୁକ୍ତତ୍ବ

ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ

୬୫ତମ ବର୍ଷ, ନବମ ସଂଖ୍ୟା
ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୭୮

ସମ୍ପାଦକ—ସ୍ବାମୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ

{ ପ୍ରଣବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ୨୧୧, ରାମବିହାରୀ
ଏଭିନିଉ, କଲି-୧୨, ଫୋନ ୫୦୫-୧୭୮

ଯୁଗବାଣୀ

“ସଂଯମଇ ସାଧୁର ପ୍ରକୃତ ଆହାର । ସଂଯମଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଳ, ସଂଯମଇ ଶୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ।
ସଂଯମଇ ମାନୁଷକେ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରେ । ସଂଯମଇ ମାନୁଷର ଅନ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ଉତ୍ସାହ ଓ
ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଆନିଆ ଦେଇ, ସଂଯମଇ ମାନୁଷକେ ଦୃଢ଼ତା ଓ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦାନ କରେ । ସୂତରାଂ, ସଜ୍ଜ-
ସନ୍ତାନଗଣ ସର୍ବଦା ସଂଯମକେ ଜୀବନପଥେ ଆକୃଷ୍ଟାୟିତା ଧରିଆ ଥାକିବେ ।”

—ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ

জীবনের বাণী

[সম্পাদক]

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।
অশ্রু অবয়বভূতৈঃ তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ।
ঈশসূত্র বিরাক্তবেশাঃ বিশ্বরূপেভ্যশ্চৈব ।
বিশ্বভৈরব মৈরাল মারিকাঃ যক্ষরাক্ষসঃ ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ গবাক্ষমৃগপক্ষিণঃ ।
অশ্বখবটচূত দগাঃ যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥
জলপাষাণমৃৎ কাষ্ঠবাস্তুকুন্দালকাদয়ঃ
ঈশ্বর সর্ব এব এতে পূজিতাঃ কলদায়িন ॥
বঙ্গানুবাদ

প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলে জানবে। অতএব, এই সকলই মহেশ্বরের অবয়বভূত। সমস্ত জগৎ সেই মহেশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত।

অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ, বিরাক্ত, বেশা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিশ্বভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগপক্ষী, অশ্বখ, বট, আম্র, যব, ব্রীহি, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাস্ত, কুন্দালক—প্রত্যেকটিকে ঈশ্বরস্বরূপ ভেবে পূজা করলে ফল পাওয়া যায়।

ভাবানুধ্যান

অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব বিবক্ষিত। প্রকৃতিকেই মায়া বলে। এই মায়া পরমেশ্বর থেকে স্বতন্ত্র নয়। এই মায়া পরমেশ্বরেরই। তিনিই মায়ী। এই মায়া বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। বস্তুতঃ এই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ সেই পরমেশ্বরই। তিনিই জগৎ সৃষ্টিপূর্বক তৎসৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর ভিতরে উপহিত। সুতরাং, এই দৃশ্যমান জগতে যা কিছু দেখেছো বা উপলব্ধি করছো তা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর থেকে স্বতন্ত্র নয়। হিরণ্যগর্ভই বল, আর বিরাক্তই বল,

বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র অগ্নি আদি দেবতার কথাই বল, কিং দেবতেশ্বর বিশ্ব, মৈরাল, মারিক, ভৈরব, যক্ষ-রাক্ষসাদির কথাই বল, অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চতুর্বর্ণের কথাই বল, অথবা গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যোত্তর প্রাণিগণের কথাই বল, কিং অশ্বখ বট আম্রাদি মহীকুল বা যব ধান্য তৃণা স্বল্পজীবী শস্যাদির কথাই বল, অথবা জল, পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্ত, কুন্দালক প্রভৃতির প্রসঙ্গই উঠুক—সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সকল বস্তুর ভিতরই বিরাজমান। তিনি ছাড়া কিছুই নেই। এই জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

কিন্তু এই জ্ঞানে সকলে প্রতিষ্ঠিত কি? বহু ও মানুষ আছে যারা জড়বুদ্ধিতে নানা লৌকিক প্রতী পূজা নিবেদন করে। তারা চায় কিছু বৈষয়িক অর্থপূরণ। তাদের পূজা—গাছ-পাথরেরই পূজা। ও আর যাই হোক, ঈশ্বরলাভ হয় না, ব্রহ্মাদ্বৈত জ্ঞান সম্ভবে না। তারা নানা কুসংস্কারের শিকার থাকে।

কিন্তু এই জড়োপাসনার ভিতরে যে বিশ্বাস-শ্রদ্ধার বীজটুকু থাকে কালে চৈতন্ত্যের অন্বেষণে মোড় ফিরে যাওয়া অসম্ভব নয়। জড় জগৎ এই যে পদার্থ-নিচয় তা কোথেকে এলো? জগৎ মূল কারণ কি? এই জিজ্ঞাসা অন্তঃকরণে উপস্থিত হলে জ্ঞানের দরজাই খুলে যায়।

সাকার উপাসনায় হিন্দুরা কোন কোন প্র অবলম্বনে সাধনা আরম্ভ করেন। যুগ্ম দ্ব্যংগ শিলাময় বা ধাতুময় প্রতীকে কিম্বা অশ্বখ-বৃক্ষে বা গঙ্গাদির জলে বা এইরূপ অথ কোন দেবতার আরাধনাপূর্বক পূজার বিধি হিন্দুধর্মে

এমন কি শত্রুপূজা পর্যন্ত। প্রযুক্তি মার্গের মানুষেরা সাধারণতঃ কোন বৈষয়িক ফল লাভের সঙ্কল্পে এই সকল পূজা করেন এবং বহু ক্ষেত্রে ফল হয়তো পেয়েও থাকেন। জাগতিক নিরাপত্তা শাস্তি ও সমৃদ্ধিই থাকে এই সকল ব্রত পূজাদির সঙ্কল্পের মূল মন্ত্র। কিন্তু মানুষ কি শুধু ঐহিক কামনা সিদ্ধিতেই পরিতৃপ্ত? মানুষের শুদ্ধ বিবেক চায়—আরো কিছু যা পারমার্থিক। সে চায় দিব্য জ্ঞান, সে চায় নিঃশ্রেয়স, সে চায় মুক্তি।

প্রতীক উপাসনায় কি তা সম্ভব? হাঁ, সম্ভব। তবে প্রতীকে চাই ঈশ্বরবুদ্ধি, ব্রহ্মবুদ্ধি। পরমেশ্বর সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান। এই যে আমার পূজার ঘট ও পট এর ভিতরেও সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর চৈতন্যরূপে উপহিত আছেন। আসলে জড়ের পূজা নয়—প্রতীক, প্রতিমা, লিঙ্গাদিতে চৈতন্যের উপাসনাই

হয়। সাকার প্রতীকে ঈশ্বরবুদ্ধি আরোপপূর্ব্বক আরাধনা করতে করতে ক্রমে ভেদবুদ্ধির বিলোপ, চিন্তের শুদ্ধি, অন্ধার ক্রমোৎকর্ষ এবং জ্ঞানের দ্রুততর বিকাশ ঘটে থাকে। এই জ্ঞানের পরিপাক অবস্থাটিই দিব্য জ্ঞান, অর্ষেত ব্রহ্ম-জ্ঞান। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বত্র সমদর্শী। “সর্ব্বং খণ্ডিৎ ব্রহ্ম।” বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গো, হস্তী, কুকুর ও শূঁড়াদিতে তিনি কোন ভেদ দেখেন না। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তিনি তখন একাত্ম হয়ে যান। মায়া নিরসিত হয়, ব্রহ্মে জগদ্ব্রহ্ম কাটে—সাধকের নির্ব্বাণমুক্তির মার্গ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সাকার থেকে নিরাকারে উত্তরণই হিন্দুর উপাসনার মূল লক্ষ্য। হিন্দু পৌত্তলিক নয়—জড়োপাসকও নয়।

“আমরা চাই সংস্কার, মিলন, সংগঠন। কিন্তু আমরা এমন কিছু করবো না যাতে সমাজে বিপ্লব আসতে পারে, আদর্শের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই হিন্দু-বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতি সম্মিলিত, সবল, সুস্থ, সতেজ, সজ্জবদ্ধ, শক্তিমান হয়ে যাতে নিজের আদর্শের পথে লক্ষের পথে চলতে পারে;—তেমনি সেবাই করবো।

ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির প্রকৃতি এমনি যে ধর্মকে ভিত্তি না করলে যথার্থ সমষ্টি জীবন গঠন অসম্ভব। আমরা ধর্মকে ভিত্তি করেই জাতি গঠন করতে চাই। সমাজে পরিবারে নানাবিধ সম্বন্ধ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে ধর্মের যে আদর্শের বিকাশ ও প্রকাশ, তাই তো জন-সাধারণের ধর্ম; তাকে অবলম্বন করেই সমষ্টিজীবন গড়ে ওঠে। সমাজের মধ্যেই ধর্মের লৌকিক রূপ প্রকটিত হয়।

আমরা রচনা করবো—একটা মিলন ক্ষেত্র; যেখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত হবে। এই মিলন-ক্ষেত্রের নাম হবে হিন্দু মিলন-মন্দির। সেটি হিন্দুর সর্ব্বজনীন মিলন-ক্ষেত্র—সম্মিলিত শক্তিকেন্দ্র। এই মিলন-মন্দির হবে—ধর্ম-প্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার,—সম্মিশ্রিত সংগঠনের কেন্দ্র। এই মিলন মন্দিরের মধ্যে দিয়েই হিন্দুর পরিবার, সমাজ—জাতীয় জীবনের বাস্তবীয় সমস্তার সমাধান হবে।”

— আচার্য্য স্বামী প্রববানন্দ

শ্রীশ্রীশিবনামের আবির্ভাব

[সম্পাদক]

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগের চারি নাম। জীবের মুক্তি হয় শ্রীভগবানের শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনে। এক্ষণ নামের মহিমা নামীর সমতুল্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তদীয় শিক্ষাটিকে বলেন—“নাম্না-মকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিষ্টত্রাপিতা।” ঈশ্বরের নাম বহু। তিনি নিজ সর্বশক্তি তদীয় শ্রীনামে অপিত করে রেখেছেন। বেদ ও তন্ত্র মন্ত্রশক্তির মহিমার কথা বলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঘোষণা করেন শ্রীনামের তারকশক্তির কথা।

সত্যযুগে শ্রীনারায়ণের নামের প্রাধান্য। চতুর্বেদ, অক্ষরাবলী, জীবের পতি ও মুক্তি সমস্তই শ্রীনারায়ণপ্রাপ্ত। অতঃপর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ঈশ্বরের যে সকল নামকীর্ণনের উপদেশ, সেই সকল নামের তালিকায় আছেন শ্রীরাম, শ্রীনারায়ণ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমধুমুদন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকেশব, শ্রীকংসারি, শ্রীহরি, শ্রীবৈকুণ্ঠ, শ্রীবামন, শ্রীমুরারি, শ্রীমধুকৈটভহারী, শ্রীগোপাল, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীশৌরী, শ্রীযজ্ঞেশ, শ্রীবিশু প্রভৃতি। ঈশ্বরের নাম শত, সহস্র, লক্ষ, কোটিও হতে পারে। ভক্তগণ মুখ্য নামসমুদয় গ্রহণপূর্বক মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে শ্রীভগবানের যে নামাবলী সঙ্কীর্ণনার্থ মানুষ পেয়েছে, তা সমস্তই বিষ্ণুদেবত। ত্রেতার শ্রীরাম এবং দ্বাপর ও কলির সঙ্কীর্ণণে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণুরই অবতার। যুগের নামধারায় উভয়কেই আমরা পাই। বিশেষতঃ কলিযুগের নামসঙ্কীর্ণনে শ্রীরাম, শ্রীহরি ও শ্রীকৃষ্ণ

প্রাধান্য পেয়েছেন। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের এই যুগমন্ত্র দান করে গেছেন নবদ্বীপের শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তৎপ্রবর্তিত নামধর্মের অধ্যাত্ম প্রভাব বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে পরিপ্লাবিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন—“হরেন্নামৈব কেবলম্।” কলিতে শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ণন ব্যতীত জীবের আর অল্প গতি নেই। “কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব পতিরন্তথা।”

কিন্তু হিন্দুভারতে বিষ্ণুদেবতের পাশাপাশি শিবদেবতের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাও নূন নয়। বেদে ইনি রুদ্র। পুরাণে এঁর বহু নাম। ইনি কোথাও পঞ্চাক্ষরে, কোথাও অষ্ট নামে, কোথাও শত নামে, কোথাও ষড়ক্ষরে, কোথাও অষ্টোত্তর শত নামে, কোথাও সহস্র নামে * স্তুত, বন্দিত, আরাধিত।

সত্যযুগের নাম :—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাহিঙ্করাঃ।

নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা পতিঃ।

ত্রেতাযুগের নাম :—

রাম নারায়ণাঙ্ক মুকুন্দ মধুমুদন।

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।

দ্বাপরযুগের নাম :—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিকো নিরাজয়ং মাং জগদীশ রক্ষ

কলিযুগের নাম :—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে বাম হরে বাম বাম বাম হরে হরে।

* শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্, শিবনামাবল্যষ্টকম্, শিবাষ্টকম্, শিবপত্ন্যস্তোত্রম্, শিবষড়ক্ষরস্তোত্রম্, শিবাষ্টোত্তরশত-নামস্তোত্রম্, শ্রীশিবসংস্রবনামস্তোত্রম্, শিবমহিমাঃ স্তোত্রম্ ইত্যাদি।

ঠাকুরের পৌরাণিকী লীলাও অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ। তত্ত্বশাস্ত্রে এই দেবতার প্রতিষ্ঠা সর্বশীর্ষে। ভারতে এমন একটি তীর্থ বা জনপদ অবশিষ্ট নেই যেখানে এক বা একাধিক শিবমন্দির স্বমহিমায় বিরাজিত নয়। হুগম পল্লী, উদ্ভূদ পর্বত, গহন অরণ্যে পর্য্যন্ত শিবের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষীভূত। এমন কোন কোন গণগ্রাম দেখেছি যেখানে তিন, পাঁচ, বা রোটি পর্য্যন্ত শিবমন্দির শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। এক স্থানে একত্রে এতগুলি শ্রীবিগ্রহ অন্য দেবতার ক্ষেত্রে হ্রস্ব। এদেশে বৈষ্ণব ও শাক্তে পরস্পর দ্বন্দ্ব হয়েছে। কিন্তু হরিহর সর্বত্র একাত্ম। হিমালয়ের এক শীর্ষ চূড়ার একপাঠে কেদারনাথ, অন্যপাঠে বজ্রিনারায়ণ অবিরোধে বিস্তৃমান। এদেশে শ্রীহরি, শ্রীবাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের সংখ্যা যত, শ্রীশিবের ভক্তদের সংখ্যা তদপেক্ষা অনধিক নয়। শোনপুরের শ্রীহরিহরমূর্তি এই দুই প্রসিদ্ধ দেবের একাত্ম্যের সাক্ষ্য বহন করে। শ্রীহরিনামের সঙ্গে তুলনায় শ্রীহরের নামের মহিমাও পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত। কাশী খণ্ডের উক্তি—

যদি গীতং কচিৎ গীতং শ্রীমহরিহরাত্মকম্।

মোক্ষস্ত তৎফলং প্রাপ্তঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ ॥

তত্র যদি একবারও শ্রীহরি ও শ্রীহরের নাম যুক্তভাবে সঙ্কীর্ণন করেন তবে তার ফল মোক্ষ-শ্রীহরিহর সামীপ্য। সুতরাং, শ্রীহরি ও শ্রীহরের একাত্মতার অল্পভবেই পূর্ণ জ্ঞান। ইহাই দৈবতের পূর্ণত্ব। এককে ছেড়ে অন্যে অপূর্ণ। দুই নাম এক হ'লেই নামধর্মেরও অখণ্ডতা। বৈষ্ণবপ্রবর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাই কি সম্যাস গ্রহণ করেন দশনামী শৈব সম্যাসী কেশব ভারতীয় নিকট। তিনি নিয়ে এলেন শ্রীহরিনাম। কিন্তু শ্রীশিবনাম কে? শ্রীশিবনাম তো এলেন না! যুগ যুগ ব্যাপী মানুষ তাঁরই প্রতীক্ষা করেছে।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষা সার্থক। শাস্তি ও মুক্তিকামী কলির জীব সেই অভীষ্ট শ্রীশিবনাম প্রাপ্ত হয় এক যুগন্ধর মহাপুরুষের শ্রীকণ্ঠ থেকে। পূর্ণ হয় নামধর্মের যুগসাধন। ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা অলৌকিক যোগৈশ্বর্যশালী, কঠোরতপাঃ, ভাগবত পুরুষ আচার্য্যাবরিষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সেই মহাদান আমাদিগকে দিয়েছেন।

সেই দিনটি ছিল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পূণ্যা পৌষী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাধবলিতা রজনী। দশ দিশি আলোকে আলোকময়। বাজিতপুর প্রণবমঠের শান্তরসাম্পদ অরণ্যানীর ঘন পত্রপল্লবের চূড়ায় চূড়ায় সেই স্নিগ্ধ আলোকরাশি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে। ছল্যোক থেকে যেন অমৃত ঝরে পড়েছে মাটির পৃথিবীতে। রজনী গভীর। প্রকৃতি নিথর। পরমযোগী স্বীয় মহাসিদ্ধপীঠে তপস্যার আসনে সমাধিমগ্ন। এক অদ্বিতীয় পরম শিবতত্ত্বে তিনি লীন। জীবকরণাকাতর ভাগবত পুরুষ শিবসঙ্কল্পেই আজ আত্মসমাহিত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তপঃসিদ্ধি লাভপূর্বক তিনি বিশ্ববাসীকে গুনিয়েছিলেন মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসময় ও মহামুক্তির যুগসন্দেশ। আজ তিনি পুনঃ যোগাক্রান্ত। মানুষ আজো পর্য্যন্ত যা পায় নি, সেই মহামন্ত্র দিতেই যেন তিনি বাকুল। ব্যাখ্যান হয় সমাধিস্থ হতে। সেই শিবসমাধি বহনলোক থেকেই অবতরণ করেন যুগের তারকত্রয় শ্রীশিবনাম “ওঁ হর হুরো! শঙ্কর শিব শান্তো।” প্রণব-সম্পৃতিত দ্বাদশাক্ষর এই শ্রীশিবনাম। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ভক্তের কণ্ঠে গীত হচ্ছে এই মহামন্ত্র। যুগধর্ম সংস্থাপনে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের ইহা অজুতম শ্রেষ্ঠ দান। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কেবল যুগভারণ শ্রীহরিনাম বিতরণ করেই জগৎপূজ্য। আচার্য্য প্রণবানন্দ যদি আর কোন কাজ নাও করতেন,

তবে বিশ্বকল্যাণে তারকব্রহ্ম ঐশ্বিনামের জ্ঞান
অধিক্রমেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে রইতেন! কেন?
সেই কথাই বলবো।

যুগে যুগে যেমন ঐবিষ্ণুর অবতার, তেমনি যুগে যুগে
ঐশিবেরও অবতার ঘটেছে এই পৃথিবীতে। বৈবস্বত
মহন্তরে প্রথম কলিযুগে দেবদেব ঋতের আবির্ভাব।
দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত ক্রমাগত এসেছেন
সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কণ, যোগীন্দ্র ও লোকাক্ষি।
সপ্তম কলিযুগে শিবের অবতার জৈগীষব্য। অষ্টম,
নবম ও দশম কলিযুগে যথাক্রমে দধিবাহু, ঋষভ ও
ভৃগু। একাদশ থেকে অষ্টাবিংশ কলিযুগে মহেশ্বরের
যে সকল অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ, তাঁদের
পরিচয় যথাক্রমে উগ্র, অত্রি, বালী, গোতম, বেদ-
শীর্ষা, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডক, জটামালী,
অট্টহাস, দারুক, লাজুলী, মহারাম, মূনি, শূলী,
পিণ্ডমূর্তীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্মা, নকুলীশ্বর। বৈবস্বত
মহন্তরের অন্ত্য কলিযুগে অবতীর্ণ শিবাবতারের শিষ্য
প্রশিষ্যগণ সকলেই হবেন পরমযোগী, ব্রহ্মভূয়িষ্ঠ ও
জ্ঞানী। বেদের স্থাপনা এবং ব্রহ্মবাদীদের হিতার্থে
তাঁদের আবির্ভাব। এই তথ্য কুর্খ পুরাণের। বায়ু,
ব্রহ্মাণ্ড ও স্কন্দাদি পুরাণেও শিবাবতারের প্রসঙ্গ
আছে। সৌরপুরাণে চতুঃশিষ্যসহ আচার্য্য শঙ্কর
আবির্ভাবের কথা আছে। ইনিই অষ্টমতবেদান্তের
প্রবক্তা, দশনামী সম্মাদিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং
ধর্ম্মীয় গ্রামি নিরাকরণপূর্ব্বক বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্য
ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপয়িতা। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কেরালের
চিদম্বর পল্লীতে ইনি আবির্ভূত।

যুগে যুগে শিবাবতারগণ এসেছেন জগৎ কল্যাণে,
শুনিয়েছেন অমৃতবার্তা। গড়েছেন নূতন বিশ্ব, দিয়েছেন
ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা, প্রচার করেছেন যোগাভ্যাসন ও
অধ্যাত্ম দর্শন। প্রয়োজনে ত্রিশূলস্বর্ধ্বে দৈত্য, দানব,

অসুর সংহারও করেছেন। তাঁরা দিয়েছেন অনেক
কিছুই। কিন্তু মানুষ পায়নি একটি দান, তা
তারকব্রহ্ম ঐশ্বিনাম। শিবর্ষি স্বামী প্রণবানন্দ
সেই অভাব পূর্ণ করে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করে
গেলেন।

ঐশ্বিনামের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কি? আমরা লক্ষ্য
করি, ঐবিষ্ণুদেবতের শত সহস্র নাম বেদে পূর্বাণে
স্ববস্তুত্বিতে বিবক্ষিত। কিন্তু যুগোচিত নামসঙ্কীর্ণনে
কেবল মুখ্য নামাবলীই গৃহীত। তেমনি শিব-
দেবতের অনন্ত নামের সহিতও আমাদের পরিচয়
ঘটে। কিন্তু যুগপুরুষের ঐকর্ষ থেকে যে মন্ত্র আমরা
পেলায়, তা ঐশিবের নামপঞ্চকের সমষ্টি বিশেষ।
কিন্তু তাতে হতাশার কিছু নেই। পরমেশ্বর শিবের
তত্ত্ব, মহিমা ও লীলাবৈচিত্র্যের সামগ্রিকতা মন-
পূর্ব্বক সর্ব্বসারভূত যা লক্ষ হয় তা এই নামপঞ্চকেই
বিধৃত। যথা:—

ওঁ—ওঁকার বা প্রণব ঈশ্বরের বাচক। কেবল
এই বীজমন্ত্রেই পরমেশ্বরের সকল মহিমা পরিব্যাপ্ত।
ওঁকারেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ওঁকারই পরমব্রহ্ম।

হর—আমাদের আরাধ্য শিব জীবের পশু
মোচন করেন, বন্ধ হরণ করেন, তাই তিনি হর।

গুরু দেবাদিদেব শিবই জগদগুরু তিনি তন্ত্রোক্ত
ঐশ্বর্য্যগীতার, প্রবক্তা, পুরাণোক্ত ঐশ্বর্য্যগীতার
উপদেষ্টা এবং যোগশাস্ত্র শিবসংহিতার সুপ্রদাতা।
যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি, লোকশিক্ষা-
দাতা। সুতরাং, যোগবিৎ ঐশ্বর্য্য ও যোগেশ্বর ঐশিব
অভেদতত্ত্ব।

শঙ্কর—বিশ্বজীবের অশেষ কল্যাণকারী রূপেই
শিবের অজ্ঞতম প্রসিদ্ধ নাম শঙ্কর। পুরাণাদি শাস্ত্রে
দেখি তিনি সর্ব্বত্র বিশ্বের সঙ্কটত্রাতা—শান্তিবিধাতা!

ত্রিপুরাসুর বিনাশপূর্বক তিনি দেবগণকে রক্ষা করেছেন। সমুদ্র মন্থনোদ্ধৃত হলাহল পান করে তিনি সমগ্র বিশ্বকে বাঁচিয়েছেন।

শিব—শিবঃ কল্যাণং বিদ্যাতেহস্ত শিবঃ। স্মৃত্যং, শিব ও শঙ্কর সমার্থক। তিনিই মঙ্গলম্, তিনিই ‘সুখম্’। কিন্তু আরো আছে। শিবপুরাণ ‘শিব’ শব্দের বর্ণানুসারিণী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ+ই+ব=শিব। ‘শ’-কার শব্দের অর্থ নিত্য সুখ ও আনন্দ; ‘ই’-কার শব্দের অর্থ পুরুষ এবং ‘ব’-কার শব্দের অর্থ অমৃতশক্তি।^১ অশুভ নাশ করেন বশেও তিনি শিব।^২ আবার অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি তাঁর ভিতরে শায়িত বা অবস্থিত আছে, তাই তিনি শিব।^৩ শিব অর্থে বেদও হয়। ইনিই রুদ্র, ইনিই অগ্নি।

শঙ্কু—শঙ্কু শব্দটির তাৎপর্যও একাধিক। অমর মতে শঙ্কু অর্থে শিব—যা হতে শম্ বা কল্যাণ হয়, তিনিই শঙ্কু, মেদিনীর মতে শঙ্কু হলেন ব্রহ্মা, বুদ্ধ (মহাজ্ঞানী); হলায়ুধের মতে শঙ্কু—বিষ্ণু, শঙ্করত্নাবলী মতে শঙ্কু হলেন—সিদ্ধ (সিদ্ধ যোগেশ্বর)। অর্থাৎ শঙ্কু শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। তিনি কল্যাণকারী, তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি বুদ্ধ বা

মহাজ্ঞানী, তিনিই পরম যোগসিদ্ধ। পরম পুরুষের স মুহিক যোগৈশ্বর্য এই দেবে বর্তমান।

যুগাচার্য-প্রবর্তিত এই শিবনামপঞ্চকের কীর্তনকারী নিত্য মঙ্গল ও সুখের অধিকারী, তিনি সর্ব অশুভের যন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ, তিনিও পরম যোগী, তিনি পশু বা জীবজন্তুর বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি শিবস্বরূপ লাভের যোগ্য। এই নামসঙ্কীর্ণনে জাতিকুলের বিচার নেই, কালাকালের বাধানিষেধ নেই, ধর্মীয় সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা নেই। বিশ্বের যে কোন স্তরের যে কোন মানুষ এই শিবনাম-সঙ্কীর্ণনে আত্মপরিশুদ্ধ হতে পারেন।

কাউকে যখন আমরা ডাকি তখন ব্যাকরণসম্মত ভাবে সম্বোধন পদই ব্যবহার্য। অন্তরের আর্ত্তি দিয়ে যখন ঈশ্বরকে ডাকি তখনো সম্বোধন পদই আসে। আমরা লক্ষ্য করি বিষ্ণুদৈবতের সঙ্কীর্ণনীয় প্রায় সকল যুগনামই সম্বোধনে। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি নাম সম্বোধনে। যুগের তারকব্রহ্ম শ্রীশিব-নামও গীত হয় সম্বোধন পদে।

১। শং নিত্যং সুখমানন্দমিকারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।

বকারঃ শক্তিরমৃতং মেলনং শিব উচ্যতে ॥

২। স্তুতি অন্তঃস্তুতি।

৩। শেরতেহবতিষ্ঠন্তে অগ্নিমাদয়োহষ্টৌ গুণা অগ্নিন্ ইতি বা শিবঃ।

“ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব শঙ্কো” কীর্তন ক্যাসেটে প্রকাশিত হয়েছে। ভাল ভাল শিল্পীরা কাজ করেছেন। সংগ্রহ করুন।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য-প্রসঙ্গ ও উপদেশামৃত

স্বামী আশ্বানন্দ

২০শে ভাদ্র, ১৩১৬ সন

স্থান—অবস্থান মন্দির, সময়—অপরাক্ষ চারি ঘটিকা

পূর্ববক্তের বর্ণনা। ষাঠঘাট সমস্ত জলময়। নৌকা ভিন্ন কোথায়ও বাওয়ার উপায় নাই। তাই আন্তরিক ইচ্ছা ও ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু দিনের মধ্যে শ্রীমদাচার্যদেবের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটে নাই। আজ অতি কষ্টে বেলা প্রায় চারি ঘটিকার সময় একজন সঙ্গীসহ আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীমৎ আচার্যদেব তাঁহার সাধন-মন্দিরের বাহিরের প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। নগ্ন গাত্র, হৃদয় হস্তোজ্জল মুখমণ্ডল। আমরা বাইতেই তিনি সরেহে আহ্বান করিয়া নিকটে নিষা বসাইলেন। ঘাত-সংঘাত-ক্লিষ্ট জীবনের শ্রান্তি-ক্লান্তি, বিষাদ-অবসাদ দূর হইয়া মুহূর্ত্তেই মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল।

প্রথমে গড়াশন। সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপরে নিজের হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“ত্যাগ ও ভোগ দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। একটি ধর্ম—মহাত্ম্যের, অপরটি নরক—অনন্ত দুঃখের; একটি মহাপ্রাপ্তি—মহাকল্যাণের, আর একটি মহা অশান্তি ও অকল্যাণের দিকে। দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপথ বিপরীত দিকে গিয়াছে। স্বতরাং ইহার মধ্যে কখনও কোন রকম মিল বা সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

তোমরা কখনও বিনা প্রয়োজনে ঘোর বিবরী ব্যক্তির সহিত মিশিও না। সামান্য একটুখানি ত্যাগের ভাব, সব নষ্ট হইয়া বাইবে। কখনও তাহাদিগকে স্পর্শ করিও না। এ বিষয়ে খুব strict থাকিবে। তবে কর্তব্যের অনুরোধে কখনও মিশিতে হইলে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মিশিবে, তাহার চেয়ে এক তিলও যেন বেশী না হয়।

সাধারণ লোকদের সহিত বেশী কথা বলিবে না। যদি নিজের ভাব অনুযায়ী লোক পাও তবে তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে, আমোদ করিবে, তাহার কথা শুনিবে। তাহা না হইলে চুপ করিয়া থাকিবে।

অনেকে বলে—উহাদের সহিত মিশিয়া উহাদিগকে না তৈরী করিলে কি করিয়া উহারা উন্নত হইবে? উহাদিগকে কোলে তুলিয়া নিতে হইবে। যার শক্তি-সামর্থ্য আছে সে-ই তাহা করিবে। যার শক্তি-সামর্থ্য নাই, নিজেকে নিষাই যে বিব্রত সে উহাদের সহিত মিশিয়া উন্নত করিতে গেলেতো নিজের অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলিবে। যার অপনাকে তরাইবার মত শক্তি আছে সে তো তাহা করিবেই। কিন্তু তার জন্ত যার শক্তি সামর্থ্য নাই তাকে সকলের সহিত মিশিয়া স্বীয় ভাবও অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে হইবে না।”

এই সময় সঙ্গীটি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, অনেকে তো বলে—শিষ্টমাতৃশ্রম শোধ না করিলে ধর্মকর্ম কিছু হয় না, অনন্ত নরক হয়; এর অর্থ কি?

শ্রীমৎ আচার্যদেব এই কথা শুনিয়া অতি তেজের সহিত গম্ভীরভাবে বলিলেন—“ও কথা নিতান্ত ভুল। অবৈবেকী ভ্রান্ত যারা; যারা যারামোহে মুগ্ধ, প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বোঝে না তাহাই নিজেদের সমর্থন করিবার জন্ত এই সমস্ত কথা বলিয়া থাকে। প্রকৃত বীর যে, এই মুহূর্ত্তেই যে সমস্ত ভোগ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়া, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎ রাজ্যে বাওয়ার জন্ত প্রস্তুত তার জন্ত ঐ কথা নয়। এসব কথার কাণ দিতে নাই।)

প্রকৃত জ্ঞানীর চক্ষে, বেদান্তের দৃষ্টিতে তাকাইলে দেখা যায়—এজগতে কেহ কাহারও নিকট ঋণী নয়, কেহ কাহারও জন্ত দায়ীও নয়; প্রত্যেকেই নিজের জন্ত দায়ী। পিতা-মাতা-ভ্রাতা-আত্মীয়-স্বজন কেহই আমার জন্ত দায়ী নয়, আমিও কাহারও জন্ত দায়ী নই; কেহই আমার নিক

খণী নয়, আমিও কাহারও নিকট ক্ষণী নই। এ-কথা অশ্রান্ত সত্য। তোমরা কখনও ঐসব কথাই কাণ দেবে না, ভ্রক্ষেপ করবে না।

বাহারী সন্ন্যাসী হইবে তাহাদের জন্য এই কথা নয়, ঐসব কথা মায়াবোহে মুক্ত গৃহস্থদের জন্য। বাহ্য সর্লদা শুধু নিজ নিজ স্বার্থ, ঐচ্ছিক স্বখ-সন্তোষ ব্যতীত আর কিছু বোঝে না, ভাবিতে পারে না, তাহাদিগকে এই সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলিয়া কতকটা উদার ও সংযত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এতে সে শুধু নিজের আহাৰ-বিহার স্বখ-ভোগ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিবে না, তাকে অন্ততঃ কতকটা সংযত হইতে হইবে। সংসারে এই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ না থাকিলে মানুষ পান্থ স্তরে নামিয়া যাইত।

কিন্তু এই সমস্তই মায়ায় ধেলা, ভ্রান্তি। মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ ভাবে যে—মা জন্মাবধি আমাকে এত আদর-বৃত্তে লালন-পালন করিতেছেন, পিতা শৈশবাবধি এত কষ্ট করিয়া অর্ধোপার্জন করিয়া ধারণাইতেছেন পরাইতেছেন; আমি কি তাঁদের জন্য দায়ী নই? আমার কি তাঁদের জন্য কোন কর্তব্য নাই? এই ভাবে মোহমুক্ত মানুষ কল্পনাবলে কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য গড়িয়া লইয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু তুমি যদি এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাও তবে কে তোমার পিতামাতাকে অর্ধোপার্জন করিয়া ধারণাইবে? তোমার পিতামাতার স্বর্ণ কে শোধ করিবে? তখন সকলেই নিরুত্তর, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। এই যে...ছিল, সে যদি এখন সন্ন্যাসী হইয়া যাইত তবে সকলেই বলিত—এতগুলি নাবালক শিশু কেহিয়া সন্ন্যাসী হওয়া নিতান্ত অজ্ঞার হইয়াছে। লোকে কত গালাগালি দিত। কিন্তু সে যে মরিয়া গেল, এখন কে তার স্ত্রী-পুত্রের স্বর্ণ শোধ করিবে? কে তাদের ভরণপোষণ করিবে? কই তাঁর তো কোন স্বর্ণ শোধ হইল না। লোকে বলিবে যত্নর সঙ্গে তো কোন কথা নাই। কেন? জীবনের সঙ্গে যার কথা আছে, যত্নর সঙ্গেই বা তার কথা থাকিবে না কেন? যত্নর সঙ্গে সঙ্গেই তো সব কিছু শেষ হইয়া যায় না। যত্নর পূর্বেও যে 'আমি' আছি, যত্নর পরেও তো সেই 'আমি'ই থাকিবে। একই 'আমি'

জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া বিভিন্ন দেহ ধারণ ও ত্যাগ করিয়া যাতায়াত করিতেছি মাত্র। স্মৃতরাং দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের, অর্থাৎ দেহধারণ, সেই কর্তব্য উদ্দেশ্যেই দেহধারণের চরম সার্থকতা। অতএব কোন কিছু করা বিষম ব্যর্থতা।

আমি এই দেহ নই, দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন কিছুও আমার নয়। আমি আত্মস্বরূপ। এই আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই শরীর নড়িতেছে চলিতেছে, কাজ করিতেছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে সেই মুহূর্ত্তেই এই দেহ নিশ্চল হইবে, দুই দিন যাইতে না যাইতেই পচিয়া গিয়া নষ্ট হইতে থাকিবে। তখন দুর্গন্ধে সকলে দূরে পলাইবে। ইহাই এই দেহের পরিণাম। কোন বুদ্ধিমান বিচারশীল ব্যক্তি কি প্রতিনিয়ত দেহের এই শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াও ভোগবিলাসে মত্ত হইতে পারে? বিবেকী যে, প্রকৃত বুদ্ধিমান যে, সে দেহের এই পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য সাধনের জন্যই বদ্ধমান হয়। সে জানে যে পিতামাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন কেহই প্রকৃত আমার নয়। পিতামাতা ভাই বন্ধুর সহিত সম্বন্ধ এই দেহের। এই দেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়াই পিতামাতা ভাই বন্ধু দেখা দিয়াছে। জীবনের সম্ভাব্যপথে কত শত জন্মে কত শত পিতামাতা ভাই বন্ধু এইরূপ হইয়াছে ও গিয়াছে। তাহাদের সহিতই যখন কোন সম্বন্ধ নাই তখন ইহাদের সহিতই বা সম্বন্ধ থাকিবে কি করিয়া? ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনও নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। স্মৃতরাং ইহাদের চিন্তায়, আমার এই দেহের ভোগ-বিলাসকাজেই আমি, আমার প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করিব কেন?

ইহাই প্রকৃত বিবেকীর বিচার। তোমরা এই ভাবে বিচার করিয়া সংসারের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। খুব সাবধান, খুব সতর্ক থাকিবে। সর্লদা বিচার করিয়া চলিবে। কখনও যেন কোন ভ্রান্তি, কোন পাপতাপ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে।

তোমরা বর্তমানে জীবনের বিষম সঙ্কটস্থলে উপস্থিত।

এই স্থান হইতে স্বর্গের পথও খুব প্রশস্ত, আবার নরকে ধাওয়ার রাস্তাও অতি সুগম। তোমরা যদি সম্পথে থাকিয়া পবিত্র ভাবে জীবন বাপন করিতে পার তাহা হইলে উদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইবে, আর যদি প্রলোভনে পড়িয়া সংসারের দিকে ধাবিত হও তাহা হইলে জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সময়টা একদিকে যেমন খুব সুবিধাজনক, অন্যদিকে তেমনি খুব ভয়াবহ। জীবনের এই সময়টুকু উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আর ৩০টি বৎসর এই ভাবে চলিতে পারিলেই বিপজ্জনক অবস্থা কাটিয়া যাইবে, তখন খুব সুন্দর অবস্থায় যাইয়া পৌঁছিতে।

বর্তমানে খুব কাঠার নিয়ম পালন করিয়া চলিবে। সর্দাদা ভিতরে একটা ভাব সৃষ্টি করিয়া মনপ্রাণকে তাহাতে ডুবাইয়া রাখিবে। তাহা হইলে আর কোন পাপ তাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই ভাবই সমস্ত বিপদাপন্ন হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। স্বপ্নেশ্বর ভিতর এইরূপ একটা ভাব আছে। এই ভাবটাই তাহাকে রক্ষা করিতেছে।

মনটিকে বাহিরের দিক হইতে গুছাইয়া আনিয়া ভিতরে নিবিষ্ট রাখিবে। মন যতই বহির্ভাগে ছড়াইয়া পড়িবে

ততই সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাহিবে, ত্যাপের আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যাইবে, ভোগের বাসনা বলবতী হইবে। কিন্তু ইহাকে যতই বাহিরের দিক হইতে গুটাইয়া অন্তর্স্থায়ী করিতে পারিবে ততই জীবন নিরাপদ থাকিবে। দুই একবার নাক টিপিয়া প্রাণায়াম করিলেই মন স্থির হয় না। তাহা হইলে সকলেই ইহা পারিত। মনকে ডগবানে নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে মন স্থির ও শাস্ত হয়।

ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আচার্যদেব তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এখন যাও, তাহা না হইলে অসুবিধা হইতে পারে। আবার কয়েক দিন পরে আসিলেই চলিবে।

যে কথাগুলি প্রতিনিষত মনের মধ্যে উঠিয়া অন্তরকে সংসারাকুলিত করিয়া তুলিতেছিল, যে প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি ত্যাগ-জীবন গ্রহণের পথে বাধারূপে দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, অন্তর্ধ্যামী দেবতা প্রাণের সেই কথাগুলিকেই যেন মনের গহন কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া সমাধান করিয়া দিলেন; ত্যাগব্রত গ্রহণের সকল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।—মনে যেন অমৃত হস্তীর বল অমূল্য হইতে লাগিল। জীবনের পথ-প্রদর্শক হৃদয়-দেবতাকে অন্তরে অন্তরে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। [পুনর্মুদ্রণ]

করুণা

ঐশ্বর্যীর গুণ

যে করুণা তব ঘন-বর্ষণে ধরে,
সেই করুণায় ক্ষেতে যে ফসল ধরে।
খই-খই-করা জলময় বিল-বিল
পারাবারই হয়; আনন্দে তা'র দিল
তরঙ্গ সম নাচে যে রঙ্গ-ভরে।

মুহুমুহু যে বিজলী বলকে নভে :
মেঘ-বর্ষণ-সম্প্রাত ভীম রবে,
উদাস্ত-বাণী-বহিতে বুঝি লেখা।

স্রায় ধরায় তাহাই আবার কেকা ;
দহঁরও তা'-ই' স্রায় সবারে ভবে।
করুণার সাথে মেশে সাবধান-বাণী,
মঙ্গলই তুমি শত ভাবে সবে দানি'
পালিছ তোমার অমল মধুর পৃথী।
প্রেম বিলানোই অরূপ, তোমার বৃত্তি,
কখনো রোজ—কখনো বৃষ্টি আনি'।
তোমার সৃষ্টি—সবেই ধন মানি।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন-৫

‘শ্রীহরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক
(পূর্বস্মৃতি, আধুনিক সংস্করণ পরবর্তী অংশ)

ভারতযুদ্ধোত্তর কালে প্রারম্ভ কল্যাণ গণনার বিষয়টি যে একটি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত সে-কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আর এভাবে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা নানা অসঙ্গতি দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে; শকাব্দ গণনা বিষয়ক তথ্যাদিও পরিবেশিত হয়েছে; কিন্তু শকাব্দ সংক্রান্ত আরও যে বিষয়টি আলোচনা-বহির্ভূত রয়েছে সেটি হচ্ছে আক্ষ শকাব্দ বিষয়ক গ্রন্থাদির আলোচনা, যেটি সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল ধরেই নিবন্ধে একান্ত সহায়ক হতে পারে। আক্ষ শকাব্দ সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক পণ্ডিত গবেষকের সম্যক জ্ঞান না থাকার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তদন্ত এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা উপেক্ষীয় নয়।

আক্ষ শকাব্দ সম্পর্কে অবিদিত বা সন্দেহান ব্যক্তি যাকেই অধ্যাপক ওলশান রাই কর্তৃক বিব্রিত ‘Cyrus the Great and the Indian Saka Era’ নামক গ্রন্থখানি দেখতে পাবেন। এতে এই শকাব্দের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতঐতিহাসের কালক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এটি একটি অসামান্য সম্ভব-গ্রন্থ। যুধিষ্ঠিরাব্দ (খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দ), বিক্রম-সংবৎ বা মালব-সংবৎ (খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দ), শালিবাহনাব্দ বা সংক্ষেপে (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং আক্ষ-শকাব্দ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দ) সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান থাকলে কাল-গণনাও বহু ভ্রান্তি-বিচ্যুতির নিরসন সম্ভব।

অধ্যাপক তিরুবোটাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের গবেষণাধর্মী রচনাও এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ, সম্ভব নেই। তাঁরা উভয়েই জ্যোতিষিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের দ্বারা এই আক্ষ শকাব্দের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক তিরুবোটাচার্য্য ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মে অয়ন্যংশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আক্ষ শকাব্দ-ভিত্তিক কাল-গণনা প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করেছেন। (Ayanan's, Journal

of Indian History : Trivandrum University. 1950. Pp. 103—116)। অপর দিকে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও অয়নচলনতত্ত্বের পর্যালোচনাক্রমে সুস্পষ্টভাবে আক্ষ শকাব্দের গণনার বিশেষত্ব তাঁর রচনায় উপস্থাপন করেছেন। (Ayanacalanam, Sarasvatesusama : V. S. 2007. Pp. 31-53)। তথাপি বিদেশপন্থী পরামর্শকারী পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আক্ষও এদিকে নিবন্ধ হয়নি। প্রকৃত ভারতীয় মনস্তত্ত্ব পণ্ডিত ঐতিহাসিকদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। সর্বোপরি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক নিবন্ধ-বিশেষেও আক্ষ শকাব্দের প্রথম পর্যালোচিত হয়েছে। (Journal of the Punjab University Historical Society. 1932. Pp. 61-73 and 123-136)। সূত্রমতঃ আলোচিত গবেষণামূলক গ্রন্থাদি এবং রচনাসমূহে আক্ষ শকাব্দ সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। সুতরাং এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

এভাবে এই আলোচনা থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পণ্ডিত কাল সম্বন্ধে স্ফোটামূলকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়। অপর দিকে এক ভিন্ন প্রকারের কালগণনা প্রক্রিয়াও সম্ভাব্য পাওয়া যায়। এটি অপ্রচলিত হলেও গভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত। আমি পরমানন্দ এই গণনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশ করেছেন “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা” নামক এক নিবন্ধে। (প্রণব : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ প্রঃ)। তাঁর নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, এক ভিন্ন প্রকারের গণনার জ্যোতিষ-সম্মত সন্ধিকালে চতুর্বিংশ যুগ ‘পরিবর্ত’ (চক্র) ছিল। ব্যাস-দেবের কালে ২৮-তম পরিবর্ত ছিল। চতুর্বিংশ যুগের অর্থ যুগের ২৪ অবাস্তব বিভাগ। পরিবর্ত-বহুত্ব জানলে জ্যোতিষ-বাণ্যের সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব। হরিবংশ পু্রাণে

উল্লিখিত আছে :—

‘চতুর্বিংশযুগে চাপি বিশ্বাসিতপুয়ঃসরঃ ।

রাজো দশরথস্তথ পুত্র পদ্মারতে কণঃ ।

লোকে দ্বার ইতি ব্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ ॥’

(হরিবংশ : ২১-২২।১।৪১)

অর্থাৎ, ২৪-তম (অবাস্তব) যুগে দ্বাদশর্ষি রাম ও বিশ্বাসিত আবিষ্কৃত হন। দ্বিরাশচন্দ্রের সমকালীন রামায়ণ গ্রন্থকার চ্যবণপুত্র ভার্গব বাম্বীকি ছিলেন। তাঁর মূল নাম ছিল ঋক। ঋক ঋষির সম্বন্ধে বাম্বপুত্র্যে আছে :

‘পরিবর্তে চতুর্বিংশে ঋক্ষো ব্যাসো ভবিত্তি ।’

(বাম্বপুত্র্যে—২৩।২০৬)

অর্থাৎ, চতুর্বিংশ পরিবর্তে (চক্রে) ঋক ঋষি (বাম্বীকি) ব্যাস হবেন। বাম্বপুত্র্যে আরও উল্লিখিত আছে :—

‘ত্রৈতাযুগে চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্রমাৎ ।

রামঃ দশরথিং প্রাপ্য সগণঃ ক্রমীয়িবান্ ॥’

(বাম্বপুত্র্যে—৭০৪০)

অর্থাৎ, ত্রৈতাযুগে ২৪-তম (অবাস্তব) যুগে রাবণ তপঃ-ক্রমবশতঃ দশরথি রামচন্দ্রকে লাভ করে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

যুগ ও পরিবর্ত-সংক্রান্ত বুদ্ধলে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের সম্পূর্ণ কালক্রম জানা যায়। যথা—

২৪-তম পরিবর্তে ঋক বাম্বীকি ব্যাস ছিলেন

২৫-তম “ বাশিষ্ট শক্তি ” ”

২৬-তম “ পরাশর ” ”

২৭-তম “ জাতুকর্ণ্য ” ”

(পরাশর-ভাতা) ” ”

২৮-তম “ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ” ”

(পারাশর্য্য) ” ”

উল্লিখিত তালিকায় বাম্বীকির পর থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পর্য্যন্ত ৪ পরিবর্ত ব্যতীত হয়েছে। শক্তি থেকে দ্বৈপায়ন পর্য্যন্ত একই বংশের ব্যাস হন। এই গণনা মতে ত্রৈতা ও দ্বাপরকে মোট ২৮টি পরিবর্তে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য অংশ থেকে এটাই বোধগম্য হচ্ছে যে, দ্বাপরের ২৮-তম পরিবর্ত-এর শেষাংশে এবং কলিযুগের প্রারম্ভে জগা

যুগ-সম্বন্ধিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং কুরুপাণ্ডবগণ বর্তমান ছিলেন।

আলোচ্য অংশ থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাধিক ব্যাস বিদ্যমান ছিলেন। এ-বিষয়েও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তদনুযায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ছিলেন শেষ ব্যাস।

বেদবিভাগকর্তা ব্যাস মোট ২৮ জন ছিলেন। স্বয়ম্ভুব মনু ও বেত ঋষি আদি বেদব্যাস ছিলেন। সপ্তর্ষিগণ যে বেদ বিভাগকর্তা ব্যাস ছিলেন তার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়।

পূর্বকালে মৎস্তরূপী ভগবান কর্তৃক রক্ষিত বেদকে (ভাগবত ২য় স্কন্ধ ভ্রঃ) পরে সপ্তর্ষিগণ (অর্থাৎ পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি) পুনর্বার প্রবর্তিত করেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩.২ অধ্যায়)। চন্দ্রবংশীয় রাজা ঐল পুরুষবা বেদকে ত্রিধাবিভক্ত করেন। আলোচ্য অংশে উল্লিখিত বাম্বীকি, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ্য ও দ্বৈপায়ন—এঁরা সকলেই বেদব্যাস ছিলেন।

‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার জিজ্ঞাসা’ নামক গ্রন্থের লেখক বিশ্বব্রহ্ম মহাশয় বেদবিভাগকর্তা ব্যাসগণের কথা তাঁর উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—‘যারা বেদবিভাগ করেছেন, তাঁদের বলা হয় ব্যাস। ২৮ জন মূনি বেদবিভাগ করেছিলেন। অন্তরীক্ষ মূনি ১৩-সংখ্যক ব্যাস ছিলেন। আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হলেন শেষ ব্যাস।’ এছাড়া ভ্রঃ ত্রিবেদের মতানুযায়ী সম্রাট অযুতায়ুর (৩০১২ খ্রিঃ পূঃ) পরবর্তীকালে ব্যাসদেব (২২৮১ খ্রিঃ পূঃ) নামে আরও একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও বেদের সুপ্রাচীনতার প্রমাণ হচ্ছে ২৮ জন ব্যাসের অস্তিত্ব। বহু সহস্রাব্দব্যাপী সময়ের মধ্যে তাঁরা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা সকলেই একই কালে বর্তমান ছিলেন—এমন কথা বাতুলতা মাত্র। অথচ সাহেব পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্বের শিখ্যাচারকে মতো রূপায়িত করার অপপ্রয়াসে জগৎ সভ্যতার কাল-সংক্ষেপণ করেছেন।

তারপর উল্লেখ্য যে, শেষব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময় সম্পর্কে শব্দরাচাঙ্গের উক্তিও ইতিবাচক। লেখক শ্রীভগীরথ-

কৃত “অগ্নিদগ্ধ শঙ্করাচার্য্য” নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত হয়েছে :—

‘কৃতে বিশ্বগুরুত্বা, ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ।

ঋপরে ব্যাস এব শ্রীং কলাবজ্র ভবাম্বাহম ॥’

অর্থাৎ, কৃতযুগে (সত্যযুগে বা দেবযুগে) ব্রহ্মা, ত্রেতা যুগে বাম্বীকি, ঋপরে কৃষ্ণবৈশ্যামন ছিলেন অগ্নিদগ্ধ; আর-কলিযুগে (কৰ্মযুগে) আমি (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য বা আমি শঙ্কর) অগ্নিদগ্ধ।

সুতরাং ঋপরে (অর্থাৎ ঋপরের শেখরভাগে ও যুগ-সন্ধিক্ষেপে) যে অগ্নিদগ্ধ কৃষ্ণবৈশ্যামন বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন তা শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে জ্যোতিষিক গবেষণায় ভারতযুদ্ধের সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। প্রাথমিক যুগতোষ চক্রবর্তী মহাশয় এক প্রবন্ধে (যুগান্তর—১১২৮৫) বলেছেন যে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে একটি দীর্ঘপূজা ধুমকেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি হালির ধুমকেতু। তাঁর মতামতমুতায়ী, ১২৮৫-১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (৫০৮৬-৫০৮৭ কল্যাণ) ৭৫-৭৬ বৎসরের পর্যায় অল্পসারে হালির ধুমকেতুর ৬৭-তম পালা চলছিল :

সুতরাং এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ।

ভারতযুদ্ধের সময় সম্পর্কে পাথুরে প্রমাণও রয়েছে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাসদ রবিকীর্তির খোদিত আইহোল শিলালিপি এর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে :—

ত্রিংশংস্ব ত্রিসহস্রেবু ভারতাদাহবাদিতঃ।

সপ্তাশতযুক্তেশু গতেষ্বকেশু পঞ্চম ॥

পঞ্চাংস্ব কলৌ কালে ষট্শ পঞ্চশতাস্ব চ।

সমাস্ত সমতীতাস্ব শকাসামপি জুহুসাম ॥

অর্থাৎ, এর মর্মার্থ এই যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হলে এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হল। সুতরাং কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর চলছিল তখন শকাব্দের

(অর্থাৎ শালিবাহনাব্দের) ৫৫৬ বৎসর ছিল এক্ষেত্রে ৩৭৩৫ থেকে ৫৫৬ যাদ দিলে ৩১৭৯ খ্রিষ্টাব্দই যে শকাব্দের প্রারম্ভ-কাল তা পাওয়া যায়। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ শকাব্দ সূচনার কাল হলে শিলাফলক স্থাপনের কাল ৫৫৬-এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

মূল মহাভারতেই কালবিধানশাস্ত্র (Chronology) সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণ রয়েছে, বেঙ্গলির সাহায্যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময়-বিধান করা যায়। মহাভারতে আছে :—

“অস্তরে চৈব সপ্তাপ্তে কলিরাপরয়োবজ্ঞঃ।

সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥”

(মহাভারত—আদিপর্ক, ২য় অঃ, ১৩ শ্লোক)

অর্থাৎ, কলি ও ঋপরের যুগসন্ধিক্ষেপে সমস্তপঞ্চকে (কুরুক্ষেত্রে) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধান্তের প্রায় সাত বৎসর আগে বলা হয়েছে :—

“এতৎ কলিযুগঃ নাম নচিরাং প্রতিপৎস্তুতে।”

(মহাভা, বনপর্ব—১২৩।৩২ সিদ্ধান্তবাগিনী সংস্করণ)
একথায় মর্মার্থ এই যে, এই কলিযুগ অচিরকাল মধ্যেই প্রবৃত্ত হবে। ভীষ্মসেনের নিকট ‘যুগধর্ম’ কথন প্রসঙ্গে এটি হস্তমানের উক্তি।

মহাভারতে এরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তের অব্যবহিত পূর্বে সঞ্জয় যুজ্ঞান্তের নিকট বলেছেন :

“সংক্ষেপো বর্ততে রাজন ! ঋপরেহশ্মিন্নরাধিপ !”

(সিদ্ধান্তবাগিনী সংস্করণ, মহাভারত, ভীষ্মপর্ব—১০।১৫)

উল্লিখিত শ্লোকার্থ হচ্ছে,—‘হে রাজন ! এখন এই ঋপরযুগের অন্তই অবশিষ্ট আছে !’

সুতরাং মহাভারতে প্রকৃত সময় নির্দেশ বিহিত হওয়ায় কলহন পণ্ডিত কর্তৃক বিহিত যুদ্ধান্তকাল সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পঞ্চান্তরে, ঋষভীয়া সন্দেহ নিরসনের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাক্তরাচার্য্য (দ্বিতীয়) এবং ব্রহ্মসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কল্যাণ-বিষয়ক কাল-বিধান স্রাষ্টিতীন এবং বিজ্ঞান-সম্মতও বটে।

ভাস্করাচার্য তাঁর ‘সিদ্ধান্ত শিষ্যোমণি’ (১১৫০ খ্রিঃ) নামক গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যাকের বিষয়ে বলেছেন :—

“যাতাঃ যখনবো যুগানি ভমিতান্তনুদ্যুগান্তিঃ ।

নন্দাঙ্গীন্দুগুণাভাষা শকনৃশাস্ত্রে কলর্বৎসরাঃ ।”

দ্বিতীয় পাদের স্থলার্থ—‘শকাব্দ-প্রারম্ভের পূর্বে কলি-যুগের ৩১৭২ বৎসর অতীত হয়েছিল।’ নন্দ ২, অঙ্গি ৭, ইন্দু ১, গুণ ৩—অঙ্কের বামাগতিক্রমে ৩১৭২ সংখ্যা পাওয়া যায়।

অপর দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মকরন্দ তাঁর ‘মকরন্দ’ (মকরন্দকারিকা, মকরন্দসারণি, তিথিপত্র বা মকরন্দ সারিণী ১৪৩৮ খ্রিঃ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :—

“শাকো লবাগেন্দুকৃশাহুযুক্তঃ কলর্বৎসরভাগ্যগণো যুগন্তঃ ।”

শ্রোকের ভাবার্থ—‘কলিযুগের-৩১৭২, বৎসর অতীত হলে শকাব্দ আরম্ভ হয়েছিল।’ নব ২, অগ ৭, ইন্দু ১, কৃশাহু ৩—অঙ্কের বামা গতিক্রমে ৩১৭২ সংখ্যা পাওয়া যায়।

আলোচ্য সকল তথ্য প্রমাণই ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কল্যাক প্রযুক্তির পক্ষে স্বীকৃতি দেয়।

পরিশেষে, যে বিষয়টি আলোচ্য তা হল ডঃ দেবসহায় ত্রিবেদ্যের সিদ্ধান্ত। তিনি ভারতীয়, গ্রীক, রোমক, চৈনিক আরবীয় ও মেক্সিকীয় ইতিহাসের সাহায্যে স্বগভীর পর্যালোচনা ও গবেষণায় পরে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করেন যে, ৩১০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতবৃদ্ধ এবং ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কল্যাকের সূচনা হয়েছিল।

ডঃ দেবসহায় ত্রিবেদ্য কর্তৃক রচিত “A New Sheet-Anchor of History” (Bhrtiya Vidya, Bombay. Vol, VI, pp. 117-23) নামক বিশেষ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদভাবে জ্ঞান দায়। অতএব, নানা দিক থেকেই এই মতটি প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এটি সার্বিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। আমাদের কাম্য, ইতিহাস সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হোক। [ক্রমশঃ]

করুণা ভিক্ষা

শ্রীঅজিত কান্তি সরকার (কাব্যসুধনিধি)

এতদিন ধরে তোমারে পূজিছি— হয়তো হয়েছে ক্রটি,
নয়নের জলে দিই নি তো ধূয়ে তোমার চরণ ছুটি !

ভক্তি-প্রেমের পবিত্র নীরে শুদ্ধ করিনি মন,
তোমার চরণে আপনারে আমি করিনি তো নিবেদন।

স্বার্থ-মলিন বাসনা ভুলিতে পারিনি কোনমতে,

অন্ধ আবেগে ছুটেছি কেবল ভোগ-পঙ্খিল পথে।

ওগো মহামায়া, তোমার জীলার কেবা জানে সন্ধান !

তোমার মায়ায় বিশ্বজগৎ সত্যত যে চলমান।

তুমিই যে মোরে বাঁধিয়া রেখেছ সংসার-বন্ধনে,

তুমিই নিত্য জানাও কামনা মোর অতৃপ্ত মনে।

মাতৃমূর্তি ধর মা এবার আঁখির সমুখে মোর,

শুভদা জননি, তোমার প্রসাদে কেটে যাক মোর ঘোর

তোমার কৃপায় জানি এ জগতে অসাধ্য কিছু নয়,

তোমার করুণা না পেলে আবার জীবন ব্যর্থ হয়।

তাই কৃপা কর ওগো কৃপাময়ি প্রসন্ন চোখে চাও।

আলোকরূপিণি, অন্তরে মোর দাও আলো জ্বলে দাও

বিশ্ব জননি, সারা বিশ্বের কল্যাণে তুমি রত,

দাও মাগো বর—পরহিত যেন হয় জীবনের ব্রত।

তোমার মহিমা প্রচারিতে মোর কণ্ঠে দাও মা গান,

তোমার কার্য সাধিতে আমারে শক্তি কর গো দান।

দেবতার দীপ হাতে

শ্রীবাজীরাও সেন

আচার্যদেব তখন চলেছেন এক লোকসংহটে থেকে আর এক লোকসংহটে—একটি গ্রাম পেরিয়ে অল্প একটি গ্রামে, একটি জনপদ পেরিয়ে অল্প একটি জনপদের অভিমুখে।

কখনও অত্যাচার, বন্দনার, শোভা যাত্রার সমারোহে, কখনও সাধারণ জনা করেক সন্ত-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে অথবা নদীতে জলপথে তাঁর প্রিয় কাণ্ডারীতে আরোহী হয়ে, নরতো কোন 'টাপুরে'।

যেতে যেতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটেছে। ধারাবাহিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ঋতুবলয়—গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, বর্ষা থেকে শরতে, শরত থেকে শীতে এবং বসন্তে।

দেখতে দেখতেই বোশেখের দল্ল বিদল্ল পিঙ্গল আকাশে সঞ্চারিত হয়েছে মেঘ—দক্ষিণ সমুদ্রের দেশ থেকে আসা পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের দল।

বুষ্টিও নেমেছে অঝোরে দিনরাত সারাক্ষণ অবিরাম। পথ ঘাট মাঠ খই নই টইটুং একাকার একেবারে।

আবার এক সময় গলে মরে এই সব ধুলোট মেঘেরা তুলোট হয়ে ভেসে ডানিয়েছে উত্তরে, হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। তারপর ক্রমে ক্রমে জীর্ণ জ্বাহত বা কিছু সব ঝরিয়ে উড়িয়ে জ্বালে সবুজে একেবারে নবনীতা, নতুন প্রীতি হয়েছিল পৃথিবী।

একটি বছরও ঘুরেছে মাঝে।

আচার্যদেব কিন্তু একটানা অবিশ্রাম চলেছেন প্রচার-তিথানে—শীত নেই। গ্রীষ্ম নেই। বুষ্টি নেই। দীর্ঘ দূর পথে বহুবিধ বাধা এবং বিরোধিতা।

কত কারণে অহেতুক ভ্রম স্বীকার ও অনিশ্চয়তা আহ্বারের, বিশ্রামের সময় নেই। স্থিরতা নেই।

তবুও তিনি চলেছেন—ক্লান্তিহীন, ক্লান্তিহীন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, প্রত্যন্তে।

যেতে যেতে আপায়ন সকলের উদ্দেশ্যেই নিৰ্ধারিত করেছেন তাঁর অনাবিল অন্তরের অরূপণ করুণা।

নির্বিচারেই মিশেছেন ছোট বড়, পতিত, পথভ্রষ্ট সন্তদের সঙ্গে। কৃত্রিম কোন পক্ষে নয়, অন্তরের ইচ্ছা নেই গড়ে তুলেছেন জীবনের সঙ্গে জীবনের সেতুবোণ।

কেউই অপরিচিত অজানা নয় তাঁর কাছে। যেন কতকালের চেনা। কতকালের পরিচয় জড়ানো আত্মার আপন আত্মীয় সব।

এসেছেও দলে দলে অথবা একক, নরতো একটি কি ছুটি সঙ্গী নিয়ে। চুপি চুপি বাড়ী থেকে পালিয়ে—ছাত্র, সমাজকর্মী, উকিল, ভাস্কর, সাধারণ গৃহস্থ দিনমজুর, সংসারের বিবিধ বন্ধন বিজড়িত দায়পীড়িত, দুঃস্থদের দল।

এসেছে শোকাহত, সন্তপ্ত, অদৃষ্টপীড়িত মিশেহারারা। সকলকেই ছুড়িয়েছেন ছায়ায়, স্নিগ্ধ, তাপোত্তীর্ণ করে তুলেছেন সান্ত্বনায়, অভ্যুত্থায়, মানবিক মমতার ভাগীরথী সলিল ধারায়।

শূন্য মন, ভাঙা বুক নিয়ে ফিরতে হয়নি কাউকে। সকলেরই চোখের জল, দুঃখের দীর্ঘশ্বাসকে সমানে ভাগ করে নিয়েছেন এক সাথে।

প্রয়োজনে পথের সন্ধান দিয়েছেন, ফিরিয়ে এনেছেন হারিয়ে যাওয়া মনোবল। বিনা বিধায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অসহায়ের পাশে, অত্যাচারিতকে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা, পীড়িতকেও যুগিয়েছেন ক্রটিহীন, তজ্জাহীন সেবা এবং পরিচর্যা।

বিধাতা থাকে তাঁর অর্লৌকিক করুণার উত্তরাধিকার দিয়ে পাঠান পৃথিবীতে নগ্নস্তম, তুচ্ছতম মনের ও সাধারণতম আঘাত কঠিন হয়ে বাজে তাঁর বুক।

তাই সংবাদ পাওয়া মাত্রই সব বাধাবন্ধন তুচ্ছ করে

এগিয়ে গেছেন তিনি। বিপন্নকে মুক্ত করেছেন বিপদ থেকে, হাসি ফুটিয়েছেন চিন্তাক্লিষ্টের মুখে।

এইভাবেই প্রচার চালিয়েছেন তিনি।

প্রচারেও যে কেবল লোকসম্মান আর জনসম্মানেষণ ঘটিয়েছেন এমন নয়, অল্প শিক্ষিত সাধারণ গ্রামবাসীদের উচ্চমার্গের কর্তব্যের বোঝানোর জন্যে নাট্যাভিনয়েও উৎসাহ যুগিয়েছেন রীতিমতো।

এই উদ্দেশ্যে এক সময় একটা যাত্রার দলও গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন নিজের, উৎসব কিংবা অল্পরূপে অল্প কোন উপসর্গে আশ্রম প্রাকর্ষণে অভিনয়ের আয়োজন করেছেন তার।

অভিনয়ও দেখেছেন অল্পদের সঙ্গে রাত জেগে, এই ভাবে নীতি-ধর্মপ্রচারের অল্পকূল পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

এই ভাবে দেশজোড়া ব্যাপক প্রচারাবিধানের মধ্যে দিয়েই চেয়েছেন সার্বিক জনমানসে ঐতিহ্যসচেতনতা জাগিয়ে তুলতে, ফিরিয়ে আনতে আমাদের জাতীয়তার হারানো গৌরববোধ।

এই ভাবেই ঘুরেছেন দাঁটি থেকে মুন্সের, আমালপুর, হাজারিবাগ, পুন্ডলিয়া, ভাগলপুর, বর্ধমান, আর যশোর।

ঘুরেছেন বাংলা, বিহার যুক্ত প্রদেশের সর্বত্র-গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে। সর্বত্রই কঠে কঠে জয়ধ্বনি, বৃকে বৃকে আবেগের দ্রাবন প্রবাহ।

কিন্তু কোথাও ছ'একদিনের বেশী অবস্থান ঘটেনি তাঁর। সে অবকাশও কোথায় তখন?

ভোরের পাখির মতোই তাঁকে এপার ওপার সারা আকাশ সীতহাতে হবে। মোহঘুম ভাঙতে দেশের, দেশের মানুষদের। বাঁধতে হবে আগামী দিনের নতুন স্বর্ষোদয়ের পথ।

তাই তাঁর প্রবল চেষ্টা আকর্ষণে সারা দেশ উদ্বেল আলোড়িত করে উঠেছে যেন একাকার বিশাল একটি নদী-ধারা সমুদ্রের উদ্দেশ্যে নিরন্তর পথ ভেঙেছেন পাহাড়ের।

এইভাবেই এসে পৌঁচেছেন উৎকলে, চৈতন্যের লীলা ক্ষেত্র কলাভূমি কলিঙ্গে।

এবং এই বছরই এখানকার অগম্যধর্মের মথবাজার সমাপ্ত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সেবাকার্যের শুভ সাংগঠনিক উদ্বোধন করেছেন তিনি।

সেই প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছেন বিশাল এক সেবাব্রতী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

ঐচ্ছিক পুরী মতই ভারতীয় কৃষ্টির ধাত্রীশালা এই তীর্থ-ক্ষেত্রগুলিকে পুনরায় ত্রেদমুক্ত, অনাচার-কর্দাচারমুক্ত করে তুলতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে তার অতীত দিনের শুদ্ধলীলা, নাস্তনিক পরিবেশ।

নতুন যুগের ভোরে এরই প্রয়োজন সর্বাধিক।

আচার্যদেব তাই সেবার এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার সক্রিয় দায়িত্ব অগ্ন কাউকে দেন নি, নিজের হাতেই তুলে নিয়েছেন নিজের।

পুরী থেকে কোলকাতা ফিরেই আবার বেয়েছেন নতুন প্রচারাবিধানের উদ্দেশ্যে। কারণ সংগঠন গড়তে হলে চাই ব্যাপক প্রচারাবিধান, এতেই গড়ে উঠবে এর ঘাতসহ স্থায়ী বনিয়াদ। এইভাবেই ঋণ, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনতাকে বাঁধতে হবে একসাথে। একীভূত, একনিষ্ঠ করতে হবে—এক জাতি এক প্রাণ, একতা-র সম্মিলন মঞ্চে।

জীর্ণ লোকচার আর অল্প তামসিকতার অনড় শৈবাল বন্ধনের বাধা সরিয়ে আবার এই জাতির প্রাণপ্রবাহকে বহমান, বেগবান করে তুলতে হবে। ত্যাগে, সংঘর্ষে দিতে হবে নৈতিকতার নতুন চারুপাঠ।

আবার কন্মার ভালবাসার লম্বজাল নতুন একটি যুগ আসবে এদেশে—‘নবদিনমণি উদিয়ে আবার পুহাতন এ পুহবে।’

তাই লোকশিক্ষার উপরেই সবিশেষ জোর দিয়েছেন আচার্যদেব। সৃষ্টি করেছেন অল্পপ্রেরণার উদাহরণের পর উদাহরণ।

এই ভাবে সেবার প্রচারাবিধানে এসেছেন বনগাঁ-এ, কিন্তু তাঁর অবস্থান হলটি নির্দিষ্ট হয়েছে টেসন থেকে বেশ কিছুটা দূরে, এদিকে টেসনে এসে পৌঁছানোর আগেই রাত

নেবেছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি আর বিজ্ঞাৎ এবং এলোথলে বতাস।

দীর্ঘ এবড়ো খেবড়ো ডাঙা চোরা অন্ধকার পথ পেরিয়ে নির্দিষ্ট স্থলে পৌছতেই গ্রহর প্রায় গড়িয়ে গেছে রাতের।

অথচ আশ্চর্য! তারি মধ্যেই নরনারী নির্বিশেষে দলে দলে এসেছে দর্শনার্থীরা। ওদের কত জনের কত বকসের দুঃখের, দুঃখের কাহিনী, কত বিচিত্র প্রকারের সমস্যা আর পীড়াভার।

তবুও কোন ক্রান্তি নেই ষিধা নেই আচার্যদেবের। সকলের সব কথা শুনেছেন মন দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য-ক্ষমতার সঙ্গে, মাঝনা দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় আশাস্তি বুঝিয়েছেন হাসিমুখে এবং লঘু সম্ভাষণ করে তুলেছেন জনে জনে।

এই ভাবে একের পর এক এসেছে গেছে সম।

কিন্তু সবায় শেষে ধারা এসেছে তাদের দেখেই রীতিমতো অবাক সকলে। কারণ তারা আর কেউ নয়। সমাজ জীবনে অশাংক্যের কিছু মানুষ। তবুও ব্যবহারে কোন বৈষম্য নয়, তাদের সকলকেও তিনি নিয়েছেন স্থিতহাস্তে, সহজ সৌজন্যে এবং আকুল কান্নার উত্তরে নিশ্চিন্ত করতে করতে বলেছেন—‘ভয় কিসের? পাপকে একবার পাপ বলে চিনতে পারলে সে আর থাকতে পারে না কখনও। অন্তরে একবার আলোর তৃষ্ণা জাগলে স্বর্ষোদয় অবশ্যম্ভাবী বোধোদয় আসন্ন।

আমি স্পষ্টই দেখছি, তোমাদের অন্তরে তারই অবতরণিকা স্থিতি হচ্ছে।

বেহেতু তোমরাও অহুতাপের আগুনে পুড়েছো নিরন্তর।

মাংসর আগুন মানুষকে পুড়ে, পুড়ে পুড়ে তুচ্ছ নিরর্থক ভস্মশূন্যেই রূপান্তরিত করে কেবল কিন্তু অহু-

তাপের আগুনে কেবল পুড়েই না, পরিশোধিত করে, পবিত্র করে। ক্রমশ উজ্জলতর করে তুলে মানবিক মূল্যবোধ দেবতার দীপ জ্বালে বৃকে।

ঐ অহুতাপের আগুনেই শুদ্ধ, সাবলীন হচ্ছে তোমরা।

অতএব ভয় কিসের?

—কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমা?

—অবশ্যই পাবে। মমতার ধিনি তুচ্ছাতুচ্ছ কীট-মূ-কীটকেও কাছে টানেন, বৃকে জড়ান তাঁরই মায়ায় মলিন-মলমে।

যাও, নিশ্চিন্ত বনেই বাড়ী যাও সকলে।

আর একবার ঐ প্রচারাবিধানের পথেই ঢাকায় একটি ঘরছাড়া মেয়েকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সংসারে ফেরাতে পেরেছিলেন আচার্যদেব।

স্বামী নির্ধাতিতা মেয়েটি আর সংসারে ফিরতে চায় না।

তিনি তাকে বুঝিয়েছিলেন, ‘মা, স্বাভাবিকতায় ছাড়া আমাদের চলে না কখনও, সব সংসারই মরুভূমির বিড়ম্বনা কেবল।

তাই যে মা’-কে আমরা দশমীতে বিসর্জন দি’ তাকেই আবার ফিরিয়ে আনি কোজাগরীতে।

তুমিও শুধু জায়া নও, জননীও। নারী নও, নারায়ণী প্রতিমা। তোমাকে ক্ষমামূলী, সর্বসহা হতে হবে। ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে ছায়াশীতল, স্নেহমূল গৃহলোক।

তুমি ফিরে যাও মা। ফেরা প্রয়োজন তোমার।’

প্রচারাবিধানের পথে এই সব লোকশিক্ষা দিভেন আচার্যদেব। সংস্কৃত, সম্পূর্ণ করে তুলতেন, সকলের ষণ্ডিত বিচারবোধ।

বলতেন—বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু তাতে

যেন জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা অশ্রদ্ধা না থাকে কিছুতে।

‘সব ঘর স্বর্ষের হোক, জীবালয় স্বাভাবিক দেবালয়—এইটাই প্রার্থনা এবং সাধনাও হোক সকলের।

কঠোপনিষদ্

ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাकरणতীর্থ

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

শোভাবা মর্তস্য যদন্তকৈতৎ

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বং জীবিতমল্লমেব

তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ (১।১।২৬)

অনুব্র—(হে) অস্তক: শোভাবা: (ভোগা:) মর্ত্যস্ত
যং এতং সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (তৎ-কর্ম, দ্বিতীয়া) জরয়ন্তি ।
অপি সর্বং জীবিতম্ অল্লমেব । তব এব (তিষ্ঠন্তি) বাহা:,
তব (এব) নৃত্যগীতে ।

শঙ্করার্থ [হে] অস্তক (যমরাজ), শোভাবা: (যঃ
আগামী কাল ভাব অর্থাৎ স্থিতি, আগামীকাল পর্যন্ত যার
স্থায়িত্ব আছে কিম্বা সন্দেহ) [ভোগা:] (তেমন, ভোগ্য-
পদার্থসমূহ) মর্ত্যস্ত (মরণশীল যজ্ঞঘোর) যং এতং (যে
এই) সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ) [তৎ]
(তকে) জরয়ন্তি (জীর্ণ করে, জ্বরায়ন্ত করে, অপকীর্ণ
করে); অপি (অপি আর যে) সর্বং জীবিতম্ (সকল
অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন, এমন কি হিরণ্যগর্ভের দীর্ঘ জীবন
অল্লমেব (অল্লই) । তব এব (তোমারই) [তিষ্ঠন্ত]
(থাকুক বাহা: (বহন সাধন অশ্ববধাদি), তব [এব]
(তোমারই) [তিষ্ঠন্ত] (থাকুক) নৃত্যগীতে
(নৃত্যগীতাদি) ।

অনুবাদ—হে যম, আগামী কাল পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব
সন্দেহ: তেমন ভোগ্যপদার্থসমূহ যজ্ঞঘোর যে এই সর্বেন্দ্রিয়ের
তেজ বা সামর্থ্য তাকে জীর্ণ বা কীর্ণ করে । আর যে দীর্ঘ
জীবন তা তো- সন্দেহ । (সুতরাং) অশ্ববধাদি, নৃত্যগীত
তোমারই থাকুক (আমার কোন ও প্রয়োজন নেই) ।

শঙ্করভাষ্য—এবং প্রলোভ্যমানোহপি নটিকেতা:
মহাহ্রদ বদন্ধোভ্য আহ—শো ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি
মল্লিহমান এব যেবাং ভাবো ভবনং ত্বয়া উপভূতানাং ভোগা-

না তে শোভাবা: । কিং মর্তস্য যজ্ঞঘাত অস্তক হে
মর্ত্যো যদেতং সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ তং জরয়ন্তি
অপকপবন্তি । অপর: প্রভৃ চর্যো হি । (১) ভোগা অনর্থায়ৈ-
বৈতে । ধর্মবীর্ষপ্রজ্ঞাতেজোযশ:প্রভৃতীনাং অপকপিত্বাং ।
যাং চ অপি দীর্ঘ জীবিকাং যং দিব্যমসি তত্রাপি শৃণু । সর্বং
যং ব্রহ্মণোহপি জীবিতম্ আব্ অল্লমেব, কিমুতান্দাদি-
দীর্ঘজীবিকা (অত: তবৈব তিষ্ঠন্ত বাহা: রথাদ্ তথা
নৃত্যগীতে চ ।

তাৎপর্য—যমরাজ নটিকেতাকে নানানভাবে প্রলোভিত
করার চেষ্টা করলেও নটিকেতার মনে বিন্দুমাত্র চাকুলোর
স্থিতি হল না । ভাব্যকার শঙ্করার্চ্য এখানে একটি দৃষ্টান্ত
দিয়ে বলেছেন যে, নটিকেতা একত সবেও মহাহ্রদের মতো
অস্তক অবস্থায় রইলেন । ছোট পুষ্করিণীতে এক সঙ্গে
বেশী লোক নামলেই জল ঘোলা হয়ে যায় কিন্তু মহাহ্রদে
অনেক লোক নামলেও, এমন কি হাতী নামলেও, জল
পরিষ্কার থাকে । (২) মনের চপলতার বহু কারণ থাকলেও
নটিকেতা শৈর্ষ রক্ষা করতে পেরেছিলেন, এর জন্য সকলেই
অবাক্ বিশ্বস্তের তাঁর চিন্তের দৃঢ়তা লক্ষ্য করেন ।

(১) অধিকাংশ সংস্করণে 'হি' শব্দটি অচুপস্থিত ।
আনন্দাশ্রম সংস্করণের পাঠটীকার এই পাঠান্তর স্বীকার করা
হয়েছে । গোপালেন্দ্র বটীধর এই পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং
'হি' শব্দের সার্থকতাও বিশ্লেষণ করেছেন । 'তাৎপর্য'
ব্যাখ্যায় তা পাওয়া যাবে, পরে আলোচিত হয়েছে ।

(২) "যদি ভোবাতে হাতী নামে, তা হলেই তোলপাড়
হয়ে যায়, কিন্তু মায়ে দীঘিতে হাতী নামলে তোলপাড় হয়
না । কেউ হয় তো টেরও পায় না ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
কথামৃত, প্রথম খণ্ড, ২৩১ পৃঃ, ঠাকুরবাচি সং)

নটিকেতা প্রলোভনের দ্বারা বিচলিত হননি এবং তাঁর সিদ্ধান্ত যে সর্বথা অত্যাশ্রিত তাও তিনি যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। নটিকেতার বক্তব্য যে, ভোগ্যবস্তুসমূহ আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও সুখদায়ক বলে মনে হলেও বস্তুতঃ এই ভোগ্যবস্তুগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিকে ক্রমশঃ জরাযুক্ত ও উপকণীকরণ করে তোলে। এই ভোগ্যবিষয়সমূহের প্রতি আমরা অত্যন্ত আকর্ষণবোধ করলেও তারা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার জন্ত দুঃখ পেতেই হবে যেহেতু কিছুকাল পরে তা তার আর বিদ্যমান থাকবে না। বিষয়সমূহ যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী তা বোঝার জন্ত প্রতি একটি শব্দ নটিকেতার মুখে প্রকাশিত করেছেন, তা হল ‘খোভাবাঃ’। এই শব্টির অর্থ অল্পধাবন করলে বিষয়রাগ বা বিষয়ের প্রতি টান অনেক কমে যাবে। ‘খোভাবাঃ’ শব্দের অর্থ বা আগামী কাল (খঃ) পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। খঃ বা আগামীকাল পর্যন্ত যার ভাব বা অস্তিত্ব আছে তা খোভাব। এই আগামী কাল পর্যন্ত স্থায়িত্বও জোর দিয়ে বলা যায় না যেহেতু তা আরও আগে বিনষ্ট হতে পারে। ‘খোভাবাঃ’ শব্টির অর্থ এক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশিষ্টাশৈববাদী ব্যাখ্যাতা রত্নরামাচর্য। তাঁর মতে ‘খোভাবাঃ’ শব্দটিকে ভাঙতে হবে—‘খঃ অভাবাঃ’। অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্তও যাব স্থায়িত্ব নেই। শাক্ত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারগণের সঙ্গে এ বিষয়ে রত্নরামাচর্যের মতের আক্ষরিক ভেদ থাকলেও তাৎপর্যতঃ কোনও ভেদ নেই যেহেতু উভয় ব্যাখ্যাতেই অনিত্যস্বরূপ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। (৩)

যাই হোক, এই অনিত্য ভোগ্যবস্তুসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দুপরিণাম এই যে, এগুলি আমাদের অগোচরে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষীণশক্তি করে দেয় অথচ এমনই মোহে আমরা নিমগ্ন থাকি যে, এই ক্ষয় তো বুঝতেই পারি না উপরন্তু আনন্দে-ভ্রুস্তিতে ভাবি ঐ বিষয়সমূহের নিদারুণ উপকারিতার কথা। ইন্দ্রিয়শক্তির বিলোপকারী এই মহা-শত্রুগুলিকেই আমরা পরমমিত্র ভেবে তাদেরই পিছনে সোৎসাহে ধাবিত হতে থাকি। ভর্তৃহরি তাঁর বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে বলেছেন যে, ভোগ্যবস্তুসমূহকে আমরা ভোগ করি না,

বস্তুতঃ ভোগ্যবস্তুসমূহই আমাদেরকে ভোগ করে। তপস্তার সার্বকতা হল পাপকে বা অধর্মকে তাপিত বা দহ্য করে শরীর-মনকে শুদ্ধ করা; কিন্তু আহরী তপস্তা শরীর-মনকে তাপিত করে; (৪) কলে তপস্তাকারী আমরাই তাপিত হই। আমরা বলি ‘কাল চলে গেল’ কিন্তু অনন্তকাল আবার কোথায় যাবে? আমরাই চলে যাই। তৃষ্ণা বা বাগনা কখনই জীর্ণ বা শিথিল হয় না কিন্তু আমরাই বাসনায় আকর্ষণে ও উদগ্র কামনায় জীর্ণ বা জরাযুক্ত হয়ে যাই। বৈরাগ্যশতকের প্রাকটি হল—

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা—

তৃপো ন তপ্তা বয়মেব তপ্তাঃ।

কালো ন যাতো বয়মেব যাতা

ভৃক্ষা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥ (বৈঃ শঃ ৭)

নটিকেতা ভোগের অসারতা সন্দেহ বা বলেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি রয়েছে মহাভারতে ও অন্যান্য শাস্ত্রশ্রেণীতে। মহাভারতের শান্তিপর্বে পরাশরগীতার পরাশর বলেছেন যে, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত সুখের মধ্যে যুগিস্থিরজনিত স্পর্শ-সুখই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সেই স্পর্শস্থিরের দ্বারা প্রাপ্য জীসংসর্গবশতঃ উৎপন্ন সুখ এতই ক্ষণস্থায়ী যে সেই কালের পরিমাণ বাণবিক্ত হওয়ার ক্ষণকালের মধ্যে তুলনীয়। কিস্বা, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ—এই ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষেত্রেও সুখকাল তেমনই ক্ষণস্থায়ী। শুভু তাই নয়, ইন্দ্রিয়-ভোগজনিত স্বরূপকালীন সুখের পরেই জন্মের তীব্র বেদনা—

(৩) “খোভাবাঃ খঃ অভাবো যো ভ ততথোক্তাঃ। দিনম্বয়স্থায়িনো ভবন্তীত্যর্থঃ।” (রত্নরামাচর্যভাষ্য)

(৪) এই প্রসঙ্গে ঋষিভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের অধ্যায়ের দু’টি শ্লোক বিচার্য— P 36, 191

অশান্ত্রবিহিতং ধোয়ং তপাস্তে যে তপো জনাঃ।

দম্বাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামদাগবলাঘিতাঃ ॥

কর্ণরন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাকৈবাস্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাকৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞানাননিচরান্ ॥

(১৭।৫-৬)

তার কিছুটা শারীরিক, আর কিছুটা বিষয়সংসর্গ চলে বাওয়ার মানসিক। হুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা আগে বুঝে নিয়ে মোক্ষ-ব্যতীত অন্য কোনওপ্রকার হুতের কামনা করেন না। (৫) এই একই যুক্তিতে নচিকেতা বনেশ দেওয়া ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করেন নি বা তা পাওয়ার কোনও কামনা কখনই মনের মধ্যে পোষণ করেন নি। পরাশরীর বলা প্রাকৃতিক এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে—

ইমুপ্রাপ্তমাত্রং হি স্পর্শবোগে যতিঃ স্তুতা।

বসনে ধর্ষনে ভ্রাশে ভ্রবণে চ বিশাস্পত্তে।

ততোহস্ত জায়তে তীত্রা বেদনা তৎক্ষণাৎপুনঃ।

অবুধা ন প্রাশংসন্তি মোক্ষং হুতমহুতম্।

(ম, ১২।২০।৩২-৩৩)

বস নচিকেতাকে যে প্রলোভন দেখিয়েছেন তার মধ্যে ‘যতদিন ইচ্ছা বাঁচবে’ এ কথাও বলা ছিল। মাহুতের স্বাভাবিক দুর্বলতা এই যে, মাহুত দীর্ঘকাল বাঁচতে চায়। অতিশয় দুঃখী, অতিশয় যন্ত্রণাকারক মাহুতও আরও দীর্ঘকাল জীবন ধারণের জন্য কামনা করে কারণ তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। নচিকেতা এতই অগ্রসর যে, তিনি এই ‘যতকাল জীবন যতদূর বাবদিক্সি’ বাক্যের দ্বারা মোটেই আশাবিত্ত হননি, এই কথার উৎসাহবোধও করেননি। নচিকেতা জানেন যে, দেবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যগর্ভ সর্বাপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকেন কিন্তু সেই পরমায়ুও তো অন্ত আছে। হুতরাং সীমিত কাল বেঁচে থাকার লোভে অন্ধিমে বাওয়া নির্বন্ধক। তাই নচিকেতা বলছেন যে এই অসীম কাল জীবিত থাকার

এখানে ‘সমর্ষ’ শব্দের অর্থ সম্যাপর্ষ বা পরমর্ষ।

প্রলোভন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ নচিকেতা তাতে আকৃষ্ট হচ্ছেন না। এই জন্যই নচিকেতা বসকে বলছেন যে, যতদূর দেওয়া বাহ অর্থাৎ যথাদিতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যিনি বেঁচে থাকেন তাঁরই ভোগ্যবস্তুর

প্রয়োজন হয়। নচিকেতা যখন এই প্রশ্ন আনুতে সন্তুষ্ট নন তখন হুতলাভের উপায় স্বরূপ যথাদি নিশ্চয়োজন আবায় বিনোদনের জন্য নৃত্যগীত ততোহধিক নিশ্চয়োজন। সাধারণ মাহুতের কাছে শতবর্ষ আনুই অনেক। সেই আনুতাল একদিন অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে—একথা জেনেও সাধারণ মাহুত এই আনুতালটুকু পেয়ে তাকে ভোগের উপযোগীরূপে পরিণত করতে চায় এবং এই জন্য যথাদি-নৃত্য-গীত ইত্যাদি সম্ভারকে একত্রিত করে। নচিকেতা যখন সন্তুষ্ট না হওয়ায় সীমিত আনুতে তৃপ্ত হননি এবং এই আনুতালে কোনও ভোগেরও আকাঙ্ক্ষা করেন নি।

তাহলে “অপসরঃ প্রভৃতযো হি ভোগা অনর্থার” এই অংশে বিদ্যমান ‘হি’ শব্দের বিশেষ তাৎপর্ষ ব্যাখ্যাত হয়েছে গোপালেজ বতীষয়ের টীকায়। ‘হি’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘নিশ্চয়ই’। আমরা প্রত্যক্ষ ও অহমানের দ্বারা জানতে পারি যে, বিষয়সমূহ ইঞ্জিরের ভেতরে কীণ বা বন্দীকৃত করে। বা প্রত্যক্ষ ও অহমানের দ্বারা সিদ্ধতা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য। হুতরাং, বা আমাদের ইঞ্জিরশক্তির ক্ষয় সম্পাদন করে তা কখনই গ্রাহ্য হতে পারে না, এই হেতুও অপসরা প্রভৃতিকে আমাদের অনর্থকারী বলে বুঝতে হবে। (৬)

(৫) মহাভারতের শান্তিপর্বে নারদ সনৎকুমার সংবাদে একটি হৃন্দর শ্লোক সনৎকুমার বলেছেন—

যদা সর্বান্ পরিত্যজ্য গন্তব্যমরশেন হি।

অনর্থে কিং প্রসক্তস্বসমর্ষঃ নাহুতিষ্ঠসি।

(মঃ ২।৩২।৩৩)।

(৬) “হি শব্দের প্রত্যক্ষাহমানাত্যাং বিষয়াণাং তেজঃ-কপতিভুজং প্রসিদ্ধমেব ভোভ্যতে। অথবা হি বস্মা পরঃপ্রভৃতয়ঃ ক্ষয় কপয়ন্তি তস্মাদেভেহনর্থার্থৈবেত্যুত্তরেণা-অর্থঃ।” (গোপানেজবতীষর)।

সংস্কৃতি

ডাঃ জীপুখী কুমার রায়

মহত্ত্বজীবনে বা সমাজজীবনে তথা জাতীয় জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতি মূল্যবান প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতিহীন জীবন সত্যকার জীবন নয়, সেটা ব্যর্থ ও নিরর্থক জীবন। তাদের জীবনে বৃহৎ কোন কল্যাণকর কাজের বাস্তব রূপ দেওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি থাকলে বা তার দ্বারা ব্যাপ্তি তথা সমষ্টি জীবন নিয়ন্ত্রিত হলে জাতীয় জীবনে অপসংস্কৃতি বা কুসংস্কৃতি অল্পপ্রবেশের সামান্যতম স্বযোগও ঘটে না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে বৃহত্তে হলে সংস্কার কথাটির অর্থোপলব্ধি প্রয়োজন। ব্যাপ্তিগতভাবে সংস্কার শব্দের বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় সম+কৃত+অ। 'ক' অর্থে করা এবং 'সম' অর্থে সংযোগ, সমুচ্চয়, সমন্বত, শোভন ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন কিছু কর্তব্য কর্ম করা বা বিবিনিবেশ পালন করা যাতে মহত্ত্বজীবন তথা সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ স্বশোভনীয় হয়, সুসম্বত হয়।

অথবা যাতে সকল মহত্ত্ব ও জীব পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্তর্গত জীব ও জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থাৎ সম্বন্ধ হতে পারে, কেউ কাউকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ না ভেবে স্বপক্ষ বা অতি আপনজন ভাবতে পারে। অর্থাৎ কোনও কিছুকেই প্রতিকূল জানে দূরে না ঠেলে অতুল ভেবে কাছে টানতে পারে, সমদর্শন করতে পারে। এক কথার কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যোগ সমুচ্চয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে সকলের প্রতি আত্মবোধে প্রেম বিলাতে পারে এবং ক্রমশঃ পর্যায়ক্রম সোপান অভিক্রম কমে বৃহত্তে বা উৎসে মিলিত হতে পারে।

জীব যে সকল ক্রিয়ার বারংবার অহুষ্ঠান করে বা অভ্যাস করে, সেটাই তার পরবর্তীকালে স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়।

কোনও এক কালে যদি কেউ চৌধুরীতি দ্বারা জীবন

ধারণ করে থাকে বা সংসারযাত্রা নির্বাহ করে থাকে, পরবর্তীকালে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও সে চৌধুরীতি ছাড়তে পারে না। বারংবার অহুষ্ঠানহেতু চৌধুরীতিই তার স্বভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তদ্রূপ, প্রায়শই যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, পরবর্তীকালে মিথ্যা কথা বলটাই তার স্বভাব হয়ে যায়। বহু বৃদ্ধ নজরে পড়ে ধারা বয়সের ভায়ে দৈহিক বল হারিয়েও চুপচাপ বসে না থেকে এটা করতে বান, সেটা করতে বান। বিরত করবার উদ্দেশ্যে হাজার নিবেদন সবেও প্রতিহত হন না।

অভ্যাস বা স্বভাবশতঃ নিপ্রয়োজনে ও আপন মনে টুকটাক করেই চলেন। কাজ ব্যতিরেকে যেন বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। কেন? কারণ, সারা জীবন বিভিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কাজ করাটাই তাঁদের স্বভাবগত। এর থেকে অল্পমাত্রা যে, মানুষ স্বভাব বা প্রকৃতির বশেই সব কিছু করে। আর প্রত্যেকেই এক একটা বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যার একটা বিশেষ অংশ নির্ভর করে তাদেরই অভ্যাসের ওপর। সেহেতু প্রত্যেকেই উচিত স্ব স্ব ধর্মের সংস্কৃতি বা বেদশাসিত কর্মের অনুশীলন করা। নইলে, সংস্কৃতি বহির্ভূত কর্মাহুষ্ঠান হেতু তদনুরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি তৈরী হয় এবং সেই স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার নিমিত্ত অবাঞ্ছিত কর্মের অবাঞ্ছিত কর্মফলের দাপটে তারা নিকৃষ্ট মানের মানুষ তৈরী হয়ে যায়। গীতার মতে, কার কি প্রকৃতি হ'বে এটা নির্ভর করে তার পূর্ব-জন্মান্বিত ধর্মধর্ম-জ্ঞানেচ্ছাদিত জন্মিত সংস্কারই বর্তমান কালের প্রকৃতি বা স্বভাব। জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করলে এটা স্বীকার করে নিতে কোনও দ্বিধা থাকে না। আর বিশ্বাস না করলেও কারো অবস্থা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমস্ত জীবজগৎ-ই মূল প্রকৃতি থেকে জাত। মূল প্রকৃতি বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের

সাম্যাবস্থা বোঝায়। সেই সাম্যাবস্থার বৈষম্য দেখা দিলে অহংকারপ্রাপ্ত হ'য়ে পর্যায়ক্রমে মূল প্রকৃতি থেকে হয় জীব-জগতের সৃষ্টি। জন্মান্তরবাদ' বিশ্বাস করুন না করুন, প্রত্যেক জীবই যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাতে আর সন্দেহ কি? জীবের সে প্রকৃতি-ই জীবপ্রকৃতি। প্রকৃতি-ই স্বভাব। স্বভাব বা প্রকৃতি অসংখ্য প্রকারের। একাদশ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বিভিন্ন মাত্রায় গুণিত হ'য়ে তার সৃষ্টি।

সেই অগণিত জীবপ্রকৃতি নিয়ে অগণিত জীবকে আমরা পৃথিবীবক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে দেখি। অহংক্রপী অভিমানাবদ্ধ হয়ে তারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত। সেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীও আবার বহু; বা সংগ্রহ করতে প্রত্যেকেই হিমশিখ খায়, বাঁধাও আসে অনেক। যার জন্ত একে হয়ে ওঠে অস্ত্রের প্রতি শঙ্ক-মনোভাবাপন্ন। হয়ে ওঠে ঘোর বিরোধী। ঘোষণা করে বিদ্রোহ। পরস্পর পরস্পরকে প্রতিহত করতে হয় অত্যন্ত তৎপর। বিধির কি পরিহাস! একে বিদ্রোহ, তার ওপর সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। শুরু হয় প্রয়োজনভিত্তিক সামগ্রীর আত্মপাতিক অভাব। যার থেকে সৃষ্টি হয় অসংখ্য জটিলতা। চাহিদাও ক্রমশঃ তুঙ্গে। চাই, আরও চাই। সর্বত্র কেবল চাই চাই রব। চাওয়ার উদ্ভাবনায় তারা উদ্ভূত। কেউ পায়, কেউ পায় না। যারা পায়, তারা পেয়ে পেয়ে তদধিক পাওয়ার নেশায় হয় বুদ্ধিভ্রষ্ট। চাওয়া পাওয়ার কি শেষ আছে? হাওয়ার পেয়েও মনে হয় কিছু পাওয়া হল না। অদ্ভুত অতৃপ্ত বাসনা! অদ্ভুত বুদ্ধিভ্রম! চাইলেই যে সব পাওয়া যায় না এ বোধ তাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তাহলে ভাবুন, যারা কিছুই পায়না তাদের কী অবস্থা। না পেয়ে পেয়ে তারা বদ্ধ পাগল। অভাবে স্বভাবে তারা বিপন্ন। আর যারা পায় তারা? তারাও বিপন্ন। পেয়ে ভোগ করতে না পেয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলায় তারা বিপন্ন। তারা বিশেষায়, উদ্ভাব। বৈতালিক আফালনে তাদের প্রাণান্ত। পেয়েও জালা, না পেয়েও জালা।

এই ভাবে মাঝখান থেকে সৃষ্টি হয় ধনিক শ্রেণী। সৃষ্টি হয় গরীব শ্রেণী। গরীবরা অর্থাভাবে হয় চোর-ডাকাত, দস্যু ভক্ত; হয় খুনী, ছিনতাইকারী। অস্ত্রদিকে, ধনিকরা কেউ হয় মজুতকারী সঞ্চয়কারী; কেউ হয় নিষেধণকারী নির্ধাতনকারী। ফলে কলহ। ফলে বিবাদ। শুরু হয় সংঘর্ষ। গরীব-ধনীতে, ধনীতে ধনীতে, গরীব-গরীব। অভাবের তাড়নায় গরীব শ্রেণীর তো শাস্তি নেই-ই, ধন দৌলতে সম্পন্ন হয়েও ধনিক শ্রেণীরও শাস্তি নেই। শত্রুর হাত থেকে সম্পদ রক্ষা করতেই তারা অশান্ত।

স্বপ্ন ভোগের কথা স্বদূরপর্যন্ত। যদিও অর্ববল থাকার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্ত্রের সহযোগিতা পাওয়া যায়, অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা ও সম্পদ রক্ষার তৎপর হওয়া যায় তবুও বিপশ্রুতি ঘটে না। কারণ বহুবিশেষে এলেও তারাই শত্রুর ভূমিকা পালন করে। ধনিকরা সে বিষয়ে যে সতর্ক নয় এমন নয়। তার জন্ত তারাও গ্রহণ করে প্রয়োজন ভিত্তিক নানা বুদ্ধি, নানা পথ, নানা ছলনা। তাতে প্রতিহত হলে তাদের সঞ্চয়লিপ্সা যায় আরও বেড়ে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য সঞ্চয় সাপেক্ষে তাই লাভ করতে চেষ্টা করে আত্মভ্রুতি। গরীব শ্রেণী হয় তাতে আরও অভাবগ্রস্ত আরও বিপদাপন্ন। অবস্থার চাপে হয় শব্দমন্ত বিপর্যস্ত। সব মিলিয়ে তুলনাহীন সংকট অবস্থা। নির্ধাতন আর অবহেলার দাপটে তারা ক্রমশঃ অধিক বিদ্রোহী। কলহ ও সংঘর্ষ তখন ঘরে ঘরে অগ্নিতে গলিতে, পাড়ার পাড়ায়, প্রান্তরে প্রান্তরে।

জীবপ্রকৃতির কথা চিন্তা করলেও দেখা যায় নানারকম সমস্যা। বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জাত সকল জীবই প্রকৃতির বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর রত্নসম্ভার দেখে অত্যন্ত বিম্বিত অত্যন্ত মুগ্ধ। ভূষনমোহিনী প্রাকৃতিক শোভার অন্ত নেই। প্রত্যেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট। ইন্দ্রিয় সাপেক্ষে ভোগ করতে সকলেই তৎপর। কেউ প্রকৃতির অঙ্গ শোভায় কেউ নারীর অঙ্গলাবণ্যে আকৃষ্ট; কেউ আকৃষ্ট ধন-দৌলতে, কেউ আবার ফুলে কলে। এরকম কত কি। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রকৃতির অগণিত মনোমুগ্ধকর রত্নসামগ্রী বিদ্যুত

রয়েছে সকলকে লোলুপ্ত করিতে, বিতৃত রয়েছে সকলকে বিমুগ্ধ করিতে। তাতে প্রলুপ্ত হয়ে যোহাঙ্ক জীব ছুটে যায় দ্বিধাদিক—কেউ ভোগ করতে পারে, কেউ পারে না। যারা ভোগ করতে পারে তারা ভোগ করে অতৃপ্ত, যারা ভোগ করতে পারে না, তারাও না পাওয়ার বন্ধনায় অতৃপ্ত। এইভাবে ক্রোধান্বিত জীব হয়ে ওঠে মদ-মাংসখ্যাগিণ্ড।

তা'হলে কি এই পরিণতির হাত থেকে নিস্তারের উপায় নেই? এ প্রশ্নে আগেই বলেছি সব কিছুই একটা নিয়মে চলে। জীবজগৎ বিপরীতও সবই। নিয়ম ভঙ্গ হলেই প্রলয়—জীব দেহে অস্থব-বিস্তব, পার্থিব জগতে ব্যাভিচার অপসংস্কৃতি। তাই সকল যুগেই মুনি-ঋষি, জ্ঞানী গুণী, সমাজ-সংস্কারক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যাতে মনুষ্যজাতি বিক্লিপ্ততার অপরাধে বিপর্যস্ত বা পশুদন্ত না হয় তার জন্য বিয়ম-নীতি নির্ধারণ করবার প্রয়াস চালান। আজকের দিনে মনুষ্যগণ প্রায়শঃ আত্ম-বিস্মৃত। তাদের নেই আত্মবোধ নেই আত্মসংস্কৃতি। আত্মবিস্মৃত হওয়ার কারণে তারা আজ সংস্কারে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারছে না। বীরত্ব প্রদর্শন করছে কেবল ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদে। পুরুষ প্রদর্শন করছে স্বামী স্ত্রীর কলহে। আত্মমর্যাদা রক্ষার বেলাতেই যত উদ্যমের অভাব উৎসাহের অভাব, সত্যরক্ষার বেলাতেই যত পুরুষকারের অভাব, বীর্যবন্ততার অভাব। তারা আজ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাকে। সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই যে ক্রীড়াচ্ছলে বহু হয়ে আছেন সেই বোধ আজ কোথায়? কোথায় তাদের স্বার্থ স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস? কোথায় অনন্ত অখণ্ড আনন্দ-ধন সত্তা অমূল্যমানের মানসিকতা? বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'য়েও আজ তারা বিপদগামী। কলশ্রুতিহিসাবে কাউকে চিন্তাই রাহাজানি এরূপ সামাজিক দুর্নীতি কাপুরুষতা স্বার্থপরতার নগ্নতা, দুর্বলতা ভীরুতার হীনমন্ত্রতা। মিথ্যার শিচ্ছেন ছুটে ছুটে ক্রান্ত শ্রান্ত হয়েও সত্যের উপলব্ধি করতে চাইছে না। উপলব্ধি ধুক ধুক করা প্রাণ সঞ্চল করে পাখাওয়ালা পতঙ্গের কায় মৃত্যুর হাতছানিতে সাড়া দিতে যাচ্ছে এগিয়ে, চিরতরে জ্বলে যাচ্ছে স্থব বাইরের জিনিস

নথ, অস্তরের জিনিস আত্মার জিনিস। আনন্দ, কখনও বাইরের হ'তে পারে না, সব সময়েই অন্তরের। সেই লক্ষ্যচ্যুত জীবের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে বহুবার বহু সত্যপ্রস্টা ঋষি, তপঃসিদ্ধ ঋষি অবতীর্ণ হয়েছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা করেছেন কঠোর তপস্শ্রা—আদর্শভ্রষ্ট জীবের উচ্ছ্বলতা নিরসন করতে, সংযমহীন তপস্শ্রাহীন সংকীর্ণ কলহলিপ্ত স্বার্থাচ্ছ জীবের দুঃখস্বা দূর করতে। শেষ পর্যন্ত সেই তপঃপ্রভাবে আবিষ্কৃত হ'য়েছে বহু উপায়, অশুশাসন, নিয়মকানুন। সেই চচিস্তিত উপদ্রুত কর্তব্য কর্ম, সুপরিচালিত নিয়মশৃঙ্খলা, বাধা নিষেধ—যার দ্বারা যে কোন শ্রেণীর, যে কোনও দেশের, যে কোনও জাতির মনুষ্য হতে পারবে সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিচালিত, সেইগুলিই সংস্কৃতি। সেগুলো কেবল হিন্দু-জ্ঞান নয়—সকল দেশের সকল জাতের মানুষের জ্ঞান; কেবল সেকালের জ্ঞান নয়—সকল কালের জ্ঞান। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ সকলের জ্ঞান। সকলেই তারা মানুষ। সকলেই ভাই ভাই।

সেই সকল নির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতিকে কেন্দ্র করে কোনও এক সময় মনুষ্যগণ জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল; উন্নতির চরম সীর্ষে উন্নীতও হয়েছিল। কিন্তু, মানুষ আত্মবিস্মৃত জাতি। কালের গতিতে জন্মমৃত্যু কপ পরিগ্রহ করতে গিয়ে ভুলে সে কথা। শুরু হল আবার নান। সমস্ত। সমস্তায় জর্জরিত হয়ে তাই তারাই আবার পরবর্তী সময়ে মোহাঙ্কের মত জড়িয়ে ধরল সংস্কৃতির পরিবর্তে অপসংস্কৃতিকে কুসংস্কৃতিকে। ঘটল চরম অবস্থা, চরম অবস্থা। উঠল হাহাকাহ। তাই সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলার আহ্বান বহু সাধক ও জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টকর্মে প্রদর্শিত হয়ে উঠল। বিশ্ববিশ্বী স্বাধীনতা, স্বামী প্রদ্বানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অবিন্দ্র প্রমুখ তাঁদের অন্ততম। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের কৃমিকার তুলনা নেই। বর্তমানকালে অবশ্য তথাকথিত সমাজ সংস্কারকগণ সংস্কৃতির স্বার্থ মূল্যবোধের অভাবে অপব্যবস্থা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

সংস্কৃতির ওপর দোষের বোকা চাপিয়ে তারা সেই তপোলব্ধ সংস্কৃতিকেও অম্লপযোগী ও অসমরোপযোগী অপবাদ দেয়ার প্রয়াস নিচ্ছে। তাদের মতে যাও কিছু হ্রসংস্কৃতি ছিল সেগুলোও নাকি অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কৃতির আধিক্যে মদন সাধনের পরিবর্তে অমদন-ই বেশী করে চলেছে। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দোহাই দিয়ে তারা বহির্দেশে কিছু কিছু নিয়ম-নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সংযোজন-বিরোজন ও পরিবর্জন-পরিবর্তনের মত চরম ঔজ্জ্বল্যও প্রদর্শন করছে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল এইটুকু বলে রাখতে চাই যে, আজকের এই ঘোর বিপর্যয়ের দিনে অপসংস্কৃতি বিভাভূতের যথেষ্ট চেতনা জাগানো প্রয়োজন। বিশ্বাস রাখি, সংস্কৃতি বুঝে তা রক্ষার হৃদয়মণী প্রচেষ্টা চালালে কুসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি আপনা থেকেই অবমমিত হতে বাধ্য, অপসারিত হতে বাধ্য। কারণ পূর্বেই বলেছি, যে জিনিষের বারংবার অনুশীলন করা হয় তারই ক্ষুদ্রি ঘটে আর অননুশীলনীয় জিনিষের ঘটো বিলুপ্তি।

আমাদের দেশে সংস্কার দশবিধ। বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, অন্নপাণন, সাধুতক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, নামকরণ এই দশবিট সামাজিক অনুষ্ঠানই দশবিধ সংস্কার। কোনও কিছুর পরিষ্করণ বা পরিমার্জনেরও সংস্কার বলে। জীব জিনিষের জীর্ণোদ্ধার অর্থাৎ দেহায়তও সংস্কার। আবার, পূর্বজ্ঞান, কর্তব্য ও নৃত্যজ্ঞ মনোবৃত্তি, পূর্বকর্মজ্ঞ বাসনা এবং স্বাভাবিক জ্ঞানকেও সংস্কার বলে। আজ্ঞাধারণাকেও কোথাও কোথাও সংস্কার বলে উল্লেখ আছে। স্বভাবলব্ধ স্থায়ীভাবে ব্যাপারেও তাই উল্লিখিত বর্ণনা পঞ্চাঙ্গগটে যথেষ্ট সংস্কারের যথার্থ আবেদন কি সেটা বুঝতে হবে। সংস্কৃতি এমন-ই কিছু অনির্দিষ্ট বাধানিবেদ বা নিয়মনীতি যা মূনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সমাজ সংস্কারকগণ বহু সাধনা করে জাতীয় ঐক্যচেতনা ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার স্বার্থে এবং জাতির সার্বিক উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে নির্ধারণ করেছেন। সেই অনির্দিষ্ট বিধিনিবেদ, নিয়ম-কাহন ই সংস্কৃতির দায় প্রধান অঙ্গ।

স্থান কাল পাত্রভেদে সংস্কৃতি বিভিন্ন প্রকারের।

হিন্দুদের পূজার্তনা, মুসলমানদের নামাজ, খ্রীষ্টানদের গীর্জায় প্রার্থনা সবই সংস্কার। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যেখানেই বসবাস করুক, সকলেই তাদের নিজ নিজ আচার আচরণ বা নিজ নিজ সংস্কার অম্লরূপই ক্রিয়াকর্ম করে। আমরা ভারতের হিন্দু পরিবারভূক্ত বলে পাশ্চাত্য যে কোনও দেশে কিছুদিন প্রবাসী জীবন যাপন করে কোনও এক সময় যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, নিজের দেশের লোকের অদর্শনে অস্থির হয়ে উঠি, আত্মীয় স্বজন বা একই সংস্কারভূক্ত লোকের স্রুত ব্যাকুল হয়ে উঠি, ঠিক সময় সেই মানসিক অবস্থায় কোনও ব্যক্তিকে হিন্দু সংস্কারায়ত্ত্ব ক্রিয়া করতে দেবে আমরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই, অন্য পরিচয়ের অপেক্ষা না করেই তাকে হিন্দুজ্ঞানে বিনা সংকোচে আভিজ্ঞানে আবদ্ধ হতে ছুটে যাই। কথায় বলে, 'দেশের কাককেও ভাল লাগে।' অন্তরের এটি একটি বিশেষ স্রুপ্ত অবস্থা, যা সংস্কৃতি রক্ষার সাহায্য করে, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সংস্কৃতি যে জাতির সম্ভবজ্ঞতার সহায়ক এটা কি তার জলন্ত প্রমাণ নয়? জাতির প্রত্যেকের মধ্যে একই ধারার একই ছন্দে যদি তা প্রবাহিত হয় তাহলে মানুষ যে কতটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেটা চিন্তার অতীত। বিশ্বের অভ্যন্তর দৃশ্যবর্তী কোনও কেন্দ্রে গিয়ে-ও যদি কার-ও কণ্ঠে "ঐ" মন্ত্র উচ্চারিত হতে শোনা যায়, তৎক্ষণাৎ আমাদের হৃদয়রঞ্জিতে সেই স্রব বন্ধারিত হয়। হৃদয়গ্রাহি আনন্দে হয় ভরপুর। কিন্তু কেন? কারণ, একই সংস্কারের অনুশীলনে মনুষ্যজাতির অন্তর্নিহিত প্রাণরঞ্জিতে একই স্রব বাধা। সামান্য উত্তেজনাতেই সেগুলো বদ্ধত হয়। ঐক্যতানের সেই বন্ধার হৃদয়কে করে স্পন্দিত। এই উত্তেজনাই মূলতঃ সংস্কার—যা হৃদয়-গ্রাহিতে স্রমধূর দল্লিত স্রবের বন্ধার তোলে ঐক্যবদ্ধ করার সমকম্পন সাজাবিশিষ্ট ছন্দময় আবেদন অর্থাৎ সম্ভবজ্ঞতার আহ্বান।

জীবমাত্রেরই ব্রহ্মের অংশ। ঐয় প্রতিটি স্বভাব বা স্বরূপ-ই প্রতিটি জীবে বিদ্যমান। একই ব্রহ্মাত্মা বা পরমাত্মা বিভিন্ন দেহপ্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে 'অহং' অভিমান-ধারী জীবরূপে প্রকাশিত। চৈতন্য বিনা কিছুই প্রকাশিত হয় না। তাই মূনি-ঋষি ও বুদ্ধজীবীগণ চৈতন্য জাগানোর

মাধ্যমে সকলকে উদ্ধৃত্ত করতে চেট্টা করেছিলেন। চেট্টা করেছিলেন, সকলকে সংস্কৃত করতে এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে একত্ব স্থাপন করতে। ঘরে ঘরে তাই বৈদিকযুগে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হ'ত সামগান গীত হ'ত বিভিন্ন ষাগবজ্ঞে-আকাশ বাতাস হ'য়ে উঠত মুখরিত। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল নিরম-শৃঙ্খলা, ঘটেছিল চরম উন্নতি। তাও হাজার হাজার বছর আগে -আজকের তুলনায় আদিমযুগের বেশ

কিছু কাছে। তখনকার উৎকর্ষতা আমাদের চিত্তায় বাইরে। ভাবতে অবাক লাগে, এতদিন পূর্বেও চিন্তাশীলদের মাঝায় দানা বেঁধেছিল হাজার প্রশ্ন কীভাবে অগণিত প্রকারের অগণিত জীবের সহাবস্থান সম্ভব? কী করেই বা স্বার্থের কথা ভুলে প্রেম-প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা যায়? মানুষের মূলতঃ জন্মোত্তম কী এবং চায়-ইবা কি?

[ক্রমশঃ]

গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান

জীনরনারায়ণ চক্রবর্তী

ভৌগোলিক বিবেচনায় গঙ্গার উৎপত্তি-হিমালয়ের গৌমুখী শৃঙ্গ থেকে। সেখান থেকে আট মাইল দূরে গঙ্গোত্রী। গঙ্গা সেখানে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সে স্থানটির নাম দেবপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগ থেকে সমস্ত আর্ধ্যবর্ষ পেরিয়ে পূর্ব ভারতের দক্ষিণে সাগর দ্বীপের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলেছেন গঙ্গা। তাঁর এই সাগর সংহতি কতদূর আগে ঘটেছিল তার কিছু সঠিক ইতিহাস আছে বলে জানি না; কিন্তু সেই শ্রবণাভীত কাল থেকে বর্তমানেও গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম স্থান বা দ্বীপ সমগ্র হিন্দু মানসের একটি মহাতীর্থ হিসেবে গণ্য। এই দ্বীপের অপর প্রসিদ্ধির কারণ হল সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি কপিলদেবের সাধন ক্ষেত্র।

সামান্য, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে গঙ্গা-সাগর সঙ্গম তীর্থের উল্লেখ আছে। এই মহাতীর্থে মহর্ষি কপিলের পূজার বিশেষ প্রচলন থাকলেও তীর্থযাত্রীদের গঙ্গার প্রতিই ভক্তি বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস যে গঙ্গা সর্ব কলুষনাশিনী, পতিত-উদ্ধারিনী ও নরকস্তম্ভ-নিবারিণী; এঁর প্রবাহে স্নান করা মহাপুণ্যের কাজ। পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিবরে মঙ্গলকারী

হয়ে দেবদেবী গঙ্গা দেবভূমি থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেছেন।

কপিল মূনির কোথায় উৎপত্তি-উৎসাহিত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্পর্শ পেয়ে পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গধামে গমন করেছিলেন। সেই দিনটি ছিল পৌষ সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। গঙ্গা যে দ্বীপের পূর্ব দক্ষিণ দিক ধরে সাগরে বিলীন হয়েছিলেন সেই দ্বীপটি হিন্দু মানসে মহাপবিত্র গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থ ত্রিদিবনের মত পরিগণিত হয়ে গেল। সেই থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিনে মকর স্নান শুরু হল। মহাভারত পাঠে আমরা জানতে পারি যে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থে স্নান করে ভ্রাতাদের সঙ্গে কলিক অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

(বনপর্ব ১১৪৯, ৩)

এই তো হল গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম তীর্থ স্থতির পৌরাণিক কাহিনী। বৈকুণ্ঠের প্রাকণ ভারতভূমির আর্ধ্য স্ববিগণ কিন্তু তাঁদের স্মৃতি স্মৃতিতে গঙ্গার উৎপত্তি বা উৎস স্থানটি দেখেছেন আরও উজ্জ্বল মর্ত্য ধামের বাইরে।

ভক্ত শিরোমণি নারদের বড় অহঙ্কার যে তাঁর মত বীণা বাদক ও সঙ্গীত বিশারদ আর কেউ নেই। তাই তিনি

তার খেয়ালখুশীমত সঙ্গীত সংলাপ করেন।

এর ফলে রাগরাগিণীগণ সকলেই বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা একথা অহুমত্বে জানতে পেরে রাগ-রাগিণীদের বললেন যে সঙ্গীত শাস্ত্রের জনক দেবাদিদেব মহাদেব যদি সঙ্গীত করেন তবে তাদের এই দুর্গতি দূর হবে। বারদেব অহঙ্কার নাশ করবার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব স্বীকৃত হলেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু সত্যের শুরু হল নৃত্য ও সঙ্গীত। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর অশ্রুতপূর্ব সংলাপ। কিন্তু সঙ্গীতের জনকের ঐ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বুঝবে কে? নারদ তো কোন ছার, পিতামহ ব্রহ্মাও সম্যকরূপে-রস গ্রহণে-সক্ষম হচ্ছেন না। বৈকুণ্ঠের ভগবান শ্রীবিষ্ণু তথা বৈকুণ্ঠেশ্বর আংশিক ভাবে বুঝেছিলেন, তাতেই তাঁর পাদদেশে অবীভূত হতে লাগল। তখন সকলের অমুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীত বন্ধ করলেন, অবীভূত বিষ্ণু সত্বকে ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন। নারদের অহঙ্কার নাশ হল এবং রাগ রাগিণীগণও হুর্দশা মুক্ত হলেন। এই অবীভূত বিষ্ণু সত্ব-ই হলেন গঙ্গা। বহুকাল গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতেই রয়েছিলেন; তাই গঙ্গার নাম হ'ল বিষ্ণু পাদোদ্ভবা বা বিষ্ণু পাদার্ঘ্যসমুদ্ভবা।

বিপ্লবপ্রসার স্থিতিতে কোন কিছুই বুধা যায় না। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। মাহুয়ের প্রয়োজনে পতিত উদ্ধারিণী বিষ্ণুপত্নী গঙ্গাকে মর্ত্যধামে নেমে আসতে হয়েছিল। তাঁর এই অবতরণের হেতু ও ইতিহাস বাঙ্গালী-রামায়ণের আদি কাণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়ে বর্ণিত আছে।

উত্তরায়ণের পথ চির আলোকোজ্জ্বল—এটি দেবদান মার্গ, মুক্তির পথ। এই পথে জীব অগ্রসর হতে পারলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির এই শুভদিনেই কপিলদেবের কোপানলে ভস্মীভূত সগর রাজার বাট হাজার পুত্র পেয়েছিলেন। গঙ্গার স্পর্শ ও চির আলোকোজ্জ্বল দেবদান মার্গে উজ্জ্বলিত অর্থাৎ মুক্তি, এই দিনেই হয়েছিল তদীয় আনীত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার সাগর সংহতি সাগর দ্বীপের পাশে ভগবান কপিলদেবের আশ্রম সংলগ্ন স্থানে। সেই স্বল্প অতীতকাল থেকে অন্ত্যাবশিষ্ট পুণ্য লোকাত্মর আন্তিক হিন্দুধর্মসে এই স্থানটি অতি

পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে স্থান পাচ্ছে। প্রতি বৎসরই কয়েক লক্ষ নরনারী এই পুণ্যক্ষেত্র সাগর দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। প্রাকৃতিক শত বাধাও তাঁদের অদম্য উৎসাহ নষ্ট করতে পারে না।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির অয়াট বাঁধা কুয়াশা ও কনকনে শীত অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নানস্থলে স্নানের পর সমবেত ভক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে।

ওং দেব সরিতাং নাথং দেবি সরিতাং বরা।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুখাশি দুবিতানি বৈ।

এই সম্মে ভক্তগণ সাগরকে ও মা গঙ্গাকে সতর্ক প্রণাম নিবেদন করছেন।

আবার কোন কোন ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গের জলে পা' দেওয়ার পূর্বেই শ্রী গঙ্গাদেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন নিম্নলিখিত মন্ত্রে—

‘ও নারোহণ গোপানঃ তদীয়মুদকং শুভে।

অতঃ স্পৃশ্যামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোহস্ততে।’

এই সব শুভ-কৃতির স্বাক্ষরে মনে হয় যে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম স্থল আজ যুগ্ম পরিগ্রহ করে স্থানার্থীদের ডেকে বলছেন—

‘ওগো পুণ্যার্থীগণ শোনো, এই গঙ্গা-সাগর সঙ্গম স্থল হচ্ছে ঐহিক ও পারমার্থিক এই দুই লোকের সীমান্ত স্থল এই স্থানে জ্ঞানগুরু ভগবান শ্রীকপিলদেব নিত্য অধিষ্ঠিত। তিনি এখানে থেকে যোক্ষপিপাসা মাহুযকে সঙ্কটে বলে দিচ্ছেন—‘ঐ যে তোমার সম্মুখে মহাসমুদ্র, ঐখানে তুমি মিশে যাও। তুমিতো ক্ষুদ্র নও—তুমিও এই মহা-সমুদ্রের ক্ষার বিশাল-বাসনার বসে তুমি নিজের স্বরূপ ভুলে ছিলে। আমি তোমার বাসনা ভস্মীভূত করে আত্মসংযম দান করেছিলাম। নিবৃত্তিস্বার্থে তোমাকে সাধনায়—ব্রতী করেছিলাম। আজ তোমার সেই সাধনা পূর্ণ। এই লও পরম জ্ঞান। আজ তুমি মুক্ত।’

জ্ঞানগুরু শ্রী কপিলদেবত্যা ডেকে বলছেন, কিন্তু এই ডাক শুনবার মত কান আছে কয় জনের? আন্তিক হিন্দু মাঝেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান-দান-তর্পণাদি করলে সকল পাপের হয় আত্মান্তিক বিনাশ, আর অস্তিত্বে ঘটে মোক্ষলাভ। তার কারণ মকরবাহিনী, শ্রীগঙ্গাদেবী হচ্ছেন

কলিকনুহারিণী, পাপ-তাপ বিনাশিনী, সর্ব সন্তাপহারিণী, ত্রিভুবনতারিণী। একথা কি শুধুই অন্ধ বিশ্বাস ? উত্তরে বলতে হয়—না, তা' কখনই না। এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ও ষৌগিক রহস্য। আমরা জানি গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ ঘটেছিল জীবের মুক্তির প্রয়োজনে। প্রতিটি বহুজীবই চার মুক্তি বা মোক্ষ ; কিন্তু গঙ্গার জলে দু'চারটে ডুব দিলেই তো আর অনন্তমূল বাসনার ক্ষয় হয় না, আর অভীষ্ট মুক্তি লাভও ঘটে না। ডুব দিতে হয় অন্তরলোকে। অন্তরলোকে ডুব দেওয়াই হচ্ছে ষৌগিক স্নান। গঙ্গাস্নানের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই ষৌগিক বা আত্মিক দৃষ্টির প্রকাশ না হয় তাহলে গঙ্গা শুধু জলময়ী সাধারণ নদী। সেই স্নানে দৈহিক মল দূর হবে সত্য;

কিন্তু চিত্তবল দূরীকৃত হবে না। স্মৃত্যং, স্মার্ত্রিক গঙ্গা-মাহাত্ম্যের মধ্যে যে আত্মিক মুক্তির সাধনমূলক বিত্তমান সেটি সচেতনভাবে উপলব্ধি করে গঙ্গাস্নান করলে তবেই হবে তা' মুক্তিপ্রদ। মহাত্মার তের বনপর্বে মহাবিবেদব্যাস তাঁর উপরোক্ত অমৃত্তিলক সিদ্ধান্ত বহুভাবে প্রকাশ করেছেন।

আহুন, আমরা বার। সঙ্গম-স্থলে উপস্থিত হতে পারছি না, তারা দূর থেকেই গঙ্গা-সাগর সঙ্গমকে সঙ্গম প্রণাম নিবেদন করি।

সহায়ক গ্রন্থ স্বামী নির্মলানন্দজী রচিত দেবদেবী ও তাদের বাহন।

হিন্দু জাতি-গঠন কোন্ পথে ?*

ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে হিন্দু জাতীয় জীবনে কথকিং চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে ; সহস্রাব্দের আত্মবিশ্বস্তির মোহ-আবরণ চূর্ণিত হইতেছে। সমাজ-গঠন, জাতি-গঠন, সংস্কৃতিগঠন, আত্মরক্ষা বিষয়ক চিন্তা, আলাপ-আলোচনা ও প্রচেষ্টা—হিন্দু জাতীয় জীবনে আগরণ-তরঙ্গ জাগাইতেছে।

হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দু-সমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দু জাতির পুনরুত্থান সাধনের চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার হিন্দু নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক আলোড়িত। বহুনেতা ও মনীষী হিন্দু-জাতির পুনর্গঠনের বহুপ্রকার চিন্তা ও পরিকল্পনা দিয়াছেন। হিন্দু-জাতিগঠন কোন্ পথে ? বহু মত বহু পথের সামঞ্জস্য ও মিলন কোথায় ? ত্রিংশ কোটি হিন্দুনরনারীর চিন্তা ও চেষ্টাধারা কোথায় কোন্ জাতীয় সাগর-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিবে ?

ধর্মক্ষেত্রের নেতা যারা তারা বলিতেছেন—হিন্দুজাতি ধর্ম-প্রাণ ; ধর্মের ভিত্তিতেই হিন্দুধর্মি হিন্দুর ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় জীবনকে রচনা ও পরিচালনা করিয়া

গিয়াছেন। ধর্মের আদর্শ, সাধনা ও অহুষ্ঠানে উদাসীন ও বিমূগ্ধ হিন্দু আজ ব্যাপ্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত, লাহিত, বঞ্চিত, বিশন্ন। ধর্মের মানিতে জাতীয় জীবনের মানি। ধর্ম মানির পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাঁরা হিন্দু-ধর্মক্ষেত্রের বহু দোষ-ত্রুটি-দুর্দলতার উল্লেখ করেন :—

ধর্মপ্রাণ হিন্দু আজ ধর্মের প্রাথমিক সোপান—ত্রিসন্ধা-ভগবানেব উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে ; অগ্রাচ্ছ প্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিই ; বর্ণগুরু, হিন্দুজাতি ও সমাজের রক্ষক ও ধর্মের শিক্ষক অবিক্রাংশ ব্রাহ্মণগণও সঙ্ঘাতিক পরিত্যাগ করিয়াছে।

জীবজগৎ—বাহ্য হইতে উৎপন্ন, বাহ্যতে অবস্থিত এবং প্রলয়ে বাহ্যতে প্রবেশ করিবে—(১) জীবনেরও শক্তি সেই

* প্রণব—১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ।

(১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যতপ্রত্যন্ত্যতিসংবিশন্তি।

মূল মহাসমুদ্রের সহিত সংযোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছে; তবে হিন্দু বাঁচিবে কিরূপে? হিন্দু শক্তি পাইবে কোথায়? এক বিলুপ্ত জল যদি মনে করে যে নদী বা সমুদ্রের সহিত আমি যুক্ত হইব না, পৃথক হইয়া বাঁচিব, তবে কি জল-বিন্দুর অস্তিত্ব থাকে? না, অতল দৈন্যতে বারিবিন্দু সম—নিষেধে শুকাইয়া যায়?

সম্বা=সন্ধিস্থাপন=যোগস্থাপন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার, ক্ষুদ্র জীবের সহিত অনন্ত ভগবানের মিলন ও সংযোগ রক্ষাই—সম্বাহিক বা ভগবৎ উপসনার উদ্দেশ্য। সম্বাহিকের মন্ত্রগুলির বিশেষতঃ গায়ত্রীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিলে আমরা তাহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই—“পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গোক্ত—ত্রিলোকে বিনি পরিব্যাপ্ত; সেই অগৎ প্রসবিত। ভগবানের বরণ্য তেজোশক্তিকে আমি দ্বন্দ্বেরে ধ্যান করি; তিনি আমারে বুদ্ধিতে প্রেরণা দান করেন।” (২) সম্বা-উপাসনার মধ্য দিয়া ত্রিসম্বা অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত আনন্দের উৎস ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে থাকিলে, মানুষের আত্মবিস্তৃতির মোহ ভাঙ্গিয়া যায়; সে ক্রমে ক্রমে প্রাণনিরন্তর অল্পভব করিতে পারে যে আমি ক্ষুদ্রশক্তি জীব নই, আমি অনন্তশক্তি শিব; পাপ তাপ-দুর্লভতা আমার থাকিবে কেন? আমার শক্তি জ্ঞান-আনন্দের অভাব হইবে কেন?

মানুষ তখন অল্পভব করে—আমি ক্ষুদ্র বস্তু মানুষের দেহ নই; আমি অজর, অমর, অনন্ত শক্তি আত্মা; আমি চোপ-শোক মৃত্যুর অতীত। আমি অভীঃ। তখন মানুষ আদর্শের সাধনায়, কর্তব্যের প্রেরণায়; দারিত্র্যের উদ্যাপনায়, মর্যাদার রক্ষায় হাসিমুখে দুঃখদৈন্ত, বিপদাপদকে বরণ করে, মৃত্যুর ভয়েও কদাচ স্বার্থ-স্বকর্তব্য হইতে বিচলিত হয় না।

মানুষ তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ-ভোগ-স্বখের পণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বছর জন্ত, বৃহত্তর জন্ত, জাতির জন্ত ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস, স্বার্থ-স্বখ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত

(২) “ওঁঙ্কারঃ স্বঃ। তৎ সবিভূবরণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীরহি। ধিবোবোনঃ প্রচোদয়াৎ।”

হয় না, দিয়া আনন্দ পায়। মানুষের নিকট মানুষ তখন আর অনাচরণীয় অস্পৃশ্য থাকিতে পারে না কারণ সে দেখে—সর্বভূতে সেই এক আত্মা; এক ভগবানই অগৎ ও জীবের মধ্যে বিরটরূপে-পরিব্যাপ্ত।

হিন্দুর জীবন-সাধনা আজ পরিত্যক্ত। ধর্মের প্রথম সোপান—সম্বা উপাসনা পরিত্যাগ করার হিন্দু আজ জীবনের ও শক্তির মূল প্রসবণ ভগবানের সহিত বিচ্যুত হইয়াছে। কলে-হিন্দুর ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ভীকৃত্য, দুর্লভতা, কাপুরুষতার অধঃ ও আবিপত্য। চক্ষের সম্মুখে—জননী জায়া ভগিনী কন্যার লাহনা দেবিয়াও সে ভয়ে পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষার চেষ্টিত; মন্দির বিগ্রহ চূর্ণিত হইতে দেবিয়াও প্রাণভরে প্রতীকার প্রচেষ্টায় পরাস্ত; তাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের লাহনা ও অগমান দেবিয়াও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকে; এই একই কারণে হিন্দু আজ ক্ষুদ্রার্থে শত্রুনির হ্রাস বন্ধুদৃষ্টি; হিন্দুর নিকট হিন্দু আজ অনাচরণীয় অস্পৃশ্য। এই একই কারণে হিন্দুতে হিন্দুতে ভেদবিবাদ, হিংসাধেব, দলাদলি।

শুধু তাই নয়। ধর্মের নামে যে সকল সাধনা, অহুষ্ঠান, পূজাপার্বণাদি এখনো হিন্দুসমাজে প্রচলিত, আর মধ্যে আন্তরিকতার প্রাণস্পন্দন নাই, আছে—গতাহুগতিকতার মোহ। তথায় অহুষ্ঠানের পৌরুষ নাই; আছে—ভগ্নামি ও আত্মপ্রতারণা।

ধর্মক্ষেত্রের নেতৃবর্গের তাই অভিমত—হিন্দুজাতি-গঠন-কালে প্রথমেই আবশ্যক হিন্দু জাতি ও সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শ ও সাধনায় প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। ধর্মগ্রন্থি বিদূষিত হইলে হিন্দুজাতির বাবতীয় দোষ-ত্রুটি-দুর্লভতা অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যাইবে, তা সে সমাজেই হউক অথবা রাষ্ট্র বা আর্থিক ক্ষেত্রেই হউক।

সমাজক্ষেত্রের নেতৃবর্গের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত ভিন্ন প্রকার। তারা বলেন—ধর্মের আদর্শ ও সাধনা যদি সমাজের জনগণের জীবনে ও কর্মে কৃটিয়া উঠে তবেই ধর্ম হয় জীবন্ত; তবেই ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হিন্দুর ধর্ম আজ বেহেদান্ত পুরাণাদিতে নিবদ্ধ। সমাজে সে ধর্ম

কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। হাজার বছর বাৎসরিক বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীন হইয়া অসংখ্য অত্যাচার-উৎপীড়নের আঘাত খাইয়া হিন্দুসমাজ আজ—ছিদ্র-বিহীন, বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজের কলেবর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হইতেছে। একদিকে সম্ভ্রান্ত শক্তিম্যান মুসলমান সমাজ, অপর দিকে রাষ্ট্রশক্তি-সম্পন্ন খ্রীষ্টান সমাজ—মধ্যস্থলে দুর্বল আত্মরক্ষার অক্ষম হিন্দু সমাজ; একদিকে হিংস্র ব্যাঘ্র, অপরদিকে ক্ষুধিত সিংহ, মধ্যস্থলে মৃত্যুভয়ে সম্ভ্রান্ত ছাগ-শিশুর ন্যায় হিন্দু সমাজ। আজ সমাজকে বাঁচাইবার চেষ্টা চাই প্রথম।

এমন একদিন ছিল যখন আরব, পারস্য, আফগানিস্তান হইতে স্বাভাৱ্য, বালি, বাতা পর্য্যন্ত—ব্রিটিশ মহাদেশ ছিল হিন্দুস্থান এবং এর প্রত্যেকটি অধিবাসী ছিল হিন্দু; হিন্দুর সংখ্যা ছিল—ষাট কোটিরও অধিক। আজ হিন্দুর সংখ্যা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হইয়া ৩০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে; হিন্দুস্থানের পবিত্র সংকীর্ণ হইতে হইতে ভারতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের কতকগুলি প্রদেশে হিন্দু অপেক্ষা অহিন্দুর সংখ্যা বহু পরিমাণে বেশী হইয়াছে।

হিন্দুজাতির এই ক্ষয় বহু প্রকারে ঘটিতেছে—সমাজের বর্ষ হিন্দুগণের অত্যাচারে ও অবজ্ঞায় তথাকথিত অনাচরণীয় অপস্ফুটগণের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে, এখনো হইতেছে। বহু হিন্দুনারী ধর্ষিতা, অপকৃত্তা হইয়া অহিন্দুর কবলিত হইতেছে। বহু হিন্দু বিধবা নিপীড়িতা নিরাশ্রয়া ও প্রলোভিতা হইয়া অহিন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে নানা ছিদ্র বাহিয়া হিন্দুজাতির ক্ষয় ঘটিতেছে। সমাজ যদি না বাঁচে, তবে ধর্ম দাঁড়াইবে কোথায়? স্বতরাং সমাজের এই ক্ষয়ের পথ রুদ্ধ করিতে হইবে। তৎকাল জাতিভেদের পত্তী ভাঙিয়া দাও; অপস্ফুটতা অনাচরণীয়তার পাপ সমাজ হইতে কাটাওয়া দাও; বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা কর; ধর্ষিতা ও অপকৃত্তা হিন্দুসমাজকে সমাজে পুনর্গ্রহণ কর; ধর্মাস্তরিত নরনারী-গণকে শুদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ কর; তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর জনগণকে ধর্ম ও সমাজে সমান অধিকার দান কর। এইভাবে সমাজের ক্ষয় রোধ, আত্মরক্ষা ও সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর। সমাজ বাঁচিলে, সবল শক্তিম্যান হইলে

ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থ—সমস্তই অর্জন, রক্ষণ, বর্ধন করিতে পারিবে;—ইহাই সমাজ নেতৃবৃন্দের সাধারণ অভিযত।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। তারা বলেন,—পরাদীন, পরতন্ত্র জাতির ধর্ম কোথায়? সমাজ রক্ষায়ই বা ক্ষমতা কোথায়? আর্থিক অবস্থা, নিয়ন্ত্রণর সুযোগ ও ক্ষমতা থাকে কিরূপে? বৈদেশিক শাসকের ইচ্ছিতে যার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সমস্ত কিছু নিরস্ত্রিত, সে জাতির ধার্মিক, সামাজিক, আর্থিক প্রভৃতি সর্ববিধ কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করে তার রাষ্ট্রীয় মুক্তির উপর। রাষ্ট্রকণ্ড যদি হাতে আসে তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে, আইনের বলে ধর্মব্যবস্থা ও সমাজের সংস্কার, সংগঠন আর্থিক উদ্দেশ্যের মোচন অতি অস্বাভাবিক, অল্প সময়ের মধ্যে করে নিতে পারবে। আগে চাই—স্বরাজ, স্বাধীনতা; চাই—যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্র-দণ্ডটির অধিকারী হওয়া।

আবার অপর দিকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও মনীষীগণ দেশের আর্থিক বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদের মনোভাব মস্তব্য ভিন্ন প্রকার। তারা বলেন—যেথো দাঁও—ধর্ম সমাজ, রাষ্ট্র! আপনি বাঁচলে বাবার নাম। পেটে ভাত না দিতে পারলে ধর্মরাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-সমস্তই ঘুরে যাবে। আগে ছু'বেলা ছু'মুঠো পেট ভরে খাও, সবাই বেতে পায়, তার ব্যবস্থা কর। যে দেশের গড়পড়তা অর্জেক লোক ছু'বেলা পেটভরে বেতে পায় না, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কারের বড় বড় কথার মনোযোগ দিবার সময় ও শক্তি তাদের আছে কি? স্বতরাং, শুধু কথার চিড়ে ভিজিবে না। দেশের অল্পবস্ত্র সমস্তার সমাধান আগে দেখতে হবে। পেট ভরে খেয়ে পরে গায়ে তাগৎ যদি থাকে, তবে সবদিকেই ভাবিতে, বুঝিতে, খাটিতে পারিবে।

উপরোক্ত ভাবে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রকার ধারার চিন্তা করিয়া পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত ও কার্যপারিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক দেশের ও জাতির সমুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কারো যুক্তি বা সিদ্ধান্ত উদ্ধাইয়া ধোওয়া যায় না। প্রত্যেকের কথাই সত্য। একটা জাতির জীবনের বহু দিক আছে। শুধু ধর্মের স্মৃতি তত্ত্বও

আধ্যাত্মিক সাধনা দিয়া কোনো জাতি বাচিতে পারে না। জাতির শরীর রক্ষার জন্য অব্যবস্থাদিও আবশ্যিক। আবার সমাজবদ্ধ হইয়া নিয়ম-নীতি-নীতি-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইয়াও কোনো জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম-সমাজ-অর্থ-সম্পদ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র-শক্তির সৃষ্টি ও প্রয়োগ না করিলেও জাতি তার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। হুতরাং, ধর্মের আদর্শ ও সাধনা, সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচালনা এবং অর্থ সম্পদের অধিকার; জাতির উন্নতি অত্যাধিক, প্রয়োজন, কোনটাই বাদ দিলে চলে না। এদিক দিয় ভাবিতে গেলে দেখিব বিভিন্ন ক্ষেত্রে যনৌযৌগণ্য ও নেতৃত্বের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সবগুলিই প্রয়োজনীয় ও বিবেচ্য।

কিন্তু যিনি যে ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তই প্রকাশ এবং সমস্তা দ্বারিত যে প্রকার সমাধানই নির্দেশ করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—“যেও ধরিতে কে?” বর্তমান সমস্তার বর্তমান সমাধানই উদ্ভাবিত হউক না কেন, সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রথমেই আবশ্যিক শক্তির। সমাধানের পথের বাধাবিহীন, বিপদাপদ ঠেলিয়া চলিবার পৌরুষ ও সাহসিকতা যদি না থাকে, তবে শুধু কাগজে, পত্রে, সভায় বক্তৃতা-মঞ্চে, বন্ধু-বান্ধবের সম্মিলনে, চাহের আড্ডায় আলোচনা, হুজুর গজ্জনে কি লাভ?

হুতরাং সিদ্ধান্ত আরও ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায় শক্তির অসুশীলন ও অর্জনে চাই—সর্বোপরি। শক্তির উদ্বেগ, বিকাশ প্রকাশের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্তার সমাধানের জন্য উহার প্রয়োগ চাই। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে প্রশ্ন ওঠে—ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ—যে ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্তাই

ফলুক, সেগুলির উৎপত্তির মূল কোথায়? জাতি বখন উন্নতি-অত্যাধিকশীল ছিল, তখন তো এই সকল সমস্তা ছিল না। পরে কিরূপে, কেন এই সমস্তাগুলি উৎপন্ন হইল? কেনই বা জাতির অধঃপতন ঘটিল?

এই প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর—শক্তির অপচয় ও অভাব। নদী সরিয়া যায় কখন? কলস্রোত বতকাল ধর-প্রবাহে বহিতে থাকে, ততকাল নদী বাঁচিয়া থাকে; নদীতে চড়া পড়ে না; শৈবালদলও জমিতে পারে না। বখনই স্রোত-ধারা কীণ মন্থর হইয়া পড়ে, তখনই নদীটি মজিয়া, সরিয়া, শুকাইয়া যায়। জাতীয় জীবন নব্বন্ধেও সেই কথা। বতকাল হিন্দুর জাতীয় জীবনে শক্তির অসুশীলন ও প্রয়োগ, বিকাশ অক্ষয় ছিল; ততদিন, কোন সমস্তার শৈবালরাশি জাতীয় জীবন-নদীতে বাসা বাঁধিতে পারে নাই। বতকাল আবর্জনা জাতীয় জীবন-স্রোতের মাঝে আসিয়া পড়িত, তখনই শক্তির প্রবল প্রবাহে উহা দূরে নিষ্কাশিত হইত।

যে অন্তত যুগের হইতে জাতীয় জীবনী-শক্তি কীণ হইয়া পড়িয়াছে; জীবন-সংগ্রামে উদাসীন ও বিমূঢ় হইয়া হিন্দু জাতি স্বাধীন, আত্মরক্ষা, বিদ্রোহের নেশায় মজিতে শুরু করিয়াছিল, আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের দুর্জয় সঙ্কল্প পরিহার করিয়া স্থিতি স্থাপক কুর্খ্যুতি আশ্রয় করিল, সেই দুর্দিনেই হিন্দুর ধার্মিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক প্রকৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসংখ্য আবর্জনা ও সমস্তার শৈবালরাশি আত্ম-প্রকাশ করিয়া জাতীয় জীবন-প্রবাহকে জমাগত দুর্বলতর করিতে করিতে মৃত্যুর সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

“ধর্ম মানে বা ধারণ করে—যে শক্তি মন চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার প্রকৃতি অন্তরেস্তির বা হৃদয় শরীরকে ধারণ করিয়া আছে তাহা বানব ধর্ম। আর যে শক্তি জীবাত্মারূপে জীবদেহে বর্তমান রহিয়াছে এবং অতীতমী সাম্প্রতিক সর্বভূতে বিস্তারিত—তাহা আত্মধর্ম বা পারমার্থিক ধর্ম। স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন শারীরিক বা মানসিক ধর্ম তাহা নিত্যকাল স্থায়ী নয়। পারমার্থিক ধর্ম শাস্ত ও সনাতন—নিত্য অবিদ্যমান, এর কখনও ধ্বংস হয় না। এই সনাতন নিত্য ধর্মই—প্রকৃত ধর্ম।”

— আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

(শ্রীপ্রণবানন্দ শতরূপে শতমুখে—২য় খণ্ড, আচার্য্য-স্মৃতি ; ২৪১ পৃষ্ঠা)

হিন্দু-জগৎ

আশি লক্ষ বছরের ভারতীয় সভ্যতা

পরমেশ চৌধুরী

স্মার এলিয়ট এবং প্রফেসর জাউসন তাদের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে কড়কগুলো চমৎপ্রদ তথ্য উন্মোচন করেছেন। 'ভারিক-ঈ-গুজ্জি' নামক এক পারসিক গ্রন্থে লেখা আছে - সুলতান মাহমুদ ৭ উত্তর পশ্চিম ভারতের মার্ডিন দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস করার সময় দুর্গের ভেতরের এক খোদাই লেখা আবিষ্কার করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল 'এই দুর্গের মূল' কাঠামোটা তৈরি হয়েছিল চল্লিশ হাজার বছর আগে।' কিন্তু সুলতান নিজেকে এবং অছাত্ত মুসলমান ঐতিহাসিকরা একে আত্মগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুর্গে উল্লিখিত তারিখটা কোন মতেই ঠিক হতে পারে না। 'কোরান-এ তো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল হজরত মহম্মদের জন্মের ছ'হাজার বছর আগে। এ প্রসঙ্গে মস্তব্য করতে গিয়ে উক্ত গ্রন্থের মুসলিম লেখক বলেছেন; উক্ত খোদাই লিপি পৌত্তলিকদের মূঢ়তাই প্রকাশ করছে। কারণ, প্রথম মানব আদমের আগমনের পর থেকে হিসেব করলে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় মাত্র সাত হাজার বছর।

উপরোক্ত পাশ্চাত্য লেখকদের আরও একটা পারসিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে। গ্রন্থটার নাম 'তারিখ-ঈ-বিনাকিতি।' ফিজার শাসনকর্তার সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দীনের সঙ্গে। সে সময় সম্রাট জানতে পারলেন স্থানীয় উপাধ্যায় অহুয়ারী ফিজার রাজারা রাজত্ব করে আসছেন বিরাট হাজার আট'শ পঁচাত্তর বছর ধরে। উক্ত গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি - এগার'শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে সুলতান মাহমুদ একটা বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতরের দেয়ালের একটা খোদাই লিপি অহুয়ারে মন্দিরটা স্থাপিত হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার বছর আগে।

এ সব তথ্য কিন্তু হিন্দুদের পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সন্ধান করছে দৃঢ়ভাবে। এবোলাট এবং সি ডব্লিও লীডবীটার তাদের

'ম্যান, হোয়েন্স, হাউ এ্যাণ্ড ছইদার' নামক গ্রন্থে লিখেছেন— এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে বি সি ত্রিরাগ চি'লন দক্ষিণ ভারতীয় সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট। তিনি বিয়ে করেছিলেন বৃহস্পতিকে। তাদের সন্তানের নাম ছিল মদল। একদিন মদল নৃশ্বর শরীরে আবিস্কৃত হলেন সম্রাট ত্রিরাগের কাছে, বললেন—মদলকে আদেশ দাও যে যেন সিংহন হয়ে মিশরে যায়। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক

ভারত সেবাস্ত্রম সঙ্ঘ

নূতন টেলিফোন নম্বর

কলিকাতা প্রধান কার্যালয়—	405-178
পুরী সেবাস্ত্রম —	3227
নিউদিল্লী —	684-8181
	683-9757
ইলাহাবাদ —	605388

যুবতীদের পাঠাও। যেসব যুবক যুবতী গিথেছিল মদলের সঙ্গে মিশরে তাদের বারোজননের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। মিশরে তখন টোলটেকদের শাসন। মিশরের তখনকার ক্যাপ্টো মদল এবং তার দল বলের সঙ্গে দেখা করলেন। বহিরাগতদের প্রতি বর্ষাবিহিত সৌজন্য দেখালেন। ভারতীয়দের অনেকেই সেখানে থেকে গেলেন। ভারতীয় ও মিশরীয় রক্ত মিশে এক নতুন জাতের সৃষ্টি হলো। তবে তাদের চেহারা দেহসৌষ্ঠবে বীর্ষবস্ত্রায় আর্থদের প্রভাবটাই ছিল বেশি। মিশরের স্বাতি সোধ বা স্বত্বগুলোতে এ জাতীয় মিশরীয়দের মূর্তি চোখে পড়ে।

পুরাণে যে শাখ দ্বীপের কথা বলা হয়েছে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মতে সেটাই প্রায়টোর আটলান্টিস। পুরাণে লেখা আছে শাখ দ্বীপের অস্তিত্ব পুরাণকার বে সময় পুরাণ রচনা করছিলেন সে সময়েও ছিল। সে শাখ দ্বীপ বা আটলান্টিস

এখন আর নেই। সেটা মহাসাগরের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এগারো হাজার বছরের আরও বহু আগে (বিশেষজ্ঞদের হিসেব মতে) পুরাণ রচিত হবার বহু আগে থেকেই যে, হিন্দুরা শাখ বীপ বা আটল্যান্টিস সমুদ্রে অবস্থিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং হিন্দু সভ্যতা এগারো হাজার বছর থেকেও অনেক বেশি প্রাচীন হাবি করতে পারে।

ম্যাডাম ব্র্যাতাঙ্কির মতে আটল্যান্টিস একটা হিন্দু কাহিনী এবং তা ধার করে নিজের বলে জাহির হবার অভিযোগ খ্রীসাব্দীদের অর্জিত করা উচিত। কতগুলো ভৌগোলিক সিদ্ধান্তের জন্তও তারা হিন্দুদের কাছে স্বীকৃত।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের আর একটা ভুল ধারণা ছিল ‘রাশিচক্র’ সাক্ষ্য বাবতীয় কিছু হিন্দুরা ধার করেছে খ্রীসাব্দীদের কাছ থেকে। বেদসমী তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপন্ন করেছেন। হিন্দু রাশিচক্র বিশ্বের রাশিচক্রের থেকেও প্রাচীন। খ্রীসাব্দীদের কাছে অকটা প্রমাণ আছে তাদের রাশিচক্র ৮৭০০০ বছরের প্রাচীন। কিন্তু, হিন্দুদের রাশিচক্রের প্রাচীনতা আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছরের।

ম্যাকি তার ‘কিনিক্রিয়াডে’ যে দুঃসাহসিক বক্তব্য করেছেন তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের ঘাবড়ে দেবে। তিনি বলেছেন—‘মোটের ওপর, ল্যাভিরিন্থ পিরামিড এবং রাশিচক্র প্রভৃতি প্রাচীন মানব সভ্যতার সাক্ষ্যবহনকারীরা মানব সভ্যতার পঞ্চাশ লক্ষ বছরের বেশি আগের সাক্ষ্য বহন করে না। হিন্দুরা কিন্তু সত্তর থেকে আশি লক্ষ বছর আগেকার মানব সভ্যতার স্মারক চিহ্ন রেখে দিয়েছেন। একটা পুরনো চীনে মাটির মাছলিই তার প্রমাণ।’

আশি লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এই ধারণাটাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করছে আধুনিক যুগের কতগুলো আবিষ্কার। উত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ব্লোকে হিলে আদিম মানবের একটা মাথার খুলি পাওয়া গেছে। সেটা সংরক্ষিত রয়েছে লণ্ডনের হিষ্ট্রি মিউজিয়ামে। ওটার মাথামানে একটা পরিষ্কার গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। কোন পাথুরে অস্ত্রের আঘাত পেলে কিংবা কোন বৃহৎ প্রাণীর দাঁত বা সিং-এর ঠোঁটো খেলে ঐ ছিদ্রটা খেতে খেতে যেত, অর্ধন হুম্বর গোলাকার হয়ে থাকতো না। তাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত ওটা একটা বুলেটের ছিদ্র। চল্লিশ হাজার বছর আগেও বুলেট।

১২৬০ সালে টি জি গ্রিটসাই এবং আই জে ইয়ার্টমকে সোভিয়েত রাশিয়ার ওভেস্কাতে উপশাখী, উট এবং হারেনার কতগুলো হাড় খুঁজে পেয়েছিলেন। সেগুলো প্রায় দশ লক্ষ বছরের প্রাচীন। হৃদয় কামকর্ম রয়েছে হাড়গুলোতে। বিশেষজ্ঞরা স্বায়ে কোন হৃদয় ডাক্তর হৃদয় অস্ত্র দিয়ে কেটে কেটে চরিতার্থ করেছিলেন শিল্পীমনের বাসনা।

১২৫২ সালে রাশিয়া ও চীনের একদল পুরাতাত্ত্বিক অভিযান চালিয়েছিলেন পোবি বন্ধুভূমিতে। পুরোভাগে ছিলেন ডঃ চৌ মিজ চেন। আবিষ্কার করলেন বন্ধু পাথরের ওপর খোদিত একটা জুতোর ছাপ। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বায়ে হলেন ওটা অন্যান্য কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ বছরের কোন হুসভ্য মানবের পাথের ছাপ।

এভাবে, অস্ত্রাস্ত্র আরও অনেকগুলো আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার প্রায় কোটি বছরের প্রাচীনতাকে সুক্তিগ্রাহ ও বাস্তবসম্মত করে তোলা যায়। সৌজন্য—বর্তমান/১০ জুন, ১৯৯০।

“গুরুর আদেশই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল। শিষ্যের যাবতীয় বিভ্রম-বিভ্রান্তি, বিশ্বস্তির বোর ভাঙ্গিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, যাবতীয় দুঃখ-দৈন্ত্য দুর্বলতাকে দূর করিয়া এই আদেশই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখিবে। সুতরাং এই আদেশকে সতত স্মরণে মননে নিদিধ্যাসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।”

—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

সম্মান বাঙা

১৯৯১ সালের বর্ষশান্ত্র পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'ল

সম্মান পরিচালিত বর্ষশান্ত্র পরীক্ষা ১৯৯১-এর বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার ২৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছিল।

অন্ত, মধ্য ও অন্ত এই তিন পর্যায়ে ৫,১৭৮ জন মৌখিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪,৩৩১ জন এবং ২,৭২৭ জন লিখিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,৮২৩ জন পাশ করেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানপ্রাপ্ত কৃতী পরীক্ষার্থীর নাম:

লিখিত অন্ত

প্রথম স্থান—সুদেবা রায়—মিশন বালিকা বিদ্যালয়
(বেদিনিপুর)

দ্বিতীয় স্থান—প্রসেনজিৎ মাপদার—বকুলতলা উচ্চ
বিদ্যালয় (নবদ্বীপ)

তৃতীয় স্থান—কৌশিক পাল—বাংলাপুত্র ইউ, সি, হাই
স্কুল (বাগনান, হাওড়া)

লিখিত মধ্য

প্রথম স্থান—শংখা চক্রবর্তী—ভার্যাম্বরী উচ্চ বালিকা
বিদ্যালয় (নবদ্বীপ)

দ্বিতীয় স্থান—প্রভুবা দাস—ঐ ঐ

তৃতীয় স্থান—মৌসুমী দে—গোতান সুবোধস্বতি উচ্চ
বিদ্যালয় (প্রতাপনগর, হগলী)

লিখিত আন্ত

প্রথম স্থান—চন্দন কুমার মজদেব—কুমুদ কুমারী
ইন্সটিটিউশন (ঝাড়গ্রাম)

দ্বিতীয় স্থান—নিবোধময় মল্লিক—কুমুদ কুমারী
ইন্সটিটিউশন (ঝাড়গ্রাম)

তৃতীয় স্থান—পাণিমা রায়—বারাণাস কালীকৃষ্ণ উচ্চ
বালিকা বিদ্যালয় (মধ্য গ্রাম)

বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের নানাস্থানে হিন্দুধর্ম সম্মেলন

সম্মেলন বাকুড়া শাখা থেকে সম্মানসী, ব্রহ্মচারী ও কর্মীগণের একটি প্রচারকবাহিনী জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন, বৈদিক শাস্ত্রযজ্ঞ, হিন্দু মিলন-মন্দির গঠন, শ্রীশ্রীশ্রীপূজা, ময়বেত প্রার্থনা, ভজন-কীর্ত্তন প্রভৃতি অমুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলন ভাবধারা তথা হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির আদর্শ প্রচারে নিয়োজিত হয়েছে।

২০শে অক্টোবর তারিখে বাসনা গ্রামে স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীহরিত কুমার দেশমুখের সভাপতিত্বে অমুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনে জাতি গঠনে হিন্দু মিলন মন্দিরের উপযোগিতা বিষয়ে রক্ততা করেছেন স্বামী অরুণানন্দজী।

৩০শে অক্টোবর তারিখে খাতড়া থানার মালিয়ান গহরে অমুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তৃতা করেন অমুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীভার্যাপদ সেনগুপ্ত ছাড়াও স্বামী অরুণানন্দজী, স্বামী সুপ্রভাতানন্দজী, শ্রীমধুসূদন চন্দ্র প্রমুখ।

২ নভেম্বর তারিখে বাকুড়া গোয়েকা হাইস্কুলে অমুষ্ঠিত সম্মেলনের সভাপতি স্বামী অরুণানন্দজী, প্রবীণ জননেতা শ্রীরাধহরি চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী কৈলাস চৈতন্য, অধ্যাপক অরুণেন্দু সেনগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক শ্রীদিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভাষণ দেন।

১৫ ও ১৬ নভেম্বর হুগাঁপুয় হিন্দু মিলন-মন্দিরে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আহ্বোজিত হিন্দুধর্ম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আশিস ব্যানার্জী। ভাষণ দেন সম্মেলন-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী, স্বামী অরুণানন্দজী, ডাঃ

বৃদ্ধদেব চৌধুরী, শ্রীমত্যানারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীমদেবজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১১ নভেম্বর দুর্গাপুর বেনাচিতিতে শ্রীমদ্রথ নাথ পালের উদ্যোগে ধর্মাস্ত্রাণ হস্ত। বৈদিক যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন স্বামী অরুণানন্দজী। অষ্টচান্দ্র শেষে দুই শত দুঃস্ব কুষ্ঠ রোগীর মধ্যে কথল বিতরিত হয়।

বিষ্ণুপুরে হিন্দুধর্ম সম্মেলন

১০ই ডিসেম্বর ঝাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুর মহরে ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে এক বিরাট হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীতুলসীকান্ত মণ্ডল। সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ প্রধান অতিথির ভাষণে দেশ ও জাতিগঠনে সঙ্ঘনেতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর অবদানের বিষয় উল্লেখ করেন। স্বামী অরুণানন্দজী, স্বামী শাস্তানন্দজী, অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অনিল মুখার্জী প্রভৃতি বক্তা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাষণ দেন।

সকালে রক্ষিবৃন্দের বীরত্ব ও আত্মরক্ষামূলক লাঠি ছোয়া খেলা প্রদর্শিত হয়, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বিরাট বৈদিক শাস্ত্রযজ্ঞ-সমবেত শত শত নরনারী আহুতি প্রদান করে। তৎপরে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাচস্পতিদেবের পূজাপ্রার্থনা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কালীতীর্থ সেবাপ্রম

দাতব্য চিকিৎসালয়—বহির্বিভাগে ১৯৯০-৯১ সালে ৫০,২২২ জন বিভিন্ন ধরনের রোগী চিকিৎসিত হয়। ভগ্নাঙ্গ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-র ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্ত রোগীদের চিকিৎসা হয় :

এন্ট্রেরোপি—১২৭৯, জন, গায়নোকোলজি—১,৯৮৯, কাডিয়োলজি—১,৭৫৯, চর্ম ও শিশু বিভাগ—২,৪০৭, চক্ষু—১৭১৭, হার্বোপেডিক—৩৯৩, প্যাথোলজি—২,১০৪, ই সি ডি ৯১, বাইওপসি—২২০, এক্স-রে—১,০৬০, ড্রেসিং ও বিবিধ—১২,৩৮ জন।

কালীধামে অনকূট উৎসবে সেবাকার্য

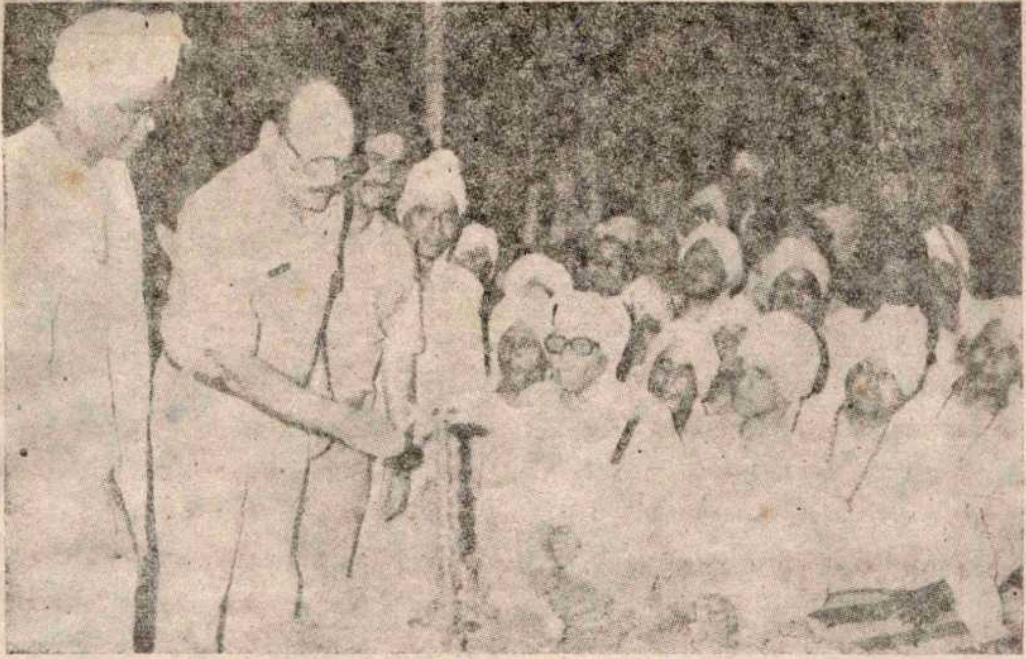
১৭ নভেম্বর, কালীধামে বিখ্যাত ও অল্পপূর্ণা মন্দিরে অগ্নি বাবের মত সন্ধ্যায় অনকূট মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্ঘের নর্যাসী ব্রহ্মচারীদের পরিচালনায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অগ্নিগিত তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীর সেবা করা হয়। সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণ নির্ভেদে ব্যক্তি অনুসন্ধান, পানীয় জল বিতরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি সেবাকার্য করে। সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে বাঙ্গালী টোলা ইন্টার কলেজের অধ্যাপক শ্রীমৎ প্রমথ ভট্টাচার্য নেতৃত্বে উক্ত কলেজের ছাত্রগণ এবং অ্যাংলো বেঙ্গলী ইন্টার কলেজের অধ্যাপক শ্রী কে, এন সিংহের নেতৃত্বে উক্ত কলেজের ছাত্রগণ যোগ দেন।

শোনপুর হরিহর ছত্র মেলা ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য

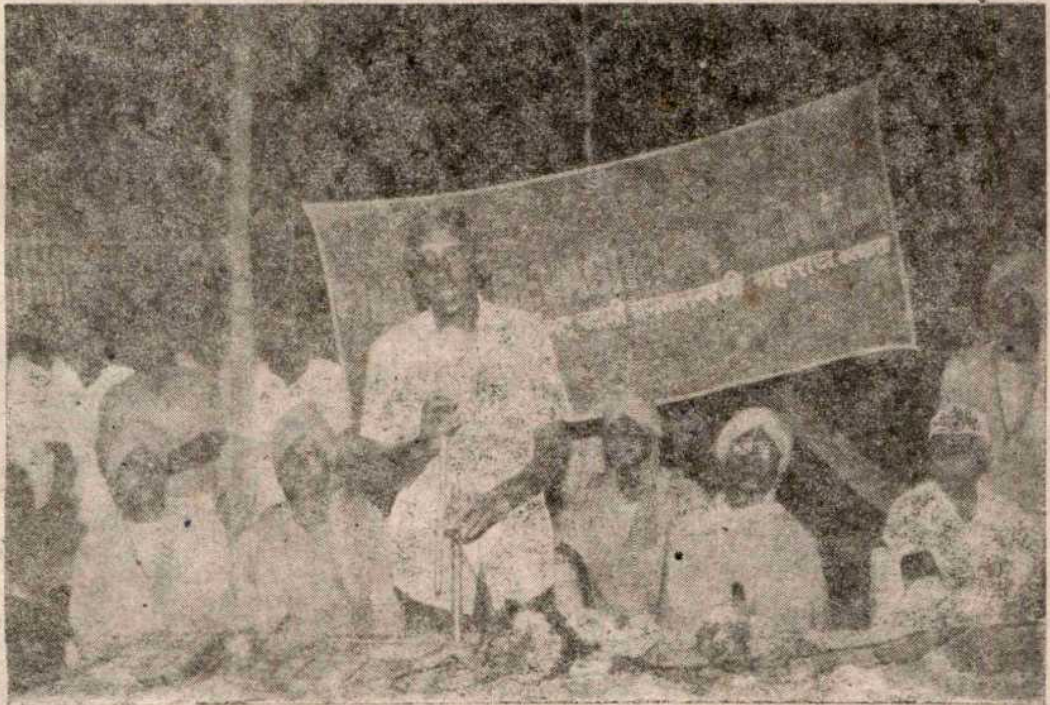
শোনপুরে বাবা হরিহরনাথ ছত্রে কাষ্টিক পূর্ণিমা উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য মেলা হয়। এই মেলাটি পশুমেলায় অন্যতম বিখ্যাত। ২১ জাহ্নবী পূর্ণিমার দিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলালু প্রসাদ যাদব মেলার শুভ উদ্বোধন করেছেন।

মেলাটিতে হাতি, ঘোড়া, উট, গবাদি পশু ও নানাবিধ প্রজাতির পাখীর প্রদর্শনী ও ক্রয়বিক্রয় হয়; এবার একটি হাতীর উচ্চমূল্য ওঠে এক লক্ষ বিশহাজার টাকা ও প্রতিদিন ৩৫ কিলো দুগ্ধ দানকারী একটি হরিনার গাভী পঞ্চত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। এই উপলক্ষে উচ্চমানের হাতী, ঘোড়া, গাভী ও বলদের প্রতিযোগিতাও হয়েছিল।

এবার প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল। এই মেলায় কুস্তি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ভারত বিখ্যাত কুস্তিগীরদের মধ্যে শ্রীমৎ রুমার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও একটি বিশাল রৌপ্য নির্মিত গদা প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীলালু প্রসাদ যাদব। প্রতিবারের মতো এবারও ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে সেবাকার্য করা হয়। স্বামী সত্যেন্দ্রানন্দজীর পরিচালনায় হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল।



নাসিক কুম্ভমেলায় সেবাকার্য ১৯৯১—মাসিক অস্থানের মাধ্যমে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার
শ্রী ডি পি মিশ্র প্রদীপ জ্বালিয়ে সজ্জের স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের উদ্বোধন করছেন।



পুলিশ কমিশনার শ্রীকমল কৃষ্ণ কাশ্যপ নাসিক কুম্ভমেলায় সজ্জের সেবাকার্যের সমাপ্তি দিবসে
এক অর্চনে ভাগবত। ১৪।২।৯১

হিন্দু মিলন-মন্দির সংবাদ

দক্ষিণ শহরতলি হিন্দু মিলন-মন্দির

দুর্গোৎসব - কলিকাতা টালিগঞ্জ এলাকায় রমা ঋষি

আশ্রমে দক্ষিণ শহরতলি হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় প্রতি বৎসরের জ্যৈষ্ঠ ও বৎসরও দুর্গপূজার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ শহরতলি হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় প্রতি বৎসরের জ্যৈষ্ঠ ও বৎসরও দুর্গপূজার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ শহরতলি হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় প্রতি বৎসরের জ্যৈষ্ঠ ও বৎসরও দুর্গপূজার আয়োজন করা হয়।

শ্রীকালীপূজা - রমা ঋষি আশ্রম প্রাক্ষে নব-কলেবরে শ্রীমহাকালীর সারা রাজবাসী মহাপূজা ও সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক শ্রাদ্ধসম্বন্ধে পরিবেশন, শক্তি সাধনার তত্ত্ব আলোচনা এবং যথাবিহিত পূজারতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজাশেষে উপস্থিত সকল দর্শনার্থী ও ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগাপুর হিন্দু মিলন-মন্দির

বস্ত্র বিতরণ - ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীধর্ম শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামী জিবিবানন্দজীর উপস্থিতিতে গত ১৩ অক্টোবর, ১৯৯১ তারিখে হিন্দু মিলন-মন্দিরের পক্ষ থেকে ২৫ জন গরীবের মধ্যে নতুন বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। শ্রীমৎস্বামী চক্রবর্তী প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা করেন।

ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ পুলিনবিহারী বিশ্বাস এবং আদিত্যকুমার রায়। গুরুপূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভূমিকম্পে সেবাকার্য - ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উত্তর ভারতে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে সেবাকার্যের জন্য মিলন-মন্দিরের সংগৃহীত ৪৫১ টাকা গত ২৬ নভেম্বর '৯১ সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত হয়েছে।

বিশেষ অনুষ্ঠান - ১৩ নভেম্বর তারিখে মন্দিরের সম্পাদক শ্রীমামিনী কৃষ্ণ দালালের গৃহে অনুষ্ঠিত সভায় ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন শ্রীমৎস্বামী

চক্রবর্তী। সভাপতিত্বে ছিলেন শ্রীমৎস্বামী পাল ও অন্যান্য। প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা করেন যুগ্ম-সম্পাদক ডাঃ পুলিন বিহারী বিশ্বাস।

রাসপূর্ণিমা উৎসব - ২১ নভেম্বর দুপুরে মিলন-মন্দিরে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম মাহান্দার শ্রীমতী করুণাময়ী সাহার গৃহে ধর্মোৎসব হয়। গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, সিদ্ধনামকীর্তন, গুরুপূজারতি অনুষ্ঠানে মিলন-মন্দিরের সদস্যগণ অংশ নেন।

সিঙ্গি (বর্ধমান) - ১৫ নভেম্বর সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা ছাড়াও দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়। ২১শে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মীর শোভাযাত্রা ও অন্যান্য ধর্মোৎসব যথারীতি হয়। এদিন কিছু দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ভারত সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে রামায়ণ গানের আসর বসে। ব্যবস্থাপনায় ছিল বিবেকানন্দ এডুকেশন সোসাইটি।

মজফেরপুর - যথারীতি বিবিধ ধর্মোৎসবের মাধ্যমে মিলন-মন্দিরে রাসপূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। সভাপতিত্বে ছিলেন শ্রীমৎস্বামী পার্শ্বসারথি দণ্ডপাট, গণেশ প্রসাদ ভিমিরে ও শিশির বিশ্বাস। গুরুপূজা ও আরতির পর প্রসাদ বিতরণিত হয়। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমৎস্বামী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিংনাড়া - ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি শ্রীঅতুল চন্দ্র মল্লিক। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক ডাঃ শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস। মিলন-মন্দিরের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীজগদীশ শিকদার। গুরুপূজা ও রামায়ণগানের শেষে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণিত হয়।

অশোকনগর (উত্তর ২৪ পরগণা) - এবারও দুর্গোৎসব উপলক্ষে ভজন-কীর্তন, ভোগ আয়ত্তি, লাঠিখেলা, ধোপান, বৈদিক বজ্র, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ধর্মোৎসব হয়। বিজয়া সম্মেলনীতে স্বামী অশোকানন্দজী বিজয়া-সম্মেলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এই উপলক্ষে 'বসে-আঁক প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী কৃতী প্রতিযোগীদের

পূরিত করা হয়। পূজা আরতির শেষে মিষ্টি বিতরণ ও ক্রীতি-কোলাকুলির পর অহুষ্ঠান শেষ হয়।

বোগাই (বীরভূম)—২৭ ও ২৮ মে ১৯৯১ তারিখে বার্ষিক উৎসব অহুষ্ঠিত হয়। অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরোজা ক মুখোপাধ্যায়। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী হিরণ্যরানন্দজী ও স্বামী শুভানন্দজী। পূজা, আরতি, বৈদিক যজ্ঞ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ।

চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান)—সংশোধন-আখিন সংখ্যা প্রণবে প্রকাশিত হিন্দু মিলন-মন্দির সংবাদে অহুষ্ঠানগুলির পরিচালনার স্বামী প্রেমানন্দজী স্থলে সেবক প্রেমানন্দ পড়তে হবে।

বিরাটী প্রণবানন্দ জয়ন্তী কমিটি

৭ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ধর্মীয় শোভাযাত্রা, গীতাপাঠ, ভজন-কীর্তন, পূজারতি, ভোগ নিবেদন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অহুষ্ঠান ছাড়াও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয়। সজ্জের প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী সিদ্ধেশ্বর-নন্দজী, স্বামী বিজয়ানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী অশোকানন্দজী, স্বামী ত্যাগাঙ্গানন্দজী প্রমুখ অহুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

দুর্গাপুর (আকবর রোড) বর্ধমান-১৪ই এবং ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১, দুই দিনব্যাপী মিলন-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে এক হিন্দু ধর্ম সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ আশিস্ ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী অরুণানন্দজী। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারতি হয়।

দ্বিতীয় দিনে (১৫/১১/৯১) সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ। জাতিগঠন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দেন শ্রীমত্যানারায়ণ ভট্টাচার্য। সভাশেষে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমদেবজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়।

বিলাসপুর (মধ্য প্রদেশ)—প্রত্যেকটি সাপ্তাহিক অহুষ্ঠান যথারীতি অহুষ্ঠিত হয়েছে। অহুষ্ঠানে স্থানীয়

ভক্তগণের প্রচুর সমাগম হয়। উপস্থিত ভক্তগণের প্রথমে গুরু-ভজন এবং অগ্রাহ্য সজ্জ-সজীভের মাধ্যমে অহুষ্ঠানগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠে। প্রত্যাহ সভার সজ্জের প্রচার ও অগ্রাহ্য বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়। একটি সেবা-দল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অহুষ্ঠান শেষে প্রত্যাহ গুরুপূজা এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়।



সম্প্রতি কলিকাতা সফরকালে বি. জে. পি. সভাপতি শ্রীমুরলী মনোহর বোশী সজ্জের প্রধান কার্যালয়ে এসে পূজা সজ্জ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বোগানন্দজী মহারাজের সহিত এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন। উপস্থিত আছেন সজ্জ-প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী।

চারণদল সংবাদ

বিহারের নানান স্থানে প্রচার

স্বামী জানীধরানন্দজীর নেতৃত্বে পরিচালিত চারণদলটি দুর্গোৎসবের পর পাটনায় এসে শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাসগৃহে শিবির স্থাপন করে সহরের বিভিন্ন স্থানে সজ্জের ভাবধারা প্রচারের সাথে সাথে উত্তর ভারতের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে আণকর্ষের জন্ত অর্থ ও অগ্রাহ্য সাহায্য উপকরণ সংগ্রহে নিয়োজিত হয়।

প্রচার-শিবিরে নিয়মিত ত্রিসঙ্খ্যা পূজা, প্রার্থনা, ভজন-কীর্তন, প্রবচন, রামায়ণ গান ছাড়াও পাটনা সিটি কালী-বাড়ী, পাটনা এয়ারপোর্ট কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থানেও অহরূপ অহুষ্ঠান হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভক্তগৃহে অহুষ্ঠিত ১৫টি ধর্মাহুষ্ঠানে চারণদলটি অংশ গ্রহণ করে।

শ্রীমদবদগীতা সন্মর্কে আলোচনা চক্র

গত ১৫ ডিসেম্বর '৯১ সজ্জের প্রণব নগর বিভাগী-ভবনে (গড়িয়া) একদিনের গীতাশিবিরের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অঙ্কঠানে সকালে ও সন্ধ্যায় বধাক্রমে শ্রীবিজয়
মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ সীতানাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন।
এগণ নগর বিজ্ঞানী-ভবন, মধ্যমপ্রায় হিন্দু মিলন-মন্দির,
ঠাহুরপুকুর প্রণবানন্দ জয়ন্তী কমিটি ও বালিগঞ্জ থেকে ৮০
জন শিক্ষার্থী সমবেত গীতাপাঠ, গীতাযজ্ঞ, গীতাচক্র ও একক
ভাবে গীতার ২য়, ৩য়, ১২শ ও ১৫শ অধ্যায় পাঠ করে।
প্রাতঃকালীন অধিবেশনে শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় বলেন—
গীতাপাঠে মানসিক চকলতা দূর হয় ও জীবন জন্মরূপে ভাবে
গঠিত হয়। সাক্ষ্য অধিবেশনে ডঃ সীতানাথ গোস্বামী
শিক্ষার্থীদের গীতাপাঠে উৎসাহ দিয়ে ভাষণ দেন। প্রধান
অতিথি শ্রীমদ্ব্যাসদেব দত্ত বলেন যে, এইরূপ উত্তোগ
একাধিকবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হলে দেশের
অশেষ কল্যাণ হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি “ভরুণের
প্রণবানন্দ” পুস্তক দেওয়া হয়।

দেহত্যাগ

ডাঃ শচীন্দ্র নাথ মণ্ডল

১৬ নভেম্বর, ১৯২১ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ
সমিতির প্রবীণ নদস্র ডাঃ শচীন্দ্র নাথ মণ্ডল তাঁর কলিকাতা
টালিগঞ্জস্থিত বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে
তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। সন্ধ্যা সংগঠনের প্রাথমিক
অবস্থায় কলিকাতা মির্জাপুর স্ট্রীট আশ্রম-ভবনে সন্ধ্যাবেলা
শ্রীমদ্ব্যাসদেবের অবস্থানকালে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে
ছাত্রাবস্থায় শচীন্দ্রনাথ তদীয় পুত্র সংস্পর্শে আসেন এবং সেই
সময়েই তিনি আচার্যদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।
তদবধি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠ-
ভাবে যুক্ত থেকে ধর্মজীবন যাপন করে গেছেন। ব্যায়ামপুষ্টি
অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ডাক্তার শচীনবাবু চিকিৎসা বিজ্ঞানে
বৃষ্টি হিসাবে শুণু গ্রহণ করেন নি, তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে
আর্তের সেবা করেছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্ত
তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর গুরুনিষ্ঠা ও
সঙ্ঘের প্রতি আস্থা ছিল প্রগাঢ়। আমরা বিদেহী
আত্মার সঙ্গতি প্রার্থনা করি।

কমলা বালা দাস

বসিরহাটের লক্ষপ্রতিষ্ঠ আইন জীবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক
ও সাহিত্যিক প্রয়াত বিজয় চন্দ্র দাসের সহধর্মিণী শ্রীমতী
কমলাবালা দাস (৭৬) গত ২৮শে কা্তিক, ১৫ই নভেম্বর,
১৯২১ তারিখে শ্রীকৃষ্ণচরণে লীন হয়েছেন। প্রথমে বিজয়
বাবু ও কমলাদেবী সন্ধ্যাবেলা শ্রীমদ্ব্যাসদেবের নিকট
মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কমলাদেবী সেবাপরায়ণা ও
সঙ্ঘের প্রতি প্রকৃতিশীলা ছিলেন। আমরা বিদেহী আত্মার
সঙ্গতি প্রার্থনা করি।

সন্ধ্যা-মহোৎসব নির্ঘণ্ট

- ১। শ্রীশ্রীআচার্যদেবের তিরোধান তিথি :
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২২, ৩০শে পৌষ, ১৩৯৮, বুধবার
- ২। শ্রীশ্রীত্রিশূলপুর্ণিমা :
১২শে জানুয়ারী, ৪ঠা মাঘ, রবিবার
- ৩। আচার্যবরণ, সংস্কার ও অন্নকূট রক্ষা :
১৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার
(বেলা ৪টার পর পুর্ণিমা লাগবে)
- ৪। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, মাঘী পুর্ণিমায়
অভিষেক, অন্নকূট, আরতি প্রভৃতি। বেলা ১১:৫২
পর্যন্ত পুর্ণিমা আছে।
- ৫। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার ভোরে সকলের আরতি,
সকালে ধ্যান ও আলীকাদ, সন্ধ্যায় দোলনা উৎসব।

শোভাযাত্রা—

১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

শ্রীশ্রীআচার্যজয়ন্তী

১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, রবিবার

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি-ব্রত

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ ত্রয়োদশী থাকছে ঘ ২:৩৮:৪৪
পর্যন্ত। তারপর চতুর্দশী। এই দিন রাতে চতুর্দশী বিধায়
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত উদ্ঘোষিত হবে সোমবার।

দোলযাত্রা

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, বুধবার পুর্ণিমা রাত্রি ঘ ১১:৪৭:৪২
পর্যন্ত আছে। ভোরে সূর্যোদয় পাচ্ছে। এই দিনই
দোলোৎসব হবে।

শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচর্য্যম্

শ্রীশ্রী বেদানন্দ

তরুণ সমাজের দরদী, মরমী, বাখার-বাখী, আজন্ম উদ্বিগ্নতা, অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন সজ্জনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যাদেবের অমৃতোপম সাধনোপদেশ। সংযম ও শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র গঠনেচ্ছু বালক, যুবক ও ছাত্রছাত্রীগণের অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য—পাঁচ টাকা

জীবন সাধনার পথে

শ্রীশ্রী আত্মানন্দ

দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদাপদ আসে তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীশ্রীসজ্জনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট উপায় ও কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ। বালক বৃদ্ধ, যুবা, ছাত্রছাত্রী, গৃহী-সন্ন্যাসী, দেশসেবক নির্বিশেষে প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই ইহাতে নিজ নিজ কর্তব্য নির্দ্ধারণে পথের সন্ধান পাইবেন।

মূল্য—দশ টাকা

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

মূল্য—৪০ টাকা

ঐ ইংরেজী সংস্করণ :

Essence of Hinduism

Price—Rs. 75/

লিখেছেন—আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ ও কলিকাতা উচ্চ আদালতের ভূতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি ডঃ তুর্গাদাস বসু, সরস্বতী প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক এই গ্রন্থটিতে বিদ্বৎ গ্রন্থকার ‘হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও মর্মবাণী কি?—তা’ বহু শাস্ত্রীয় তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন। জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির স্বত্বাধিকার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে অর্পণ করেছেন।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যাদেব বিষয়ে গবেষণা ধর্মী ও

তথ্যপূর্ণ দুটি অমূল্য গ্রন্থ

সম্পাদনা—শ্রীশ্রী নির্মলানন্দ

আচার্য্য শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ

মূল্য আট টাকা

শতাব্দীর নবজাগরণ ও শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মূল্য এক টাকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

শ্রী শ্রীমুগার্চ্য জীবনচরিত

শ্রীমৎ বামী বোলালক্ষ্মী মঙ্গলাধিত

চরিত্র নেবাশ্রম-সম্বল প্রভিষ্ঠিতা মুগার্চ্য শ্রীমৎ বামী প্রমথলক্ষ্মী মহারাজের
তনঃকন্যা দিব্য যৌবনো বৈচিত্র্যপূর্ণা নটনা-মহাভ, তদায়া ধর্মভিত্তিতে ব্যক্তিগত বৎস তারত
নেবাশ্রম-সম্বল প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দ্বন্দ্বা-বৈক কৃষ্ণবিক্রমের দ্বারা সমাপিত পান্ডিত্য ভাষায়
মঙ্গলাপুট জীবন-আলেখ্য। অক্ষেন্দ্রে মুদ্রিত নম্বলেনবরে প্রকাশিত ৫০০ পৃষ্ঠার প্রায় ৪১ টাকা

শ্রীমুগার্চ্যদেব বিহরে পদ্যশাবলী ও তব্যপূর্ণ দ্বিটি পুস্তক

মৃত্যুপূর্ব নবজানরণ ও আচার্য্য বামী প্রণয়নঃ কৃষ্ণা-এক টাকা

আচার্য্য বামী প্রণয়নঃ ও শ্রীমুগার্চ্যদেবঃ কৃষ্ণা-আট টাকা

সম্বল নুতন গ্রন্থ

শ্রীগুরুসঙ্গে : শ্রীগুরু শ্রমঙ্গে

অক্ষেন্দ্রে ছাপা

মুদ্রন বাঁবাই ৪০০০

অন্য ৪০০ পৃষ্ঠার এই গুস্তকের প্রথম পর্যায়ের
এগারোটি অধ্যায়ে আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত
আচার্য্যদেবের পুত্র মঙ্গ লাভের কথা এবং আচার্য্য-
দেবের অমৃত উপদেশাবলী। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের
আছে সম্বলেনতা : শ্রী শ্রী আচার্য্যদেবের মহাজীবনের
উপর লিখিত ৩৮টি স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধ এবং তার সঙ্গে
আছে সম্বল দীক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও উপবিধি-
শ্রীগুরুপূজাবতি প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ক বিধি
আলোচনা। প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে আনন্দ
দিয়ে এবং সম্বল ও সম্বলেনতা দিব্য মহাজীবনের
উপর নুতন আলোকপাত করবে।

শ্রী শ্রীমুগার্চ্য মঙ্গল

উপদেশাবলী

শ্রীমৎ বামী বোলালক্ষ্মী মঙ্গলাধিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীমুগার্চ্যদেবের অমৃত উপদেশাবলী নীমা-
মহাভারত ও মঙ্গলী মঙ্গল-সংকলিত শ্রীমৎ বামী বোলা-
লক্ষ্মী ওদীর সাবল-সাবলেনতা বৈচিত্র্য পদ্যশাবলী
মঙ্গলগ্রন্থের তত্ত্ব নাথিয়ে এসে যে দিনগুলি সম্বলিত
বয়েসিদের, আচার্য্য মুগার্চ্যদেবের একটি তারই অমৃত
প্রকাশন। তখন মুগার্চ্য ও বিদ্যাব্যাসের নৈতিক
জীবন পঠনের অমৃত উপদেশাবলী প্রভৃতি হইবে
হয়ে তাবলভ্য ও স্থাপত্য তারই মুটে উঠবে।

কৃষ্ণা - কুড়ি টাকা মাত্র

জীবনচরিত্র নেবাশ্রম

২১১, দ্বাদশবিহারা এতিমিট, কলিকাতা-১১

ফোন-৪০৫-১৭৮

প্রথম কাশ্যালয় : ২১১, দ্বাদশবিহারা এতিমিট, কলিকাতা-১১, ফোন : ৪০৫-১৭৮ দ্বিতীয় বামী কাশ্যালয়

কৃষ্ণ প্রকাশিত এবং তার দ্বারা প্রকাশিত : প্রথম : ২১১, দ্বাদশবিহারা এতিমিট, কলিকাতা-১১

দ্বিতীয় : ২১১, দ্বাদশবিহারা এতিমিট

ভারত মেব্রাশ্রম সংঘের মাসিক মুখপত্র

অজস্র

ধর্ম ও জাতীয়তার বাণী



৬৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
মার্চ, ১৩৪৮

বার্ষিক দ্বিতীয়—২৫'০০
অতি সংখ্যা—২'০০

সন্মেলন ধর্ম ও জাতীয়তামূলক গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীআচার্যদেবের জীবনী ও		বারো মাসে তেরো পাঠ্য		অঙ্কলি	
বাণীমূলক		কি ও কেন ?		সম্ম-সঙ্গীত চমকিকা	
বুগাচার্য জীবন-চরিত	৪৫.০০	হিন্দু ধর্মের সারসংক্ষেপ	৪০.০০	ঐ শ্রবণলিপি	২০.০০
শ্রীশ্রীগঙ্গাচার্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত ২০.০০		Essence of Hinduism 75.০০		বিবিধ	
মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী		গুরুপূজা ও গুরুভক্তিমূলক		হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা	
প্রণবানন্দ	১০.০০	শ্রীশ্রীসদগুরু	১.০০	যুগধর্ম	২.০০
কঠে কঠে করুণা কথা ১ম খণ্ড	৮.০০	জগদগুরু	২.০০	শ্রীশ্রীদাম্বাবণী	১৫.০০
ঐ ৮ম খণ্ড	৬.০০	গঙ্গায়াহাওয়া ও	৩.০০	ঐ বারভারত	৫.০০
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ শতরূপেশতমুখে ১ম ২৬.০০		গঙ্গায়াগর জীর্ণের কথা	৩.০০	বিদ্যুৎ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও	
" " " ২য় খণ্ড	৩০.০০	গঙ্গায়াহাওয়া ও কৃত্য	৪.০০	সাহিত্যকর্ম	
" " " ৩য় খণ্ড	৩০.০০	ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনমূলক		সম্ম-সাধক চরিতমালা (২য়)	
শ্রীগুরুসঙ্গে ও শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে		হিন্দুধর্ম	৫.০০	খ্রিস্টানত্ব ও খ্রিস্টলোৎসব	
প্রণবানন্দোপদেশ	২.০০	হিন্দু হুঁশিয়ার	৫.০০	পণপ্রথা সমাজের কলঙ্ক	
চরুণের প্রণবানন্দ	১.০০	চেতনার ভাঙে হিন্দু	৮.০০	শ্রীশ্রীআচার্যদেবের কটো	
শিঙের প্রণবানন্দ	৪.০০	হিন্দুধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য	১৬.০০	জীবনলীলা	
দাম্বাবণী	২০.০০	মহাজাতি গঠনে হিন্দুধর্ম	১৪.০০	বড় বসায় ফটো	
প্রণবানন্দ স্মৃতিচয়ন	১০.০০	শ্রীকৃষ্ণ	২.০০	ছোট বসায় ফটো	
Reflections on Hinduism 15.০০		আদর্শ শিক্ষাপ্রচারমূলক		খ্রিস্ট হাতে " (মাঝারী)	
Ten Divine Messages 9.00		Ideals of Indian Education & Culture 35.00		খ্রিস্ট হাতে " (বড়)	
Foundation of Religion 10.00		সুভাসিতম	১২.০০	লকেট	
The Divine Life Builder 5.00		ঐ ২য়	১২.০০	লকেট	
Acharya Pranabavanda 20.00		আদর্শ বিজ্ঞানী	১.০০	হিন্দী গ্রন্থাবলী	
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও		শিক্ষা সমস্যার সমাধানকোনপথে? ১৫.০০		জীবন-চরিত	
শ্রীশ্রীপ্রণব যত		শাস্ত্রীয় গ্রন্থ		বাণী ও নির্দেশ	
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ		শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৪০.০০	ভারত যে গুরুপূজা (বহু)	
শতাব্দীর নবজাগরণ ও		ঐ গুরুমুখী ভাষ্য	২৮.০০	হিন্দুধর্ম	
আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ		শ্রীশ্রীগুরুসীতা	১৫.০০	ব্রহ্মচর্য	
জাতিগঠনমূলক		গুরুমুখী রামায়ণ	১২.০০	সম্মাবণী	
ব্রহ্মচর্য		গুরুমুখী মহাভারত	১২.০০	স্বামী প্রণবানন্দকে	
গাইহ্য		শিঙের রামায়ণ	৩.০০	জীবন কী বাঁকিয়া	
জীবন সাধনার পথে		শিঙের মহাভারত	৫.০০	জীবন সাধনা কে পথপর	
পাথের		ছাত্রদের রামায়ণ	১০.০০	গঙ্গায়াহাওয়া ও	
সাধনবাণী		ঈশ্বরগীতা	১৪.০০	গঙ্গায়াগর কী কথা	
পবেষণামূলক কয়েকখানি গ্রন্থ		কবিতা ও গান			
বেবেবেবী ও তাঁদের বাহন		প্রতিজ্ঞা	১.০০		
হুই দেবী		সম্মবিষাণ	৪.০০		

জ্ঞানবিষয়—ভারতমণ্ডল স্বতন্ত্র দিতে হয়। দশ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ডি-পি-পি করা হয় না।

চিঠিপথে পুরা নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—(ক) ভারত সেবাশ্রম সম্ম, ২১১ রামগিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১২, ফোন-৪০৫-১৭৮

(খ) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ জামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন-৩১-১৪৭২

(গ) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

(ঘ) অরুণ পুস্তকালয়—১২১২-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রণব—মাস, ১৩৯৮

সূচীপত্র

১। যুগবাণী	...	ঐশ্রীযুগাচার্য	৩৬৩
২। ঐশ্রীযুগাচার্যের যুগবাণী	...	"	৩৬৪
৩। ৮মাসী পূর্ণিমার মহাপ্রকাশ	...	সম্পাদক	৩৬৫
৪। রেখো তোমারি চরণ রেণুপ্রোভে (কবিতা)	...	ঐশ্রী আর্ধ্য পালিত	৩৭১
৫। স্বপ্নে আনন্দধারা (কবিতা)	...	ঐজগদ্রাধ সান্তাল	৩৭১
৬। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ	...	ঐহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	৩৭২
৭। সংস্কৃতি	...	ঐস্বর্ধীয় কুমার রায়	৩৭৪
৮। শ্রবন্ত (কবিতা)	...	ঐমতী মণিহীণা	৩৭৮
৯। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা	...	ঐঅশোক কুমার বসু	৩৭৯
১০। মন্তব্য-প্রচারের নৃত্তিকণা	...	স্বামী বৃন্দানন্দ	৩৮২
১১। কঠোপনিষদ	...	ডঃ সীতানাথ গোস্বামী	৩৮৭
১২। গঙ্গাসাগর	...	ঐপারিজাত আয়কত	৩৯০
১৩। জননী জন্মভূমি (কবিতা)	...	ঐমদনমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৯১
১৪। দেবী সরস্বতী	...	ঐদীপেন রাহা	৩৯২
১৫। মন্তব্যবর্তী	...		৩৯৩

প্রণবের নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি

১। বৈশাখে বর্ষ শুরু। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা পচিশ টাকা; প্রতি সংখ্যা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা গ্রাহক নম্বর এবং নতুন গ্রাহক 'নতুন' কথাটি লিখবেন।

৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে দেওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিন। বার বার ডাকের গোলমাল হলে Post Master General, West Bengal Circle Calcutta-1 ঠিকানায় লিখুন।

৪। চাঁদার মেয়াদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ যাবে। সেই অনুসারে চাঁদা পাঠাবেন।

৫। প্রণব অফিসে এসে চাঁদা জমা দেওয়ার সময়—থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মি: থেকে ৫-৩০।

৬। চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই-পোস্টকার্ড প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি

১। সাধারণত: ধর্ম, দর্শন, শিক্কা, সংস্কৃতি, পুরা-কীর্তি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখক গণের মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক দায়ী নহেন। আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশিত হয় না।

২। রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করবেন। তা না হলে লেখা বিবেচিত হয় না।

৩। কাগজের একপিঠে দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখবেন। অস্পষ্ট ও চুর্বোধ্য হাতের লেখা গৃহীত হয় না।

৪। লেখক কপি রেখে তাঁর পুরো নাম ঠিকানা সহ লেখা পাঠাবেন। অননুমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। লেখার সাথে স্বাক্ষর, পোস্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন না। লেখা স্বনোদিত হলে আমরাই জানিয়ে দেব, কিন্তু লেখা ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে পত্রালাপের

জন্য অনুরোধ করবেন না। ইতি—প্রণব সম্পাদক

FOR PEACE OF MIND

Whether an individual or a corporate body, an entrepreneur or a farmer you and your property are always exposed to various risks. The anxiety of a calamity, accident or burglary is always there haunting you and your own.

Now you have someone to whom you can transfer this risk.

Making your anxiety sure and providing you with a sense of well-being in return, is the very heart of

our business. We take over the risk that threaten your life and property, business and profits and convert them into a worry-free security. Valuable as it is, this peace of mind is easy to acquire, when you have the friendly guidance of National Insurance. To help you get the best protection anytime, anywhere. Get to know us. And get peace of mind.

NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD.

(A Subsidiary of General Insurance Corporation of India)

Head Office : -3, Middleton Street, Calcutta—700 071

Dedicated to a growing sense of security.

প্রণব

ধর্ম কি ?

ত্যাগ

সংযম

সত্য

ব্রহ্মচর্য



মহাপুণ্য কি ?

বীরত্ব

পুরুষত্ব

মনুষ্যত্ব

মুমুকুত্ব

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

৬৫তম বর্ষ, দশম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৯৮

সম্পাদক—স্বামী নির্ম্মলানন্দ

{ প্রণব কার্যালয় : ২১১, রাসবিহারী
এভিনিউ, কলি-১৯, ফোন ৪০৫-১৭৮

যুগবাণী

“এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহা মিলনের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়, মহামুক্তির যুগ।
যাও তোমরা অনন্ত অসীম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীকে সঙ্ঘের মহামুক্তির বাণী শুনাইও, অক্লান্ত অধ্যবসায় অবিচলিত ধৈর্য্য
সহিষ্ণুতা সহকারে সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণপূর্বক সর্বত্র সঙ্ঘের বিজয়-বৈজন্তী উড্ডীন কর।”

—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রী শ্রী যুগাচার্যের যুগবাণী

সঙ্ঘ-মন্ত্র

“সর্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায় তাঁহার আশীর্ব্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া পুণ্যময়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপূরে তোমাদের সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।”

“মাঘী পূর্ণিমা তোমাদের সঙ্ঘনেতার তপঃশক্তি তপঃস্বেজের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশের শুভ দিন। ঐ দিন ঐ সময় যাহাতে সেই তপঃশক্তি তপঃস্বেজ গ্রহণ করিতে পার তজ্জ্ঞ নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তোল।”

“সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সঙ্ঘের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তোমাদের সঙ্ঘের শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যখন শত সহস্র লোক এই সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন-জনমের উদ্দেশ্য লাভে সফলমনোরথ হইবে।”

“সর্বনিয়ন্তা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া জগতের মহা কল্যাণ-সাধন করিবেন। এমন সময় শীঘ্র আসিতেছে যখন সঙ্ঘের সংযম-সাধনার প্রবল প্রভাবে সমগ্র দেশ প্রভাবান্বিত হইবে।”

“এই সঙ্ঘ কোন সাধারণ আশ্রম, মঠ বা সেবা প্রতিষ্ঠান নহু। সর্বনিয়ন্তার বিশেষ ইচ্ছায় এই সঙ্ঘ উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই অমোঘ নির্দেশে ইহা পরিচালিত হইতেছে।

“আজ যদি বুদ্ধ, শঙ্কর, হ্রীচৈতন্য থাকিতেন তাহা হইলেই ঠিক ঠিক বুঝিতেন যে এই সঙ্ঘ কোন সঙ্ঘ।”

“সঙ্ঘকে যথার্থরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর। সঙ্ঘের আশ্রিত, শরণাগত ও শরণাপন্ন যাহারা তাহারা আজ বিশেষ সৌভাগ্যবান ও তাহাদের জীবন অতীব নিরাপদ।”

“সর্বনিয়ন্তার নেতৃত্বে আজ তোমরা যে মহাত্রতে ব্রতী হইয়াছ, সেই স্তমহান সৌভাগ্য বিশেষ মুকুটিলক জীবন ভিন্ন কাহারও ঘটিতে পারে না। সঙ্ঘকে ঠিক ঠিক ধরিয়া থাকিতে পারিলে সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিত হইয়াও তোমাদিগকে কোনও রূপে বিভ্রত করিতে পারিবে না।”

“এমন কোন প্রলোভন আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই, যাহা তোমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে, যদি তোমরা সঙ্ঘের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পার।”

মাঘী পূর্ণিমার মহাপ্রকাশ

[সম্পাদক]

মাঘী পূর্ণিমা তিথি সজ্জের পক্ষে তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে এক মহাবরণা ও অরণীয় দিন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এই পূণ্য দিনটি আলোকিত ক'রেই আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সজ্জের প্রাণ-পুরুষ যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এই পূণ্য দিনেই তদীয় যোগসিদ্ধি-লাভ এবং তৎপরবর্তী মাঘী পূর্ণিমায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কর্তৃক মহাসজ্জের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

এই মহাসজ্জই শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের জগৎকলাপ-ব্রত উদ্যাপনের সাধন-যন্ত্র। মঠ, মন্দির, আশ্রম, সজ্জ সাধারণতঃ যে ভাবে কোন মানুষের বা কিছু মানুষের সদিচ্ছাপ্রসূত পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে উঠে, এই মহাসজ্জের আবির্ভাব সেরূপ কোন প্রাকৃত উপায় আশ্রয়ে হয় নি। এই মহাসজ্জের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে সর্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায়। স্বয়ং আচার্য্য বলেছেন “সর্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায় তাঁহার আশিস্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া পুণ্যময়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তোমাদের সজ্জের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ঐ শুভদিন, ঐ শুভ সময়ের মূল্য অনেকে হয়তো না ধরিতে ও না বুঝিতে পারে, কিন্তু তোমাদের উহা সম ক উপলব্ধি করিতে হইবে।”

সতাই তো ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বাজিতপুরের স্থায় এক অখ্যাত গ্রামের এক অখ্যাত পরিবারে যে মহামানবের দিবা জন্ম, তিনি কে, কি ভাবী উজ্জল সম্ভাবনা বহন ক'রে তিনি মাটির পৃথিবীতে এলেন, কে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল? কঠোর কৃষ্ণ ও

যোগসাধন স্বীকারপূর্বক ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যিনি পূর্ণ সিদ্ধিবিমণ্ডিত, তাঁর সেই যুগসাধন ও যোগসিদ্ধির রহস্যই বা কয়জন বুঝেছিল? আবার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রামের এক জলাভূমির শেওড়া জঙ্গল কেটে কিছটা জমি ভরাট ক'রে ছোট একটি পর্ণকুটির প্রস্তুতপূর্বক অনাড়ম্বর উৎসব উদ্যাপনের মাধ্যমে যিনি সেবা-শ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, সেই গ্রাম্য আশ্রমের ভবিষ্যৎই বা কার পরিজ্ঞাত ছিল? কেহ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল এই মহাপুরুষের মহাভাগবত ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়েই আসছে যুগসমস্তার সমাধানের বাস্তব ইঙ্গিত? লক্ষ লক্ষ সংসার-তাপিত নরনারীর জীবনে আসছে শান্তি ও সান্ত্বনার অমিয় ধারা? সহস্র সহস্র সংঘম ও ব্রহ্মচর্য্যহীন তরুণের ভিতরে আসছে শক্তিসাধনার অমোঘ বীর্ঘ্য? নিয়ে আসছেন তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনের নবীন ধর্ম্মচক্র ও কর্ম্মচক্র। আর কণ্ঠে মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমঘর্ষ ও মহামুক্তির কণ্বনির্ঘোষ? ইনিই সর্ব-নিয়ন্তার সাক্ষাৎ মূর্ত্তবিগ্রহরূপে গড়বেন এক মহা-সজ্জ যার ভিতর দিয়ে তাঁর অভীষ্ট সঙ্কলিত যুগব্রত নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, সে কথাই বা কে অনুমান করতে পেরেছিল? কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁর আচরণে, সাধনে, বচনে এমন সকল অলৌকিক লক্ষণ ফুটে উঠেছিল, যার ভিতর দিয়ে তদীয় আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীরা বুঝতে শুরু করেছিলেন— এই বাঙ্গল সামান্ত্র নন—ইনি অসাধারণ। বাল্যাবধি সংসারে অনাসক্তি, সর্বদা ধ্যানপরায়ণতা ও যোগ-নিষ্ঠা, কঠোর সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যানিষ্ঠ, শরীর

ধারণার্থে কেবল লবণাম্ভোজী, স্বল্পবাক, স্বল্পনিদ্র — মহাযোগীর সমস্ত লক্ষণে তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বাল্যেই যেন্ আশ্রমের মত জ্বলছেন। শরীরে ও মনে বিপুল শক্তিধর। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে যোগ-সিদ্ধি, একুশ বৎসর বয়সে সজ্জ গঠন, অতঃপর মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সের ভিতর সারা ভারতে তদীয় সজ্জের শাখা বিস্তার এবং ধর্মপ্রচার, তীর্থসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও সমাজগঠন, জনসেবা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মক্ষেত্রের প্রদান। পরাধীন ভারতের অধ্যাত্ম মহামুক্তির সঙ্কল্পে তিনি তদীয় সর্বশক্তি নিয়োজন পূর্বক অক্লান্ত কর্মযোগী। ভারতের মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষেরা যুগের বিশেষ ক্রান্তির সময়েই অবতীর্ণ হন এবং জাতিকে রক্ষা করে যান। ধর্মের গ্রানি নিরাকরণ পূর্বক সনাতন বেদধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগের পুরুষদের জন্ম ও কর্ম সমস্তই দিব্য। সাধারণ বদ্ধ জীবের ছায় এঁরা অদৃষ্টবশে কর্মফলভোগের জন্ত সংসারে আসেন না, আসেন বদ্ধজীবের মহামুক্তির কারণে। এঁরা যুগের চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে যান। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজও এই স্তরের অন্ততম যুগপুরুষ।

কৈশোরে যখন তিনি মৃতের কপাল হস্তে বৈরাগ্য-চিন্তায় ও আত্মধ্যানে সদা মগ্ন, তখন তদীয় অগ্রজা ভগ্নী হেমাজিনী মৃত কপাল অশুচি, সুতরাং পরিত্যক্ত—এইরূপ মন্তব্য করেন। বালযোগী বুদ্ধিয়ে দেন তাঁর নিজ সাধন রহস্য। অতঃপর নিজ শরীর দেখিয়ে বলেন—“এই দেহেই দেবতার অধিষ্ঠান।” আরো বলেন—“দেখো, আমি কি হই। আমি এমন হব যে মানুষ আমাকে তিল তিল করে পাবে না।” ভাগবত চেননা যে তাঁর আজন্ম, এই উক্তি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। উত্তরকালে

তদীয় ভাগবত ঐশ্বর্য্য মেঘনিম্নুক্ত আকাশে দীপ্ত সূর্যালোকের ছায় স্বতঃ বিকিরিত হয়েছিল। মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে। তদীয় শ্রীমুখেও সেই ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ মধ্যে মধ্যে অভিব্যক্ত। একস্থানে বলেন—“স্বয়ং সর্বনিয়ন্তা তোমাদের সজ্জের পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে কেহ চালাকি, চাতুরী করিয়া সজ্জকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ হইবে।” তার পরই বজ্রগর্জনে বলেন—“এ সজ্জ—কোন আশ্রম, মঠ, অফিস বা রিলিফ সেন্টার নয়। এখানে ঠিক ঠিক বিবেক-রৈরাগ্যবান মোক্ষার্থী ভিন্ন কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে না।” জ্ঞানৈক সন্তানকে লেখেন “সর্বনিয়ন্তার নেতৃত্বে আজ তোমরা যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ, এই স্তমহান সৌভাগ্য বিশেষ শুকুতিলক জীবন ভিন্ন কাহারো ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। আজ তোমরা হীন-অস্ত্যজকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্ত, পতিতকে উদ্ধারের পথে সাহায্য করিবার জন্ত মহামহীয়ান পুরুষের দ্বারা এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ।” সন্তানগণের চেতনায় অভয় ও আশ্বাস সঞ্চারপূর্বক বলেন—“তোমাদের ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই যদি সজ্জের ও সজ্জ-নেতার বাণীকে বেদবাণী অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক ধরিয়া থাকিতে পার।” ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি বশে সজ্জসন্তানেরা তদীয় ভাগবত মহিমার গুরুত্ব ভুলে না যায়। তজ্জন্ত দৃষ্ট কণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারিত হল—“সাবধান সজ্জসন্তান, স্মরণ রাখিও তুমি কাহার আশ্রিত, কাহার শরণাপন্ন, কোন্ শক্তির বলে তুমি বলীয়ান, কোন্ শক্তির তেজে তুমি তেজীয়ান। ঠিক ঠিক ভাবে যদি তুমি সজ্জনেতাকে ধরিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তোমাকে সঙ্কল

হইতে বিচলিত করিতে পারে। এ জগতে এমন কোন শক্তি আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই যাহা তোমার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং, তুমি সিংহবিক্রমে অগ্রসর হও, তোমার আশ্রয়দাতার উপর অচল অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া চলিতে থাক—তবেই নিশ্চিত জ্ঞানিও সিদ্ধি তোমার করতলগত।”

তদীয় শ্রীহস্তে রচিত সঙ্ঘ যেমন কোন প্রাকৃত মঠ, মন্দির, আশ্রম পর্যায়ের সংস্থা নয়, পরন্তু এই সঙ্ঘ সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় অপ্রাকৃত অধ্যাত্ম মহিমায় আবিস্কৃত, তেমনি যিনি এই মহাসঙ্ঘের প্রাণপুরুষ তিনিও কোন প্রাকৃত নেতা, নিয়ন্তা, পরিচালক, সংগঠক, কর্মী নহেন, কঠোর তপস্যাবলে তিনি স্বয়ং নিজ পরিশুদ্ধ জীবনে ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। তিনি পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণভগবন্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মবৈভবতি। তাই আপন অধ্যাত্ম ব্যক্তির সমাচার আপন শ্রীমুখে নির্দিষ্ট প্রকাশে সর্বদা মুক্তকণ্ঠে। সত্যমুখী স্বয়ং বচন ও আচরণ এইরূপই হয়। সেখানে কোন বাকের কুহেলি থাকে না। তাঁর বক্তব্য হয় অতিশয় স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ। রেখে ঢেকে কিছু তিনি বলেন না। তিনি যা বলেন তা অতি খোলা কথা।

সাময়িক বিভ্রান্ত এক নবীন সেবক এই ভাগবত পুরুষের সান্নিধ্য ত্যাগ করে শাস্তি লাভের আশায় যখন স্থানান্তরে যেতে উচ্ছত, তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে তিনি তাকে যে স্বরণীয় চিঠিখানা লিখেছিলেন, তাতে তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত ব্যক্তির মহতী দীপ্তিটি অতীব দৃষ্ট তেজে তুলে ধরেছিলেন—এত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না—তিনি কে ?

তিনি লিখেছেন—“মনের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া শাস্তি লাভের আশায় স্থানান্তরে যাইবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া চঞ্চলতা বাড়িবে বই কমিবে না। নিষেধবাণী না শুনা সবেও পুনঃ পুনঃ অযাচিত ভাবে উপদেশ দেওয়ার কারণ এই যে—মনের এইরূপ চঞ্চলতা লইয়া তুমি স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তোমার ধর্মজীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। একথার পরও যদি তুমি জেদ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক হও তবে তোমার বিষম ভুল হইবে—যাহা জীবনে আর সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এই সমস্ত কথার পর তোমার মনে হইতে পারে—যে ব্যক্তি আমাকে নিষেধ করিতেছে—সে কোন ব্যক্তি ? সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎবেত্তা কিনা ? সে ব্যক্তি অন্তশ্চক্ষুবিশিষ্ট কিনা ? সে ব্যক্তি সিদ্ধ-সমাহিত কিনা ?

কিন্তু যে ব্যক্তির নিষেধবাণী উপেক্ষা করিয়া অকাতরে তুমি স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইয়াছ—যে কোন সিদ্ধ-সমাহিত মহাপুরুষ সেই ব্যক্তির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত কিনা সন্দেহ। যদি কোন দিন প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব কোন ব্যক্তির নিকট উদ্ভেদ হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তিকে তোমাকে যে ব্যক্তি স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিতেছে সে ব্যক্তি অন্তশ্চক্ষুবিশিষ্ট বা ভূত-ভবিষ্যৎ-বেত্তা কিনা ? যাবতীয় ধর্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্ভেদ হইয়াছে কিনা ? তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ, তাই নানারূপ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া সাময়িক আনন্দ পাইতেছ। যে পর্য্যন্ত কর্মক্ষেত্রে না যাওয়া যায় সেই পর্য্যন্তই কালনিক সুখ ভোগ করা যায়।

কর্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িলে নিজের সমস্ত চিন্তা যে অলীক তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।”

তারপর লিখছেন—“তুমি সুখে শাস্তিতে এবং নিতান্ত নিরাপদে ছিলে যে পর্য্যন্ত তুমি Blind follower ছিলে। যখন হইতে তুমি ভাবিয়াছ — আমি আর Blind follower নই, আমারও নিজের একটা ব্যক্তিত্ব অস্তিত্ব আছে, তখন হইতেই তোমার ভিতরে নানা দুর্ব্বলতা ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। পার্থিব জগতে সাধারণ মানুষের নিকট সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যে সিদ্ধ-সমাহিত মহাপুরুষদের নিকট সাধারণ মানুষের আবার একটা ব্যক্তিত্ব কি?”

সাধন-জীবনের এই বিপর্যায় থেকে অব্যাহতির উপায় কি? পুনরায় তিনি স্বীয় ভগবন্তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্ব্বক আত্মসমর্পণের উপদেশ দেন। “তুমি যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছ —এ অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে তোমার নিজের সমস্ত খেয়াল খুশী ছাড়িয়া দিতে হইবে। সজ্জনের যাবতীয় কর্মের ভিতবে তোমাকে প্রতিনিয়ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং বিশেষ দায়িত্ব সহকারে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়া বাইতে হইবে। সজ্জনেতার আদেশ ও বাণী সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশ ও বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সজ্জ ও সজ্জনেতার উপর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনিতে হইবে।” এইরূপ ভাবে কিছুকাল চলিলে তোমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে, চঞ্চলতা বিদূষিত হইবে এবং সর্ব্বদা চিন্তের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা লইয়া থাকিতে পারিবে।”

চিঠিখানি বাং ৬৭।৩১ : ইং ১৯ : ৪ তারিখের। শ্রী শ্রী আচার্য্যাদেবের বয়ঃক্রম তখন মাত্র আঠাশ। যৌবনের সীমা অতিক্রান্ত হয় নি। কিন্তু অধ্যাত্ম প্রজ্ঞায় তদীয় ব্যক্তিত্বের প্রভা তখন পূর্ণপ্রাপ্ত। এই

ভগবন্তাবের মহাপ্রকাশ উত্তারোত্তর স্বতঃ বিকিরিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করেছে তদীয় সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে শাস্তি, সান্ত্বনা, শক্তি ও অভয় লাভের জন্ম। যেখানে যখনই তিনি গিয়েছেন শত শত নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করেছে তদীয় দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভের অধীর ব্যাকুলতায়। তিনিও অবাচিত করুণার ঔদার্য্যো বিরাম বিশ্রামহীন ভাবে দর্শনার্থীদের দুই বরহস্তে সাধন, দীক্ষা ও অধ্যাত্ম শক্তি বিতরণ করেছেন।

তদীয় ভাগবতী করুণা দুইটি বিশিষ্ট ধারায় বর্ষিত। এক অকুণ্ঠ মানব সেবার মধ্য দিয়ে, যেখানে সমাজের শত সমস্যার সমাধানের উপায় ভাবতে হয়েছে। সেখানে ভারত তথা বহির্ভারতে বিশুদ্ধ বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও অম্লষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন। এজন্ত দশটি চারণদল গঠিত। এই ধর্ম্মপ্রচারের সমাস্তরাল ভাবে চলে আর্ন্তের সেবা ও আদর্শ শিক্ষার বিস্তার। তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সাধনপূর্ব্বক তথায় তীর্থার্থেয়ীদের রক্ষার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা তাঁরই মহতী কীর্ত্তি। হিন্দু সমাজের সংস্কার ও গঠনের জন্ত তিনি যে ব্যাপক কর্ত্ত্বপরিকল্পনার প্রবর্ত্তক তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেশের মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করেছিল। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার মহাপাপ দূরীভূত করে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলন, ঐক্য, সখ্য ও সহযোগিতার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। এই উদ্দেশ্যেই নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুরা ক্ষাত্রণজিতে হৃর্জয় হয়ে উঠুক, ধর্ম্ম, মন্দির, বিগ্রহ, নারী ও স্বাধিকার রক্ষায় প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অপরাধমুখ হোক, দুর্ব্বলতা, ভীকৃত্য,

কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করুক। হিন্দুধর্ম শক্তির সাধনা—বীর্ঘ্যের সাধনা। দুর্বলের কোন ধর্ম নেই। হিন্দু মিলন-মন্দিরের সহিত রক্ষিদল গঠন পূর্বক তিনি সেই বাহিনীর হাতে আত্মরক্ষার হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন। তিনি কিশোর ও যুবাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছেন, স্কুল ও স্কুলের পারিবারিক জীবন গঠনের উপদেশ ও শিক্ষা দিয়েছেন, অমূল্যতগণের উন্নয়ন এবং উপজাতীয়গণের কল্যাণচিন্তা করেছেন। ধর্মিতা ও অপহৃত নারীদের উদ্ধার সাধন ও সমাজে পুনর্বাসন এবং ধর্মাস্তরিতগণকে শুদ্ধি অর্হুঠানের দ্বারা স্বধর্মে ও স্বসমাজে ফিরিয়ে আনার ব্যাপক কার্যেও তিনি সদা নিরলস। অসহায় কৃষকগণকে সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি নিয়েও সাময়িক সাহায্য স্বরূপ ঋণ দিয়ে তিনি তাদিগকে উত্তমর্গদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সনাতন ভিত্তিতে জাতি ও সমাজ গঠনের ত্রুত উদ্ঘাপন সূত্রে এমনি বহুবিধ লোকহিতকর কর্মেরই প্রবর্তন হয়েছিল। স্বল্পপরিমিত জীবনে তিনি যে বিরাট সঙ্ঘ গঠনপূর্বক তাকে পূর্বাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন তা অতীব বিস্ময়কর। তৎপ্রবর্তিত সঙ্ঘ তাঁরই আদর্শ ও কর্মধারা অনুসরণ-পূর্বক অধুনা প্রায় সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। এইখানে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহান কর্মযোগী, নিপুণ নেতা ও অনন্তসাধারণ মহাসংগঠক।

কিন্তু এই লৌকিক কর্মসাধনার প্রবল আবর্ষে তদীয় ঈশ্বরীয় চেতনা হারিয়ে যায় নি। এই চেতনায় তিনি নিত্য স্থস্থিত ছিলেন। তা থেকে একটুও নড়েন নি। পূজাপাদ শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দজী তদীয় দিনলিপিতে এক স্থানে লিখেছেন—

“এত কার্যের মধ্যেও যেন তিনি অন্য রাজ্যে বিচরণ করেন। সেই রাজ্যে

গমনাগমন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ও সরল। এত অনায়াসসাধ্য যে ইচ্ছা মাত্রই তিনি সেই রাজ্যে ডুবিয়া যাইতে পারেন, আবার ইচ্ছামাত্রই তিনি প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন।” আচার্যের মহাজীবনে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লীলার এই মহাসমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

শ্রীশ্রীআচার্যের ভাগবতী করুণার দ্বিতীয় ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল তদীয় অপ্রাকৃত লীলা-মাধুর্যের ভিতর দিয়ে। সেই ধারাটি অন্তরঙ্গ। ভাগবত পুরুষের অন্তরঙ্গ লীলাবৈচিত্র্যের রহস্যবেস্তা সকলে নয়। সাধারণ প্রাকৃত জনেরা তাঁর লৌকিক সমাজ-কল্যাণের মহত্ব ভালই বুঝে, প্রশংসাও করে। কিন্তু সেই মহাপুরুষটি যখন ভগবদ্ভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে অগণিত ভক্তজনের পূজারতি গ্রহণ করেন, নব নব মহাভাব আশ্রয়পূর্বক প্রেমমাধুর্যলীলায় নব-বৃন্দাবন রচনাপূর্বক প্রেমিক ভক্তজনের কাছে ধরা দিয়ে তাদের অনন্তজন্মের বাসনা-কণ্টকিত ইন্দ্রিয়কুখায় অমৃত ঢেলে দেন এবং আপন অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে তাদিগকে রসে ডুবিয়ে, ভাবে মজিয়ে দিব্য চেতনায় উজ্জীবিত করেন, তখন তাঁর সেই অপ্রাকৃত লীলার মাহাত্ম্য কয় জনে হৃদয়ঙ্গম করে? মানুষটি তো ভাল ভাল কাজই করছিলেন, হঠাৎ ভগবান হলেন কি করে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও সম-কালীন বহু মানুষের মনে এই সংশয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন “আমার ভূতমহেশ্বররূপ পরম ভাবনা জেনে মুঢ় ব্যক্তির সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে আমাকে অবজ্ঞা করে।” কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্মে মানুষ ভগবান্ হয়, জীব—শিব হয়। এ জিনিষ নূতন নয়। যুগে যুগে ভগবান্ আসেন, নররূপে

নরলীলা করেন নরেরই মহামুক্তির কারণে। আকাশের ভগবানকে কল্পনার লোক থেকে বাস্তব জগতে নামিয়ে এনে প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাসন করতে চেয়েছে ভারতের হিন্দু, আর তা পেয়েছে যুগে যুগে। শ্রীরামকৃষ্ণের পর শ্রীপ্রণবানন্দের আবির্ভাবের ভিতরও একই অধ্যাত্ম মহিমা বর্তমান। স্বামী প্রণবানন্দ আপন ভাগবত স্বরূপকে একেবারে মুক্ত করে দিয়েছিলেন ভক্তজনের কাছে। এতটুকু আবরণও রাখেন নি। তাই স্বামী প্রণবানন্দকে স্বরূপতঃ বুঝতে এখনো অনেকের কষ্ট হয়। তিনি যখন মাঘী পূর্ণিমার পূণ্য লগ্নে তদীয় সাধনসিদ্ধলীলা বাজিতপূর্ব ধামে প্রকাশ্যভাবে পূজার বেদীতে বসে অর্ধ লক্ষাধিক ভক্ত নরনারীর অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন, তখন কিছু কিছু মানুষের কণ্ঠে সমালোচনার সুর উচ্চারিত হয়েছিল বৈ কি! কখনো জগদগুরুরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে পূজারতি গ্রহণ এবং জনে জনে শক্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ চলেছে। কখনো জয়যজ্ঞেশ্বর-রূপে, কখনো স্বয়ং শিববেশে, কখনো রাজ্যরাজ্যেশ্বরের মহাভাবে, কখনো দোলে বসিয়ে দোলের ঠাকুরকপে, কখনো লক্ষফুলের সুসজ্জিত বাসরে ভক্তেরা তাঁকে পেয়েছেন এবং প্রাণমন উজ্জাব করে দিয়ে ঐ রাজীব চরণে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদনপূর্বক অপাব আনন্দমাগরে আত্মহারা হয়েছেন। এ সকলই যুগাচার্যের অপ্রাকৃতলীলা। এ লীলা লৌকিক নয়—আধ্যাত্মিক। এর ভিতর দিয়েও বদ্ধজীবের আত্মিক সেবাই হয় এবং হয়েছে। এটিও মানবসেবারই এক মহত্তর রূপ। অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, ঔষধ-পথ্য দিয়ে যে সেবাত্রয়ের উদ্ঘাপন, তাতে মানুষের দেহের ক্ষুধা ও বৈষয়িক অভাবের সম্পূর্ণ সাধন হয় বটে, কিন্তু অনন্ত জন্মের আত্মার ক্ষুধা মিটে না, যতক্ষণ না ভাগবত পুরুষের মহাভাব ও

মহাপ্রেমের অমৃতস্পর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে না পায়। তাই স্বামী প্রণবানন্দ আপনায় ঐশ্বরীয় মহাভাবকে গোপন রাখেন নাই। ভক্তের ব্যাকুলতায় ভগবদ্ভাবই ধরা দিয়েছিলেন। জনৈক নিন্দকের উক্তি তাঁকে শুনাগে তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তরে এই সেবককে বলেছিলেন—“ভক্তের ভগবান, অভক্তের তো ভগবান নয়।”

শ্রীশ্রীআচার্যের তপঃশুদ্ধ শরীবে এই ভগবদ্ভাবের নব নব প্রকাশ ঘটতে পূণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। এই তিথিটি তাই সজ্জের সম্মাসী ও গৃহী সন্তানদের নিকট বড় শুভ মুহূর্ত। এই মহাতিথিতে ভগবান আচার্যদেব পূর্ণ তপঃশক্তি বজ্রোতিঃ শ্রীঅঙ্গে ধারণ-পূর্বক পবন বরদমূর্তিতে অগিষ্ঠিত থাকতেন তুষিত, তাপিত, আর্ত ভক্তকে কৃপাদানব ওদার্য্যে। এই শুভাতিথির আশীর্বাদ গ্রহণেব জন্ম তিনি নিজ শ্রীমুখেই বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। “আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে—তপঃশক্তি, তপস্বেজ্ঞের পূর্ণ বিকাশের দিনে উপস্থিত হইয়া তাহার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে পার তাহার জন্ম আগামী দুই মাস কঠোর নীতি ও সংযমের ভিতর দিয়া স্ব স্ব সাধনা লইয়া চলিবে।” কেন না “বিরাট পুরুষের বিরাট শক্তি লাভ করিবার পূর্বে ঐ শক্তি ধারণ করিবার মত উপযুক্ত হওয়া দরকার।” এজন্ম যেমন চাই সাধননিষ্ঠা, তেমনি চাই আকুলতা ও ব্যাকুলতা। আবার বলেন—“আগামী মাঘী পূর্ণিমার জন্ম প্রস্তুত হও। ঐ সময় তোমাদের ভাবী জীবনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া যাইবে। জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা ভিন্ন যে মহা-সাধনা লাভ করা যায় না তাহা যাহাতে ঐ সময় গ্রহণ করিতে পার তজ্জন্ম প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর।”

বর্ষে বর্ষে মাঘী পূর্ণিমার পুনরাবর্তন হয়। এবার

এই কাল্পন সেই শুভা তিথির পুণ্য মুহূর্ত্ত আসছে। যুগাচার্যের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের অমুখ্যানের এই উপযুক্ত সময়। তিনি এসেছিলেন আমাদের ধর্মে অমুপ্রাণিত করতে, কর্মে ব্রতী করতে, শক্তিতে উদ্দীপিত করতে, ভক্তিতে মাতাতে, রসে ডুবাতে, ভাবে মজাতে; তদীয় মহাবির্ভাব ঘটেছিল সমগ্র বিশ্বমানবতার ভিতরে মহাজাগরণ মহামিলন, মহাসমষ্টি ও মহামুক্তির গঙ্গোত্রীধারা আনয়ন করতে, তিনি চেয়েছিলেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে মহাজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। তজ্জন্মই তদীয় ত্রীহস্তে

মহাসম্ভবের রচনা এবং তার ভিতর দিয়ে বিচিত্র ও বহুমুখী লোককল্যাণ কর্মসম্ভবের প্রবর্তন। শুধু লৌকিক কর্মের ভিতর দিয়ে নয়, তদীয় ভাগবতী করুণাধারা দিব্য মাধুর্যালীলার মধ্য দিয়েও সহস্র-ধারায় বর্ষিত হয়েছে। আমাদের চাই আশার প্রস্তুত করা। চাই চিন্তের গুরুমুখীনতা, চাই তচ্চরণে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আকৃতি, চাই ভাব-ভক্তির যথোচিত উন্মেষ, চাই অন্তরের আকুলতা ও ব্যাকুলতার জাগরণ। যিনি নিত্য পুরুষ তাঁর কৃপাশক্তিও নিত্য। আমরা চাইলেই তা পেতে পারি।

রেখো তোমারি চরণ-রেণুপ্রান্তে

শ্রীআর্য পালিত

রেখো তোমারি চরণরেণু প্রান্তে,

চলিতে চলিতে পথ,

আকুল কামনা শত

টানি যদি নেয় মতিভ্রান্তে !

তোমারি আশিস মাখা শীতল ছায়ায়,

স্নিগ্ধ করিও তাপদগ্ধ কায়ায় !

ভুলে যদি ছুটে যাই,

পথ খুঁজে নাহি পাই,

সুপথ দেখায়ে দিও অবোধ এ পাশ্বে।

মনের বেদনা যত ঘুচায়ে দিও,

যুগ্ম জীবির জল মুহায়ে নিও

শেষ পলকের আগে

হৃদি-মাঝে যেন জাগে,

তোমার অরূপ রূপ যেন জীবনান্তে।

পায়ে ঠেলে দূরে ফেলে দিও না অশান্তে।

ঝরে আনন্দধারা

শ্রীজগন্নাথ সাগাল

দিকে দিকে ঐ বহে আনন্দধারা

বহে আনন্দ আকাশ বাতাস জুড়ে,

ঝরে আনন্দ ঘাসে ঘাসে প্রান্তরে

ঝরে আনন্দ সবুজে ও নীলে দূরে।

পাতায় পাতায় ধানে ধানে শীষে শীষে,

নদী-তরঙ্গে পাখীদের গানে গানে,

ফুলে ফলে আর রঙে-রসে মিশে মিশে

ঝরে আনন্দ সুরে সুরে লয়-তানে।

এত আনন্দ—এত উৎসবে যদি

প্রাণ ভ'রে নিতে হই আমি কুণ্ঠিত,

ক্ষণিক দুঃখ বেদনার প্রতিঘাতে

খুলে খুলে হই যদি লুপ্তিত।

জন্মের ঋণ শুধে দিতে বিধাতায়

পরাস্ত আমি জীবনের সংগ্রামে,

বার্ষ আমি যে স্বার্থ অন্বেষণে

মহা পৃথিবীর মহা আনন্দধামে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময় এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ-৭

শ্রীহরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক

(পূর্বাহ্নবৃত্তি,)

আধুনিক কালে নতুন নতুন আবিষ্কার-অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এবং মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। জীম্যানের উয় নগরী আবিষ্কারের ফলে যেমন গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডিসির ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি দ্বারকাধীপের সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত দ্বারকার সন্ধান পাওয়ার ফলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতাও প্রমাণিত হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে সমরজিৎ কর মহাশয় 'দেশ' (১৭৭৮৫) পত্রিকায় "বিজ্ঞানের টুকরো খবর" শিরোনামে "হর্যাক্ষ লিপি" উপলব্ধিকে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দ্বারকাধীপের সমুদ্রগর্ভে সিদ্ধ সভ্যতার সাদৃশ্য-যুক্ত সীল বা মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কিছু কুঁজোও পাওয়া গিয়েছে। ব্রাহ্মলিপির অস্বরূপ লিপি এগুলির গারে খোদিত আছে। এই আবিষ্কারের উত্তোষনা গোয়ার ক্রাশকাল ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি। এদব লিপির পাঠোদ্ধারও হয়েছে। তার মধ্যে একটিতে লেখা রয়েছে, "হে সমুদ্রের দেবতা, আমাদের তুমি রক্ষা কর।" এই লিপি সংস্কৃত লিপির অস্বরূপ।

অধ্যাপক বরবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় "দ্বারকার প্রত্ন-তাত্ত্বিক খনন ও ভারতের ইতিহাস" (বৃত্তিকা-২২।৪।৮৫) নামক নিবন্ধে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। এই নিবন্ধেই তিনি তাঁর পূর্বলিখিত অস্বাক্ষর প্রবন্ধ "মেসেজ অব ইনডাস ক্রিস্ট" (১৯৭৭), "ইনডাস ক্রিস্ট—এ ফার্মার লাইট" (১৯৮১) এবং "ডেসিকারমেন্ট অব ইনডাস ক্রিস্ট" (১৯৮৫) নামক তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। এগুলিতে তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, সিদ্ধ সভ্যতার আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ (সীলমোহর) মূলতঃ ব্যক্তি-

পরিচয়স্বাক্ষর। যেহেতু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—

"ন চামুদ্রোহভিনির্বাতি ন চামুদ্রঃ প্রবেশতে।

বৃক্ষাক্ষকপূরে যাহন্তুনা সৌভসমাগমে ॥"

(মহাভা. বনপর্ব—১৪।১২, সৌভবধ)

অর্থাৎ, সৌভপতি দ্বারকা (বৃক্ষাক্ষকপূর) আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ মুদ্রা ভিন্ন কাউকে নগরে প্রবেশ বা বহির্গমন করতে দেননি। এট শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি। হুতরাং, উল্লিখিত মুদ্রাগুলি ব্যক্তিপরিচয় স্বাক্ষর।

বাহোক, ১৯৮৩-তে (এপ্রিল) তাম্রোরে অস্বষ্টিত সিদ্ধ লিপি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেখক অধ্যাপক চক্রবর্তী স্বয়ং মার্শাল-নির্ধারিত সিদ্ধ সভ্যতার সময় খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০—২৭৫০ অব্দের বিষয়টি উল্লেখ করেন। অপর দিকে গোয়ার ক্রাশকাল ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফির বিজ্ঞানী ডঃ শ্রী এস আর. রাও "সারেন্স এজ" (আগস্ট, ১৯৮৩)-এ দ্বারকার মহাসাগরীয় উৎখননে প্রাপ্ত লিপি সম্বন্ধে বিবরণ দেন। এর উপর নির্ভর করে "ক্যালটিস্—৮৫ সংখ্যায়" বিভিন্ন লিপিতাত্ত্বিক কর্তৃক প্রমাণ দ্বারা দেখানো হয় যে, সিদ্ধ সভ্যতার প্রাপ্ত মুদ্রা মহাভারতীয় সময়ের এবং ব্যক্তি-বোধক। (সিদ্ধ সভ্যতার ও দ্বারকার প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ এবং একই সভ্যতার অঙ্গীভূত।)

আনন্দবাজার (৪।২।৮৫) পত্রিকায়ও জানা গেল, দ্বারকা উৎখননে সিদ্ধ সভ্যতার অস্বরূপ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ফলে, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত, হুতরাং মহাভারতীয় ঘটনার ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ।

দুর্গ-নগরী তথা স্বর্ণ-নগরী (Golden City) দ্বারকা (অর্থাৎ বহু-দ্বার-বিশিষ্ট)-এর বিষয়ে মাননীয় দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের দুর্গ-নগরী দ্বারকার লন্ডানে" (বাংলা-১৩৯৫

ঐতিহাসিক (শায়রীয়া পুজাসংখ্যা) নামক নিবন্ধে আলোচনা করেছেন।

হারকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ও তৎবিষয়ক তথ্য ডঃ এস আর রাও কর্তৃক রচিত "In Circa 3000 B. C." নামক গ্রন্থে বিশদভাবে জানা যায়। এই আবিষ্কারে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিমিত। ডঃ রাও, লিখন কেরি প্রমুখ গবেষক পণ্ডিতগণ হারকার প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন-সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

সম্রাট রৈবতক কুশস্থলী দুর্গ-নগরী (হারকা, হারাবতী) -এর নির্মাণ ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্বের কালে রৈবতকের বংশধর ককুদ্রী এবং পরে উগ্রসেন এর শাসক ছিলেন। দীর্ঘ আক্রমণের পর আক্রমণে তৎকালে নগরীটি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। মগধরাজ জরাসন্ধের রোষান্বিত হাত থেকে বাদবংশীয়দের স্বরক্ষার জন্য খ্রীষ্টপূর্ব তাঁদের মথুরা থেকে হারকার স্থানান্তরিত করেন এবং কুকাগ্রজ বলরাম ককুদ্রী-কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ছত্রিশ বছর পরে কুরুপুত্র শাঘ সহ বাদবংশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার, লাশপটের প্রাকৃত্যব-জনিত কারণে বিশ্বাসিত, কণ্ড ও নারদের অভিধানে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হারকাও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিল। এতে সামুদ্রিক প্রাচীনও যুক্ত হয়।

হারকার বিপর্যয়ের বিষয়ে ১২৬৩ সাল থেকে পুণের ডেকান কলেজের ঐতিহাসিক ডঃ এইচ, ডি, সফলিয়াও আবিষ্কার অহুসন্ধানে রত আছেন। গৌমতী নদীর মোহনা সংলগ্ন আরব সাগরের মধ্যে অসংখ্য প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে। এসব প্রত্নবস্তুর বয়স মাড়ে তিন হাজার বছর থেকে পাঁচ হাজার বছর বলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। ফলে, বর্তমান

আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহের কথা মিথ্যা নয়।

উল্লেখ্য যে, সিদ্ধু সভ্যতা ও মহাভারতীয় সভ্যতা মূলতঃ অভিন্ন; তাছাড়া এই সভ্যতা সম্পর্কে, গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ এবং প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্ব্যাখ্যার নজির লক্ষণীয়। আসলে এটি হচ্ছে গান্ধার ও সারস্বত সভ্যতা। সাহেব পণ্ডিতগণ কল্পিত আধ্যাত্মমণ্ডলের ভিত পাকা করার জন্য সিদ্ধু সভ্যতা নামক এক কল্পিত সভ্যতার বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে একদিন সত্য অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে, নিঃসন্দেহ। ভারতীয় ইতিহাস সালতামানির সমস্তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে সামগ্রিক আলোচনায় এটা পরিষ্কৃত হয় যে, ভারতের বিকৃত ইতিহাসের সংস্কার চিন্তা ক্রমশঃ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৫১তম ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতি হীরালাল গুপ্ত এ বিষয়ে পথ-নির্দেশ করে বলেছেন—

“ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, লোককথাকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে স্বীকার করা উচিত।”

(২৮-৩০/১২/১৯৯০)

হীরালাল গুপ্ত মহাশয় সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে বিশেষ কোন ইজম-এর জন্য ইতিহাসকে ব্যবহার না করার জন্য অহুরোধ ব্যক্ত করেছেন।

সুতরাং, সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে ভারত ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন। সেই পথেই ইতিহাসের মুক্তি সম্ভব। আর ইতিহাসের মুক্তিতে আসবে দেশ ও জাতির মুক্তি। সমাপ্ত।

সংস্কৃতি

ডাঃ শ্রীশুধীর কুমার রায়
(পূর্বানুভূতি)

মানুষ চায় আনন্দ, চায় নীরোগ শরীর, নীরোগ মন। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবেরই কাম্য একই। দুঃখ কেউ চায় না। এই উত্তরটাও তাঁদের মাথাতেই এসেছিল। তাই প্রণয়ন করা হয়েছিল এত নিয়ম-নীতি, এত সংস্কার। এত বৃক্ষরোপণ, ভূমি সংস্কার, বিবাহের ধুমধাম। দৈনন্দিন আচার-আচরণের ও ক্রিয়াকার্যের মধ্যে দিয়ে সকলকে অভ্যস্ত করিয়ে সংস্কৃতিকে স্বভাবজাত করবার প্রয়াস নিয়েছিলেন তাঁরা। তাই তো মজ্ঞাপত্ত করতে চেয়েছিলেন এত শরীর গঠনের সঙ্কল্প, এত শরীর চর্চার সঙ্কল্প, এত যথাবিহিত খাদ্যসংগ্রাহের সঙ্কল্প, বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর কবল থেকে রক্ষার সঙ্কল্প। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় বহু পৃথিবীর জীব বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ বা জয়-মৃত্যু রূপশরিগ্রহ করে আসছে। একই সংস্কৃতির প্রভাবে বিশাল পৃথিবীর সেই অগণিত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করা দুর্ভব ব্যাপার। সেই জন্তই ক্রমশঃ পৃথিবী হ'য়েছে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত। সেই বিভিন্ন দায়িত্ব হাতে নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন বহু ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তাঁদের কেউ বৈরভঙ্গী কেউ গণভঙ্গী। ইতিহাসে প্রমাণ পাই পরবর্তী সময়ে স্বার্থের কারণে এক দেশ অত্র দেশকে আক্রমণ করে জয় করে আনতে চেয়েছে নিজের দখলে, নতুবা লুণ্ঠ করে আনতে চেয়েছে তাদের ধন-সম্পদ। যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বহু জীবনধ্বংসী রণোদ্গার। হ'য়েছে রূদ্রবর্ণশী মহামারী, বিভীষিকায়র দুর্ভিক্ষ। এ ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই। শারীরিক রোগ-ব্যাদি তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সব মিলিয়ে জীবগণ বেহাল প্রাণের তাগিদে তাই শুরু করেছিল পূজো-আর্চা যাগযজ্ঞ। কত দেব-দেবীর ঘটেছিল আবির্ভাব। প্রাণের আবৃত্তি-জ্ঞানান্তে শুরু করেছিল সেই দেব-দেবীকে। সবই

কিন্তু প্রয়োজনভিত্তিক কাম্যনা-বাসনাকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি, যত কলহ! পাওয়া না পাওয়াকে কেন্দ্র করেই যত সম্বর্ধ! তারও সমাধানের প্রয়োজনে মূনি-ঋষিরা সংযোজন করলেন আরও নতুন সংস্কার। নির্দেশ দিলেন সংস্কৃতি রক্ষার, নির্দেশ দিলেন ধর্মোপলব্ধির। প্রয়োজনমায়িক হল নানা পরিবর্তন ও পরিবর্তন। অস্ত্রের দরকার পড়ল অস্ত্র তৈরী হল। তার জন্ত তৈরী হল কলকারখানা। প্রয়োজনভিত্তিক এরকম কত কি! একদিন প্রয়োজনের যাত্রা ছাড়িয়ে যায়। প্রয়োজনাতিরিক্ত সঙ্কল্প নিয়ে শুরু হয় নানা বিভ্রাট। ধর্মচ্যুতির আসে সম্ভাবনা। সম্ভাবনা আসে অস্তিত্ব বিলোপের। তাহ'লে কি অর্থ বা কামের কোনও প্রত্যাশা থাকবে না? কারণ, তারও আছে। যদিও ধর্মীয় জীবনযাপনে সাধারণতঃ কাম ও অর্থের অভাব বিলক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অর্থবল যতই থাক, কামনা যতই চরিতার্থ হোক, স্বধর্ম পালনে যতই সক্ষম হোক, সম্যক গৃহ অনাবিল আনন্দ লাভ তাতেও সম্ভব নয়। কারণ, কামনা-বাসনার চাপে আনন্দ ত্রিয়মান হয়। তাছাড়া, আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্তি ঘটেও না। আর প্রাপ্তি না ঘটলেই দুঃখ। প্রাপ্তি ঘটলেও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়ে যায়। বহু গুণে গুণিত হ'য়ে বেড়ে বেড়ে শেষ পর্যন্ত চাওয়ার পরিমাণ হয় সীমাহীন। সীমাহীন কামনার আঘাতে আঘাতে হয় শেষ পর্যন্ত জর্জরিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু যুক্তিবাদীকে অবশ্য প্রশ্ন করতে শোনা যায়, বর্তমান সম্বর্ধপূর্ণ জীবনপথে তাই বলে কি অর্থ ও কামহীন হ'য়ে বেঁচে থাকার কোন বিশেষ যুক্তি আছে? অর্থ ও কামহীনদের দুঃখ বা অশান্তি কি আরও বেশী নয়? তাহ'লে উপায়? উপায় ঐ একই। ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিন্ন উপায় নেই। তাতে নিশ্চয়ই অনেকাংশে লক্ষ্য কাটে, ভাঙি ঘটে। কিন্তু সম্পূর্ণটা হয় না। পূর্ণ

হওয়া যায় না সত্যক আনন্দে, বাটতি থেকে বার পরি-
ভূতিতে স্থখে। কারণ, স্থখ বাইরে নেই, কোন ব্যক্তিতে
বা বিষয়ে নেই। স্থখ আত্মীয় পরিজনে নেই।
চিন্তেও নেই। তাহলে কর্তব্য? কর্তব্য মুনি-ঋষির
নির্দেশ পালন। নির্দেশ কী? মোক্ষ-লাভহেতু প্রচেষ্টার
নির্দেশ। কারণ, মোক্ষেই আনন্দ, মোক্ষেই মুক্তি।
দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মোক্ষেই পরিজ্ঞান। এ আবার
কি রকম? স্থখ ভোগে নেই, 'স্থখ আছে ত্যানে'
ইয়া, এটাই সত্য। কারণ, স্থখ অন্তরে, স্থখ
আত্মার। অস্ত্র কিছুতে নয়। আত্মার স্বরূপ-ই তো
আনন্দ। আত্মাই তো আনন্দ স্বরূপ। তার জন্মই তো
আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির নির্দেশ। ব্যক্তিজীবনে,
সমাজ-জীবনে তথা জাতীয় জীবনে তাই হয় ধর্ম, অর্থ,
কাম নতুবা মোক্ষ। অবশ্য উভয়ই। এই সত্যকে
বাস্তবায়িত করার স্বার্থেই তাই এত শাস্ত্রের অহুশাসন,
এত নির্দেশ, এত মত-পথ, এত নিয়ম-নীতি।

পূর্বেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, একই ব্রহ্ম বহু হ'য়ে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আশিত্বের অভিমানে বহুধা বিভক্ত। বিক্ষিপ্ত
স্ববস্থায় তারা চলাফেরা করে, বিক্ষিপ্ত স্ববস্থায় তারা বসবাস
করে। অন্তরে তাদের বিচ্ছিন্নতার দুঃখ। এও বলেছি
যারা জীবনরক্ষায় তাগিদে বিদেশে বসবাস করে, তাদের
কায় ও কায়-ও কানে 'ও' মন্ত্র পৌঁছুলে যেমন উৎক্লম্ব হয়,
তেমনি কায়-ও কায়-ও কানে "লাইলাহা ইলাল্লাহ মোহাম্মদু
রহুল্লাহ" পৌঁছুলে উচ্ছ্বসিত হয়। দু'টো একটা আচার-
আচরণ এবং দু'একটা কথার মধ্যে একে অগ্নিকে চিনতে
পারে। এব মূলে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ভারতের বৃকে
বিভিন্ন। হিন্দুর জন্ম হিন্দু-সংস্কৃতি। মুসলমানের জন্ম
মুসলিম সংস্কৃতি। এরকম অনেক। খ্রীষ্ট সংস্কৃতি, বৌদ্ধ-
সংস্কৃতি প্রভৃতি। যে যাই হোক, হিন্দুর উচিত হিন্দুশাস্ত্রে
বর্ণিত নিয়ম-নীতি ও মত-পথে বিশ্বাসী হওয়া এবং তারই
অহুশাসন করা। তদ্রূপ অজ্ঞাত ধর্মের মতাবলম্বীদেরও
উচিত তাদের স্ব স্ব ধর্মমত ও নিয়ম-নীতি অবলম্বন করে
জীবনযাত্রা নির্বাহ করা।

এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে তথাকথিত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি

জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁরা বলতে চান, সংস্কৃতি যদি
মহুযা জাতির জাতীয় ঐক্যচেতনার ও জাতীয় আগরণের
সহায় হয় তবে কেন তা বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন হ'তে
যাবে? কেনই বা একজাতি অন্য জাতির সংস্কৃতি অহুসরণ
করলে সেটা অপসংস্কৃতি হ'তে যাবে? মাহুয তো একই।
হিন্দু বলি, মুসলমান বলি, খ্রীষ্টান বলি, বৌদ্ধ বলি সবই তো
মাহুয। তাদের দৈহিক বহুপাতি, গঠন ক্রিয়াকলাপ সব
তো একই। তাছাড়া 'সোহকাময়ত একোহমু বহু শ্রাম
প্রজায়য়েতি' এ তো শাস্ত্রেরই কথা। তিনি কামনা
করলেন, 'আমি এক আছি, আমি বহু সৃষ্টি করব'
কোথায়ও আবার বলেছেন, 'আমাতে ও সর্বভূতে একই
আত্মা।' যেখানে এত বড় বড় মহান বিশ্বমানবতার মত
আদর্শ প্রচারিত সেখানে কেন মাহুয বুদ্ধিমান জীব হয়েও
এরকম সংকীর্ণ চেতনার নিম্নেকে আবদ্ধ রাখবে? কেন
একজন মত্বিকারের সংস্কৃতিবিশ্বাসী ও অহুসরণকারীকে-ও
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্র কোনও জাতির কোন আদর্শ
বা সংস্কৃতিকে অহুসরণ হেতু নিষিদ্ধ হ'তে হ'বে? সেটা
কি বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পরিপন্থী
নয়?

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি প্রচলিত।
এর মূলে যে সকল কারণ বিद्यমান, তন্মধ্যে ভৌগোলিক
কারণ অগ্রতম। জলবায়ু ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে
তাদের আচার আচরণ, ক্রিয়াকলাপ সবই ভিন্ন ভিন্ন।
বিভিন্ন জাতি তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির অহুশাসনে
সংস্কৃত—যে সংস্কৃতি বারংবার অহুষ্ঠানহেতু, পরবর্তীকালে
তাদের স্বভাবে পরিণত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভিন্ন
জাতির কোনও সংস্কৃতি পালন করতে গেলে অনভ্যাসহেতু
যেমন যথার্থই ভাবে—পালিত না-ও হ'তে পারে, তদ্রূপ
পরিবারের অন্তরা সেটা না-ও মেনে নিতে পারে। ফলে
আসে অনৈক্য। সে অনৈক্য আনে বিচ্ছিন্নতা। আনে দুঃখ।
ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে এবং পূর্ণতা ও লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে
যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিচ্যুতিতে তো অশান্তি আসবেই।
যার প্রভাবে জাতির প্রতিটি মাহুযের আচার-আচরণ,
ধ্যান-ধারণা, উৎসাহ-উদ্ভব একই ধারায় প্রবাহিত

সেখানে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাতে জাতির সর্বাঙ্গিক কল্যাণ প্রতিহত না হয়ে পারে না। তাহলে কর্তব্য? নিজেদের ঐক্যবদ্ধ রেখে জাতীয় ঐক্যচেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করাই কি কর্তব্য নয়। অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বলবেন, “হ্যাঁ, সেটাই কর্তব্য, সেটাই উদ্দেশ্য।” বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যকার কলহ তাতেই হ’বে দূরীভূত। দূরীভূত হ’বে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ। একের প্রতি আর একের ঈর্ষ্যা না হলে স্থাপিত হয় ভালোবাসা—প্রতিষ্ঠিত হয় ঐক্যবদ্ধতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে একক ভাবে এই ঐক্যচেতনা জাগ্রত হওয়ার মধ্যেই ঘটে বৃহৎ ঐক্যের সূচনা। কাজেই, প্রতিটি জাতির-ই উদ্দেশ্য স্ব স্ব সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল হ’য়ে স্ব স্ব জাতির সর্বাঙ্গিক উন্নতির মাধ্যমে সর্বাঙ্গিক ঐক্যচেতনায় আলোকে বিশ্ব-মানবীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার বীজ রোপণ করণ। পারিবারিক ভাতৃস্ব রক্ষার মধ্যেই বিশ্বভাতৃস্ব প্রতিষ্ঠার বীজ অন্তর্নিহিত। এক জলীয় আবহাওয়া ও সম-প্রকৃতির লোকেদের কাছে অল্প কোন জলীয় আবহাওয়া ও প্রকৃতির লোকেদের সংস্কৃতি স্থবিধাজনক হতে পারে না। আমাদের দেশে ছেলেরা মেয়েদের বিয়ে করে ঘরে তোলে, কোনও কোনও দেশে আবার মেয়েরা ছেলেদের বিয়ে করে ঘরে তোলে। যে দেশে যে ধারা, যে রীতি। আমাদের দেশে হঠাৎ করে দু’একটা মেয়ে যদি বিবাহ সংস্কার পরিবর্তনের পূর্বেই ছেলেদের বিয়ে করে ঘরে তুলে সেই রীতি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে তাতে কি কিছু লাভ আছে? না কি তা কেউ মেনে বেবে? সেটাকে অপসংস্কৃতি না বলে কি কোনও উপায় আছে? কোনও ক্রিয়াকর্ম স্বধর্ম অল্পশাসিত না হ’লে যদি অপকর্ম বলে আখ্যাত হয় তাহলে সংস্কৃতি স্বধর্ম অল্পশাসিত না হলে কেন তাকে অপসংস্কৃতি বলা হবে না? সর্বজনস্বায়ত্ত্ব বা স্বীকৃত না হ’লে সেখানেই ভো অর্নেক্য।

কিন্তু জলবায়ু, আবহাওয়া পাটে যাচ্ছে। সেই পরি-প্রেক্ষিতে আজ নানা প্রশ্ন; নানা মতাস্তর। একশ’ বছর পূর্বকার জলবায়ু অস্থায়ী নির্দিষ্ট সংস্কৃতি আজকের দিনে পরিবর্তিত জলবায়ুতে কতখানি উপকারী? বিজ্ঞানের

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণও বহু পরিবর্তিত হ’য়েছে এবং হচ্ছে। আজ একমাত্র পুরানো দিনের সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে চললে কি ভুল হবে না? বিজ্ঞানের উন্নতির-ই বা তাহলে প্রয়োজন কি? চিরদিন কি মাদ্রাসা যুগের মানুষের মত জীবন যাপন করে যেতে হবে? অথবা আদিমযুগের মানুষের মত বর্বরোচিত জীবন যাপন করাকে মেনে নিতে হবে? কালের ব্যবধানে নানা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল-মিলিয়ে চলতে গেলে কি জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক নয়?

আজ যদি এসব প্রশ্নের উত্তরে বলি, না, অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতেও কিছু পাল্টাবে না, সেটা সম্ভব নয়। তবে মূলটা রাখতে হবে এক। তার অর্থ কি? বিবাহ প্রথা থাকবে—কেবল ধরণ ধারণ পাল্টাবে। তাহলে কি বর্তমানকার মন্ত্রাচ্চারণ সাপেক্ষে অগ্নিসাকী প্রচলিত বিবাহপ্রথা পার্টে রেজিস্ট্রিপ্রথা মেনে নিতে হবে? অনেকে বলবেন, হ্যাঁ, অনেকে বলবেন, না। এর পক্ষে বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা যায়। কিন্তু এখানে সেই আলোচনায় গিয়ে এর কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। একটা কথা কেবল স্মরণ করাত্তে চাই—নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই একটা ছুস্তর আকর্ষণ বিদ্যমান। যাকে কেন্দ্র করে এক সময় বহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ’ত। ঘটা করে সম্প্রদান ও গ্রহণের স্বনির্দিষ্ট সূচিস্থিত পদ্ধতিতে পতি ও পত্নীবরণের বিধি প্রচলন হওয়ার জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনা এবং তজ্জনিত নানা বিশৃঙ্খলা প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। আজ আবার সেই নিয়মে কিছু কিছু শিথিলতা দেখা দেওয়ার অথবা রেজিস্ট্রিকরণ প্রথা চালু হওয়ার বহু প্রিয়জনের উপস্থিতিতে বা সাফে ভাবাবেগপূর্ণ পত্নী ও পতিবরণ না হওয়ার বহু বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হ’চ্ছে তুলনামূলক অনেক বেশী, সমাজ জীবনে নানা উজ্জ্বলা দেখা দিচ্ছে। বিবাহ-পদ্ধতিতে যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ আছে সে সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করলে এই বিবাহ-প্রথা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ কত মহিমামণ্ডিত সেটা ব্যাখ্যা করা যায়। কেবল বিবাহ-প্রথা বলে নয়, প্রচলিত সকল সংস্কারই একই রকমভাবে মহিমা দাবী করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দুসংস্কৃতি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের

আমনে উন্নীত। কালের আবর্তনে ভৌগোলিক কারণে
মহাভূমি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেও তারা সকলেই
ধর্মের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন শাস্ত্রাদির ঐতিহাসিক কাল-
পরম্পরা নিয়ে আলোচনার দেখা গেছে কোন কোনও মতে
বৈদিক ধর্ম শুরু হয়েছিল ৪৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। সেখানে
ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয় খ্রীষ্টীয়ের সপ্তদশ শতাব্দীতে ৫৭০
বছরের পরে। কারণ, ইতিহাস বলে, মক্কা শহরে ইসলাম
ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৫৭০
খ্রীষ্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল
খ্রীষ্টান ধর্ম, জন্ম নিয়েছিল ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম
ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যখন হিন্দু সংস্কৃতি শুরু
হয়েছিল তখন হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান বলে কোনও তফাৎ
ছিল না। তখন ছিল কেবল মহাভাষ্যজাতি—আর তাদের
সর্বতঃকল্যাণের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, একই ধর্ম ও
সংস্কৃতি। পরবর্তীকালে তারই বিশেষ কোন একটা মত বা
পথ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জাতি। কিন্তু
সেই প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম-
পুস্তক বর্তমানযুগে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ পরিচিত বলে। যদি এই
ধর্মাদর্শ বিশ্বাসী সকলের কল্যাণের জন্য। কেবল সকলের
জ্ঞান বললে ভুল হবে, এ ধর্ম সর্বকালের জন্য। এ ধর্ম নিত্য
ও চিরস্থায়ী ধর্ম। একমাত্র হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম।

কুসংস্কৃতি অপসংস্কৃতিকে বিতাড়িত করে সংস্কৃতির
আশ্রয় গ্রহণ সকল জাতিরই উচিত। সংস্কৃতি প্রকৃতই
সকল মানুষের সম্বন্ধতার সহায়ক, জাতীয় চেতনার
উদ্বোধক। সম্বন্ধ হয়ে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে
কর্তব্য পালন করলে সকল কল্যাণ উদ্বোধিত হতে
বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ যে কোন একটা সংস্কার
নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায় সেই সংস্কার কত
নিপুণভাবে সত্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। যেমন
শ্রম সংস্কার। শ্রমিকরাও ক্রিয়াকর্মের যে সকল পদ্ধতির
উল্লেখ আছে তা বুঝলে মুগ্ধ হওয়া ভিন্ন পথ থাকে না।
ক্রিয়াকাণ্ডে বিভিন্ন দেবতার পূজা, কাকপূজা, বৈভরনী পার
ইত্যাদির উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে, মৃত ব্যক্তিকে
পরমাস্থার সঙ্গে বিলন ঘটানোর বিভিন্ন ক্রিয়াকৌশল।

লতাগুল থেকে শুরু করে বৃক্ষ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে
জীবজগতের প্রতিটি জিনিসকে একীভূত করা এবং তাদের
প্রত্যেককেই বিরাটত্বের সঙ্গে মিশ্রনের প্রয়াস। উল্লিখিত
মন্ত্রাবলীর যথার্থ ব্যাখ্যার সৃষ্টিচক্র জগৎকল্প ছবির মত স্পষ্ট
হয়ে চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিটি
ক্ষেত্রেই এ একই সুর অনুরণিত। জীবকে সত্যজ্ঞানে
জানী করা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা মূলতঃ সমস্ত সংস্কার-
গুলোর অন্তর্নিহিত আবেদন ও সুপরিপক্কিত কৌশল।
বহু দেবতার পূজোপার্জন এবং পূজাপদ্ধতি সবই হিন্দুর
সংস্কারভুক্ত। হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি
না করে ভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের অনেকেই এই পূজোপার্জন
নিয়ে বিজ্ঞপাত্তক-স্বাক্ষর প্রয়োগ করে। কিন্তু, দেবতা
হলেন বিশেষ বিশেষভাবে ভাবাবিহীন বিশিষ্ট চৈতন্য।
কাজেই, এ পূজোপার্জনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চেতনা
জাগানোরই মন্ত্র রয়েছে। সরস্বতী পূজার মধ্য দিয়ে জ্ঞান
উন্মেষ, অগ্নি দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে তেজঃশক্তির উন্মেষ,
লক্ষ্মী পূজার মধ্য দিয়ে ধনশক্তির উন্মেষ, শিবপূজার মধ্য
দিয়ে জ্ঞানশক্তির বিস্ময়পূজার মধ্য দিয়ে প্রাণশক্তির উন্মেষ
ইত্যাদি। বিভিন্ন দেবতার পূজার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন চৈতন্য-
শক্তির উন্মেষ সাপেক্ষে মহতী প্রকৃতি শক্তির সঙ্গে একীভূত
হওয়াই উদ্দেশ্য। তাছাড়াও বিভিন্ন দেবতার পূজার
মাধ্যমে আমাদের জাগতিক জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়
বিভিন্ন জিনিস ও বিভিন্ন কৌশলের কথা ব্যক্ত হয়েছে।
যেমন, জীবন ধারণে অনেক প্রয়োজন—স্বরণ করানো হয়েছে
লক্ষ্মীপূজার মাধ্যমে। জলের প্রয়োজন—স্বরণ করানো
হয়েছে গঙ্গাপূজার মাধ্যমে। এরকম সবই প্রয়োজনভিত্তিক।
যেমন, বাতাসের প্রয়োজন, তাই পবনদেবতার পূজা। মৎস্ত
প্রয়োজন, তাই মৎস্তদেবতার পূজা ইত্যাদি। দেহধারণ
করতে ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে যে সকল জিনিস ও যে সকল
কৌশল প্রয়োজন সবই এ সকল দেবতার পূজার মাধ্যমে
সচেতন করা হয়েছে। দেবতার হাতের অস্ত্র বিভিন্ন শক্তির
প্রতীক, তাঁদের গানের অলঙ্কার নানা ঐশ্বর্য ও যোগেশ্বরের
প্রতীক। চলার পথে মহাভাষ্য জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলাও
সংকট অপসারণের নিমিত্তই বিভিন্ন দেবতার অবতায়

ও বিভিন্ন পুষ্টিপুষ্টি। স্বাভাবিক জীবন যাপনের স্বার্থে বৃক্ষের প্রয়োজন তাই ঘটা করে বৃক্ষরোপণ সংস্কারের উপস্থাপন। বৃক্ষ, ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড ও শিকড়ের মাধ্যমে জীবের জীবন ধারণের খাদ্য সরবরাহ করে, অক্সিজেন দান করে, বৃষ্টি আনয়ন করে। মোট কথা, হিন্দুধর্ম বর্ণিত সমস্ত সংস্কারই জীবন ধারণের ও চরম সত্যে পৌঁছানোর অত্যন্ত সহায়ক।

জীবের প্রকৃতি যেহেতু অভাবেরই অল্পবর্জন করে, সেহেতু সকলেরই উচিত হৃদয়ঙ্গম সংস্কার অমুযায়ী ক্রিয়া কলাপ করা এবং বারংবার তারই অহুষ্ঠান অভ্যাস

করা। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—তারই প্রেরণায় জীবের ক্রিয়া। সংসারের মূলেও ঐ ত্রিগুণ। কোথায়ও সমগুণের, কথায়ও রজঃগুণের, কোথায়ও তমগুণের প্রাবল্য। তাদের সংযোগে আবার মিশ্রগুণের আবির্ভাব। যখন যেগুণের প্রাবল্য, তখন সেই গুণেরই কার্য সংঘটিত হয়। জাতীয় চেতনা আগাতে এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করতে যেমন সংস্কৃতির প্রয়োজন, অন্তর্দিকে অধ্যাত্ম জীবন লাভ করে চরম সত্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও তেমনি সংস্কৃতির প্রয়োজন। পার্থিব তথা আধ্যাত্ম জীবনের সর্বাঙ্গিক কল্যাণের ধারক ও বাহক এই ধর্ম ও সংস্কৃতি।

শৃংখল

শ্রীমতী মণিদীপা

অনাদিকাল চলছে বয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা,
অনন্ত সেই পরম-পুরুষ পরশ পাবার আশা।
আকাশ ভালে সূর্যকিরণ
চন্দ্র তারার ঢাকা,
সেই আলোতে জ্বলবে যেন
তঁার আরতির শিখা।
ব্যস্ত বাতাস বিরামবিহীন
পথের পরিক্রমায়,
সবার আগে ধৃষ্ট হবে
তঁার চরণের ছোঁয়ায়।
আকুল হয়ে কাঁপিয়ে পড়ে
সাগর আঁখির জল,
অনাদিকাল চলছে যেন
তঁাকে পাবার জল।

পাহাড় ধরে কঠিন ধ্যানের
কঠিনতর পথ,
এই পথেতেই ধামবে আশায়
তঁাহার জয়রথ।

নিবিড় সিন্ধু মায়ায় ভরা
শ্যামল বনতল,
তঁার তরেতে গাঁথছে মালা
ছড়িয়ে-ফুলের দল।

টলবে আসন কার ছুয়ারে
যাবে সে রথখানি,
আকাশ বাতাস সেই স্বপনে
করছে কানাকানি।

নিষ্ঠাপ্রবণ সেবার কুসুম
বরণ করে তঁারে,
সৃষ্টি মাঝে ক্ষুদ্রতম
মানব কুটীর দ্বারে।

ক্ষুদ্র মানব ক্ষুদ্র হৃদয়
করলো অল্পভব—
জীবন যেন সজ্জফোটা
ফুলের সে এক স্তব।

আকাশ বাতাস বিনম্রতায় করলো নিরীক্ষণ,
অপূর্ণ সেই মানব-মাঝে পূর্ণ নারায়ণ।

তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা

শ্রীঅশোক কুমার বসু, জ্যোতিষশাস্ত্রী

তত্ত্বশাস্ত্র কাহাকে বলে? ইহা এক জাতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ বাহা হইতে নানা দেবদেবীর পূজার জন্ত অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের জন্ত মানুষ একটা বিশিষ্ট পথের সন্ধান পাইতে পারে। তন্মাত্ত হইতে তত্ত্ব শব্দটির উৎপত্তি। তন্মাত্তর অর্থ বিস্তারিত হওয়া। যে শাস্ত্র জীবনকে বিস্তারিত করে সে তত্ত্ব। তত্ত্বশাস্ত্র একটি বিশেষ প্রকারের ধর্মশাস্ত্র বাহা উদ্দেশ্য মানুষের অমৃত্যুতিকে বিস্তার করিয়া আত্মকেন্দ্রিকতা নাশ করিয়া বিশ্বকেন্দ্রিক করিয়া তোলা। বাহা উদ্দেশ্য ক্রিয়ায় মাধ্যমে মানুষ নিজ অন্তর্নিহিত নিদ্রিত শিবকে প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে। বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনার দুইটি ধারা বিস্তারিত আছে। একটি বৈদিক ও অপরটি তাত্ত্বিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও উপনিষদ এবং তাত্ত্বিক ধারার ভিত্তি সাংখ্য দর্শন, পতঞ্জলির বোগদর্শন ও অগণিত তত্ত্বশাস্ত্র। বৈদিক ধারার পূর্ণতা ভগবদ্গীতার এবং তাত্ত্বিক ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী চণ্ডীতে। সত্যযুগের শাস্ত্র বেদ, ত্রেতাযুগের শাস্ত্র শ্রুতি, দ্বাপরযুগের শাস্ত্র পুরাণ এবং কলিযুগের শাস্ত্র তত্ত্ব। পরম বস্তু লাভের জন্ত বাস্তব সাধনাকে তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বজ্ঞানকে বিশাল করিয়া জুমার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। বেদের অপর নাম নিগম এবং তত্ত্বের অপর নাম আগম। নিগম ও আগমের অর্থ একই—বাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত হইতেছে। জ্ঞান বিবিধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। দর্শনের কার্য জ্ঞাতার তত্ত্বাহুসন্ধান এবং বিজ্ঞানের কার্য জ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্বাহুসন্ধান। দর্শনের দৃষ্টি অর্থও সন্ধান দিকে এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টি ঋণ্ডিত জগতের দিকে। দর্শন দেখে সামগ্রিক ভাবে, বিজ্ঞান দেখে ঋণ্ড ঋণ্ড ভাবে। তাত্ত্বিকগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দৃষ্টি সম্পন্ন। তত্ত্ব শব্দের অর্থ যে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অমৃত্যু-পূর্ণ সন্ধানতত্ত্ব তথ্য নিরূপণ। বাহা অপরিবর্তনীয় তাহা

বেদ বেদান্তের আলোচ্য। পরিবর্তনশীল বাহা কিছু সবই তত্ত্বশাস্ত্রের বিচার্য। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল, সুতরাং জাগতিক বস্তু মাত্তই তত্ত্বের আলোচনার বিষয়। জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয় যখন উহা ঋণ্ড ও অঋণ্ড উভয় প্রকার অমৃত্যুত দান করে। তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য—তত্ত্ব সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে রূপদান করা। তত্ত্বের মূল হল চিং শক্তিকে স্বীকার করা এবং বিশ্বের সমস্তের মূলে যে চিং শক্তি বিদ্যমান ইহা জ্ঞাত হওয়া। এই চিং শক্তি আর কোন খানে নাই। বেদান্তের মধ্যেও নাই এবং ঋণ্ডদর্শনের কোন স্থানে নাই। চিং শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম। তাঁকেই তো শিব বলা হয়। চিং শক্তি মুক্ত হলেই তাঁর নাম হয় পরম শিব। তত্ত্বের পূজা ও অমৃত্যুতগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কোন মাদলিক অমৃত্যুতানে ঋণ্ড ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য। ঋণ্ড বেদের দান, আর পূজা তত্ত্বের। বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ আর তত্ত্বের চরম তত্ত্ব শক্তিবাদ। বেদের তিন ভাগ কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে সর্ববিধ যাগযজ্ঞাদি, জ্ঞানকাণ্ডে পরাজ্ঞানের কথা বা বেদান্তে কথা, ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব মুক্তি তত্ত্ব ইহার উপজীব্য। উপাসনা কাণ্ডে কি উপায়ে চরমতম লক্ষ্য বস্তুকে লাভ করিতে হইবে। এই কাণ্ড হইতেই তত্ত্বের প্রকাশ।

এই তত্ত্বশাস্ত্র হইতে আমরা কি কি জ্ঞানলাভ করিয়া জীবনে উপকৃত হইতে পারি

১। পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয়ের কথা (২) অতীন্দ্রিয় মন্ত্রশক্তির কথা (৩) ঋণ্ড তীর্থাদির বিবরণ (৪) চতুরাশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মানুষের কর্তব্য (৫) নানা দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি ও সিদ্ধি লাভের উপায় (৬) ধ্যান ও নানাবিধ কৃচ্ছ সাধনার বিবরণ (৭) কৃচ্ছবষ্ট কর্মের প্রয়োগ ও বিধান। (৮) আয়ুর্বেদ।

(৯) নানা ভেষজ ও রসায়নবিদ্যা (১০) বাত্ৰ বিদ্যা (১১) ভূতত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মনোজ্ঞতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, অক্ষশাস্ত্র বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি অর্থাৎ স্থল জগতের ব্যবহার বিষয়ের জ্ঞান আমরা এই শাস্ত্র হইতে লাভ করিতে পারি। ১২) সাধনার দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃতি-মার্গে অষ্ট ঐবর্ধ্য ভোগ করা যায়। এবং নিবৃত্তিমার্গের সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করা যায়।

তান্ত্রিক পূজার মূলতত্ত্ব—আদিম মানুষের সর্পভয়, হিংস্র জন্তুভয়, রোগভয়, ক্রয় প্রকৃতির ভয় ও নানা অজানা শক্তির আক্রমণের প্রতিবেদক রূপেই তন্ত্রের প্রাথমিক মন্ত্র-গুলির জন্ম হয়। পরবর্তী কালে ইহার আরও উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া মানুষ অষ্টসিদ্ধি ও জ্ঞানমুক্তি লাভে সমর্থ হয়। তান্ত্রিক মতে পূজা দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য-কর্ম হল ত্রিশঙ্কা আর ইষ্ট ও কুলদেবতার পূজা। আর নৈমিত্তিক কর্ম অর্থে কোন বিশেষ সংকল্পে যজ্ঞ, তপস্চর্চা ও ব্রত। তান্ত্রিক মতে মন্ত্র তিন প্রকার যথা—পুং, স্ত্রী ও ক্রীমন্ত্র। যে মন্ত্রের অন্তে “হংকট” থাকে তাহা পুং মন্ত্র। যাহার অন্তে স্বাহা থাকে তাহা স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে নমঃ থাকে তাহা ক্রীমন্ত্র।

বৈদিক গায়ত্রী এক ও অমিত্যয়ী কিন্তু তন্ত্রগায়ত্রী দেবতাভেদে বহু। যেমন নারায়ণ গায়ত্রী, জুর্গা গায়ত্রী, সূর্য গায়ত্রী, তারা গায়ত্রী ইত্যাদি। তন্ত্রের পঞ্চোপাসক শাস্ত্র শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। তন্ত্রের মূল গায়ত্রী “আত্মারৈ বিব্রহে-পরমাত্মর্থে ধীমহি-তনঃকালী প্রচোদয়াৎ”।

পুরস্চরণ—মন্ত্র জপে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমেই যে কণ্ঠের অমুষ্ঠান করা হয় তাহাকে পুরস্চরণ বলে। পুরস্চরণ না হলে মন্ত্র সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয় না। পুরস্চরণ অর্থে পাঁচটি কর্ম যথা—১। নিত্যপূজা—২। ইষ্টমন্ত্র জপ ৩। তর্পণ ৪। হোম ও ৫। ব্রাহ্মণ-ভোজন। এমন কি একাধি মনে শুদ্ধ চিত্তে কেবল মন্ত্র জপ করিতে পারিলেই অল্প আচার অমুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এই জপ তিন প্রকার যথা মানসিক, উপাঙ্গ ও বাচনিক। ধ্যান ও মন্ত্র জপে মন্ত্র শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। ইহার একটি বিধি নিম্ন আছে বাণের স্বাস্থ্য ঐ মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া ওঠে, তখনই উহা

ফলপ্রসূ হয়। ভিন্ন ভিন্ন পুঙ্খ ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও যন্ত্র। মন্ত্রের অর্থ দেবতার কাছে তাঁর প্রশস্তিমূলক স্তোত্রপাঠ ও প্রার্থনা এবং যন্ত্র হইল দেবতার অধিষ্ঠানচক্র অর্থাৎ আসনের রেখাঙ্কন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিজ-নিজ আসন আছে এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট আসনে তাঁহারা বসিতে অধিক আনন্দিত হন। কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার পূজার অপরিহার্য। কারণ দেবতার প্রতীক স্বরূপ এই রেখাঙ্কন যন্ত্র দিয়া মানুষের যত চুঃখ কষ্ট নিঃস্রব করা যায়। যোগিনী তন্ত্রের মতে দেবীর পূজার জন্ম প্রতিমা-মণ্ডল বা যন্ত্রমূর্ত্তিহাদের যে কোন একটি ব্যবহার করা যায়। অথর্ববেদে ও তৈত্তিরীর আরণ্যকে তান্ত্রিক মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

তন্ত্রের দেবদেবীঃ তন্ত্রমতে দেবতা মানুষের মূর্ত কল্পনা। এই দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের ভয়, বিশ্বাস ও ভক্তি হইতে। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন দেবী তারা বা অষ্ট মহাজ্ঞা তারা। তিনি অগ্নিভয়, দস্যুভয়, বন্ধনভয়, সর্পভয় ইত্যাদি ভয় হইতে মানুষকে জাগ করেন। পূর্বাঞ্চলের সূর্যপেক্ষা স্ত্রীমন্ত দেবী হলেন দেবী কালিকা, ইনিই চণ্ডী-দেবীর ক্রোধজাত নবরূপ। এই চণ্ডীদেবী বিদ্যাবাসিনী শবরী ভারতের আদিবাসী শবরজাতির ইষ্ট দেবতা। এই দেবী কালিকার বিভিন্ন রূপ যথা—দক্ষিণাকালী-সিদ্ধকালী-গুরুকালী, ভদ্রকালী, শশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী, দেওয়ালী, রটকী ও ফলহারিণী কালী। দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী। ললিতা, ত্রিপুরাসুন্দরী ও শ্রীরিত্তা এই তিন দেবী এক ও অভিন্ন। কাম্বোজীয় তন্ত্র সম্প্রদায়ের সাধারণতঃ অবৈতশৈববাদী তাই শিবই তাহাদের আরাধ্য দেবতা। বৌদ্ধতন্ত্রে কালী, সরস্বতী ও ভদ্রকালী এই তিন দেবীর সম্মিলিত রূপই দেবী তারা। এই তারা বা তারিণী-দেবীকে নীল সরস্বতীও বলা হয়, কারণ ইনি বাক-শক্তি দেন—বিজ্ঞানাত্তের জন্ম এই দেবীর পূজা করা হয়।

দুর্গাতিলাশিনী মা দুর্গা—এই দেবী মানুষকে বুদ্ধান্ত্রে, অগ্নিবাহে, নদীতীরে, কান্ডারে, প্রবাহে, রাক্ষসোবে, চোয় ও শত্রুভয়ে থেকে রক্ষা করেন। অনেকের মতে শায়দীয়া

দুর্গাপূজার সময় হইয়াছিল কৃষকদের ঘরে। কারণ আজও দুর্গাপূজার প্রাকালে নবপত্রিকা বা কলার্বোরের পূজা হয়—কলা, কচু, হলুদ, জ্বরভী, বেগ, হাড়িম, অশোক, মান ও ধান দিয়া এই নয়টি বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মাণী-কালী, দুর্গা, কার্তিক, শিব, বক্রহস্তিকা, শঙ্করহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। তদ্ব্যবস্বে এইরূপ সাংসারিক যে কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য বা যোগ, শোক, হুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি নিবারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী আছেন এবং তাহাদের বিধিমত পূজারও ব্যবস্থা আছে। তদ্ব্যবস্বে দীক্ষিত যে কোন ব্যক্তি শুভদিনে শুভক্ষেণে শুভ, ও একাগ্র মনে যদি সেই দেবীর পূজা করিতে পারেন তবে ফল অবশ্যস্বাভাবী। এত জোর দিয়া আর কোন ধর্মমতের ইহা বলার ক্ষমতা নাই। তবে এই পূজার একমাত্র উপকরণ, পূজারী ও আরাধ্যা দেবীর আত্মা পূজা চলাকালীন এক হইতে হইবে। তাহা না হইলে কিন্তু এই পূজা ফলপ্রসূ হইবে না।

তান্ত্রিক দীক্ষা বা অভিষেক :—বৈদিক যুগে এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও মধ্যে দীক্ষিত হইবার ও দীক্ষা দিবার অধিকার ছিল না। তাই মহাশিব সকল শ্রেণীর মানুষের ও জীজ্ঞাক্তির উদ্ধারের জন্য এই তন্ত্র শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। তন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া কাহারও পূজার অধিকার থাকে না। তন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক হইয়া যাবি এবং সকলের সমান অধিকার জন্মে। তবে দীক্ষাদান নির্ভর করে গুরু শক্তি ও শিষ্যের আধ্যাত্মিক উপর। তদ্ব্যবস্বে আধ্যাত্মিক স্তর অনুযায়ী মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা পশ্চাচার, বীরাচার ও দৈবাচার। গুরু শিষ্যকে প্রথমে পশ্চাচারে দীক্ষিত করেন—কোন শুভদিনে মন্ত্রপুত্বে জলে স্নান করাইয়া ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া। ইহাকে অভিষেকও বলা হয়। এই দীক্ষা দুই প্রকার শাক্ত ও পূর্ব। তদ্ব্যবস্বে মানুষের জন্ম হয় দক্ষিণাচারে অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গে। দীক্ষা প্রাপ্তির পর তাহার পুনর্জন্ম হয় নিবৃত্তি মার্গে। এই দীক্ষা সার্ব প্রকারের হয় যথা বাগদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা ও দৃষ্টিদীক্ষা—চিন্তাশূন্যে দীক্ষা ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শ দীক্ষা হইয়াছিল। এর পর শিষ্য সাধন পথে কিছুটা উন্নত হইলে গুরু তাহাকে পুনরায় উচ্চতরের দীক্ষা দান করেন। ইহাকে

পূর্ণাভিষেক বলা হয়। শেষে শিষ্যের উচ্চতম স্তরে উন্নতির জন্য গুরু পুনরায় শিষ্যকে দীক্ষা দেন ইহার নাম মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেক বা বিরজাগ্রহণাভিষেক। তবে এক জন্মে তিন স্তরে উন্নত হওয়া অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব।

তান্ত্রিক সাধনা : উপনিষদযুগে সাধকের লক্ষ্য যেমন অমৃত লাভ, তদ্ব্যবস্বে সাধকের লক্ষ্য তেমনই পাশ-মুক্ত হওয়া। এই পাশের সংখ্যা আটটি যথা—লক্ষ্মা, যুগা, তনু, শক, ভূতপা, কুল, শীল ও জাতি। এই সকল পাশ বা বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সাধক সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যবস্বে প্রথমে প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করা। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহার মধ্যে একটা বিপরীত শক্তির সৃষ্টি হয়, যে শক্তি প্রবৃত্তির বিপরীতে ঘটিয়ে দেয়। স্বভাবতঃ মানুষের কামনা নীচগামী। সেই কামনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহা একটি উর্দ্ধগামী শক্তিতে পরিণত হইয়া সাধকের সাধনায় সাহায্য করে। সেই জন্য এই তন্ত্র-সাধনা প্রবৃত্তিমুখী বা ভোগাভিমুখ অর্থাৎ ভোগের বা প্রবৃত্তির মাধ্যমেই ত্যাগের বা নিবৃত্তি মার্গে উন্নতির সাধনা। একই সাধনায় শূল ও সূক্ষ্ম তেজে দুই রূপ। এই সাধনা পঞ্চম-কারের অর্থাৎ মংস্ত্র, মাংস, মৈথুন, মন্ত্র ও মূর্ত্তা। পঞ্চম কারের শূল সাধনা স্তরভেদে সাত প্রকার যথা—১। বেদাচার ২। বৈষ্ণবাচার ৩। শৈবাচার ৪। দক্ষিণাচার ৫। বামাচার ৬। সিদ্ধাচার ৭। কোলাচার। প্রথম স্তরে সাধক এই পাঁচ শূল 'স-কার'ই গ্রহণ করিতে পারেন তবে কতকগুলি বিধিনিষেধের মধ্য দিয়া। ইহাতে সাধক সিদ্ধ হইবার পর অর্থাৎ কোলাচার স্তরে উপনীত হইবার পরে তাহাকে গুরু পঞ্চম কারের সূক্ষ্ম সাধনায় দীক্ষা দান করেন। এই সাধনা অতি সূক্ষ্ম ও গুরুমুখী। ইহা তন্ত্রের ক্রিয়াযোগ। মংস্ত্র অর্থে শাস-প্রশাস এবং ইহা বিচরণ করে গজা-ঘৃণায় বা ইড়া-পিকলা নাড়ীতে এবং প্রাণায়াম দ্বারা এই সাধনা করিতে হয়। মাংস-মা অর্থে রসনা বা বাক্য। ইহার সংযমকেই মাংস সাধনা বলে। মৈথুন অর্থে মূল্যধারিত শক্তির, আত্মাচক্রস্থিত শিবের সহিত মিলনকে সূক্ষ্ম মৈথুনসাধনা বলে। মূর্ত্তা—সাধনায় দ্বারা সহস্রার চক্র হইতে যে অমৃত ধারা নির্গত হয় তাহা পান করাকেই মন্ত্র সাধনা বলে। মূর্ত্তা—সহস্রমূলে যে সমষ্টিগত আত্মা আছে, আত্ম কর্ণের দ্বারা বোগী যখন তাহা প্রত্যক্ষ করেন তখন তাহাকে মূর্ত্তা সাধক বলা হয়। এইভাবে সাধক জ্ঞানমুক্তি লাভ করে।

সম্বৎসর প্রচারের স্মৃতিকথা (বরদারাজ্যের সিদ্ধপুরের পথে চারণদল) স্বামী বুদ্ধানন্দ

স্মৃতিকথা, সম্বৎসর প্রচারপর্বের একেবারে আদিকথা নয়, আদিকথা; সে তো শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কথা, একেবারে আদিকথা জানিতে হইলে সম্বৎসর ইতিহাসের স্মৃতিপথ ধরিয়া আমাদিগকে ইং ১৯২৪ সালে পৌঁছিতে হইবে, সে যেন গন্ধোত্রী হিমন্তু হইতে প্রবল ভরদ্বীপী গঙ্গা কলকলরবে বহিয়া চলিয়াছে, ব্যাপ্তি না থাকিলেও গঙ্গা সেখানে দুর্বার, দুর্গম গিরিপথে কোনও বাধাই তো মানে না, তারপর কতশত নগর গ্রাম প্রাবিত করিয়া, অগণ্য জীবন ধ্বংস করিয়া গঙ্গা সেখানে ছুটিয়া চলিয়াছে অসীম অনন্ত মহাসাগর পানে।

সে সবই রোমহর্ষক ভাববিচিত্র কথা। ভোরের আলো তখনও পৃথিবীর বুকে তেমন করিয়া নাহিয়া পড়ে নাই কিন্তু আলোর দূত সম্বৎসর্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ পথে বাহির হইয়া পড়িতেছেন, প্রাণারাম শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সম্মুখে মহাপ্রবল দণ্ডায়মান, তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ চলিতেছে। যাত্রারস্ত্রে প্রণাম, চলার পথে অস্তরে অনন্ত প্রণাম—কিরিয়া অস্ত্রে প্রণাম, এ যেন গীতার সেই অর্জুন-প্রণাম—“নমো নমস্তেহস্ত তে সহস্রকৃৎ পুনশ্চ স্ক্রোহপি নমঃ নমস্তে—”

পূজ্য শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী, পূজ্য শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী পরিচালিত সেদিনের ছুটি চারণ দল, তখনও দশটি, আটটি বা সাতটি চারণ দল হয় নাই। কখনও শ্রীগুরু নামগানে বিভোর হইয়া, কখনও ঘেণাঅবোধক গানে জনগণ মন-প্রাণ মাতাইয়া চারণদল পথে চলিয়াছে। অগ্রে গৈরিক বস্ত্রাবরণে আবৃত সম্রাসীর দল, শিরে শিরস্রান, হস্তে জ্ঞান-দণ্ড, মুখমণ্ডলে তাদের বৈরাগ্যের অমিয় স্ফোতি, বসনে ক্ষুণ্ণ চলনে বলনে তাদের সংসমের স্নিদ্ধ মাধুর্য্য, সৌম্য-শান্ত গতি, স্নিতবদন যেন দেবকুমারগণ। সঙ্গে তাদের শ্রী

ঠাকুরের বার্তাবহ কিছু কাগজপত্রের বোলা, সাথে ব্রহ্মচারী সেবকগণের স্বল্পে স্বল্পে খোল হারমনিয়াম, হাতে করতাল, মাঝে করতল প্রসারিত বস্ত্র, সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের উদাত্ত আহ্বান—“ভিক্ষা দাও গো দেশের ভিক্ষুককে বার যা আছে দেশের তাই / বাংলা আজি হতেছে শ্মশান, সোনার বাংলা হতেছে ছাই—ভীষণ দুর্ভিক্ষরূপে মহামার করিতেছে আজি দেশ ছারখার / ঐ শুন শুন উঠে হাহাকার, কারো স্মরণে নাই।”

সে চলা দিবারাত্রির ভেদ মানে না, গ্যাসের আলোতে ভীত রাতের আঁধার পথ ছাড়িয়া দিতেছে। অমলিঙ্গা সেখানে দেহকে হতবল করে না। অস্তরে আকৃতি “ক্ষুধা পেলে দিও খুধা, মিটে যাবে ভব ক্ষুধা।” বিদ্র-বিপত্তি রূপ বিষধর উদ্ভত ফণা তুলে যেন খেয়ে আসে কিন্তু যিনি বিপদেতে আগে চলেন তাঁরই মোহন মন্ত্রে নির্বিষ হইয়া আবার তারা যেন ফুটলে লুটাইয়া পড়ে, সেখানে সম্মানদল প্রাণদেবতার মহাভাবে মগ্ন, তাঁরই জগৎস্রল কর্মে তারা মাতোয়ারা, মহাজাগরণ, মহামিলনের অপূর্ণ হিজোল। তাদের কাছে আশ ছোটবড়, উচু-নীচু, আপন-পরের ভেদ নাই, সব বিভেদ ঘুচাইয়া সবারই দ্বারে দাঁড়াইয়া দেবদূত সম্রাসীর দল। তারা বাহিরের ঝোলায় ভরিয়া তুলিয়া লইতেছেন তাদের মহান দান, আর অস্তরের ঝোলায় তুলিয়া লইতেছেন যুগ যুগান্তের জগৎজীবের মায়ামোহ, পাপতাপ, দুঃখবেদনার রাশি। বিলাইয়া দিতেছেন অকাতরে যুগদেবতার আশীর্বাদের পূণ্যপাবনীধারা—পরমা শান্তি ও অনন্ত, প্রশান্তি।

তবু আলোচ্য কথা, একেবারে আদিকথা না হইলেও শতাব্দীর চতুর্থ দশকের কথা, এও সম্বৎসর প্রচারপর্বের স্মৃতিকথা। ইং ১৯৪৬ সাল, সম্বৎসর সিদ্ধপীঠ বাজিতপুরে শ্রীশ্রীমহাপূর্ণিমা মহোৎসব, যুগদেবতা স্বামী প্রণবানন্দের

মহাপ্রকাশের মহাতিথি, জনগণের আশীর্বাদলাভের পুণ্য-
তিথিও; শ্রীশ্রীমহাশয় তো নিজমুখেই বলিয়াছেন “আগামী
স্বাধীনতার দিনে—তপঃশক্তি, তপঃভক্তি ও তপঃপ্রভাবের
পরিপূর্ণ বিকাশের দিনে বাহাতে তোমরা সকলে সম্ব-
নেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পরিপূর্ণ তপঃভক্তের
বিকাশের সময়ে তাঁহার শুভদৃষ্টি ভক্তাশীর্বাদ ও তপঃপ্রভাব
গ্রহণ করিতে পার প্রাপ্যপথে সেই আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা,
বাকুলতা লইয়া আসিতে প্রস্তুত হও।”

বাক্তিতপূর করিমপুর জেলার মাদারীপুর শাবডিভিশনের
একটি গ্রাম। গ্রামটি কিছুটা দুর্গমও বলা যায়, তবুও দু-
দ্রান্তর হইতে আগত এই মহোৎসবে, লক্ষ্যমুখী লক্ষলোকের
সমাগম। চুষকের আকর্ষণে সবাই যেন ছুটিয়া আসিয়াছেন
ভাববাহ্যের এই দেবতীর্থে।

প্রতিবারের গ্রায় এবারও মহোৎসবের স্বর্গীয় আনন্দে
আপ্ত হইয়া দু-নিকটের ভক্ত-শিষ্যগণ বে যার স্থানে
উৎসবান্তে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রবীণ নবীন
সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-সেবকগণও অনেকেই উৎসব শেষে
কলিকাতা অভিমুখী হইলেন। পূজ্যপাদ সন্যাসভাপতি
শ্রীমৎ বড় স্বামীজী, শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজী, শ্রীমৎ
যোগানন্দ স্বামীজী, শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী, শ্রীমৎ
অধৈতানন্দ স্বামীজী সবাই রওনা হইলেন।

বিষ্ণু বিগলিত করুণা গজাক্রমে স্বর্ণ হইতে শিবজটাজালে
নাখিয়া আসিলেন। তারপর ধূজটির আলুলালিত জটাজালে
বিবৃত-ব্যাপিত গজা গজোজীর গোমুখ হইতে ধরাধামের
নগরে গ্রামে প্রবাহিত হইয়া চলিলেন। স্বর্ণধামের স্তায়
গজোজীও তাই পরম পুণ্যধাম।

বাক্তিতপূর নিষ্কণ্ঠের মহাশক্তি কেন্দ্রের ধর্মচক্রে
আবর্তিত হইয়া সকলে স্বীয় স্বীয় জীবনকে নবরূপে নবভাবে
পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, এবার চলিয়াছেন সঙ্ঘের দ্বিতীয়
শক্তিপীঠ শ্রীভগবানের দিব্যলীলা বিজড়িত কলিকাতা
আশ্রমে, এই পুণ্যক্ষেত্রে কর্মচক্রে আবর্তিত হইয়া, অঙ্গমুদল
কর্মের অক্ষয় প্রেরণা লইয়া সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সেবকগণ
ভারতের নগরে গ্রামে, দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িবেন,
সন্যাসস্তানগণ সন্যাসেবতার নির্দেশিত পথে, তাঁরই ধর্ম ও

কর্মচক্রে আত্মনিয়োগ করিবেন ইহাইতো যুগপুরুষের নিধান
ও বিধান।

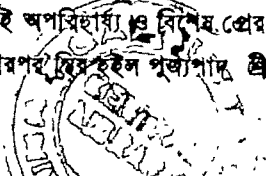
বাক্তিতপূর আশ্রম হইতে ফিরিয়াই কলিকাতা আশ্রমে
শ্রীশ্রীপ্রবানন্দ জয়ন্তী ও শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে বিরাট
বর্ষাঢ্য শোভাযাত্রা, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন
ও উদ্‌যাপন বেশ সমারোহেই সম্পন্ন হইল, এবার সন্য-
পরিচালক সমিতির বিশেষ অধিবেশন ও সন্ন্যাসী সম্মেলন
এ দুটি অগ্রগণ্য ও সন্য-জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই ফাঁকে শ্রীমৎ ওকারানন্দ স্বামীজীকে ফিরিয়া
একান্তে প্রচার মণ্ডলীর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা সভা
বসিল। ৭টি প্রচারক দলের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সবাই প্রায়
যোগ দিলেন। প্রচার পার্টির নেতা ও সহনেতাদের
উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি ও প্রচার
পার্টি কোথায় কোথায় যাইবে, কোন কোন পার্টিতে কে কে
থাকিবে এ ধরনের সূত্র বিষয়ই প্রধানতঃ আলোচিত
হইল।

সেখানেই মোটামুটি স্থির হইল একটি প্রচার মণ্ডলী
এবার গুজরাটে যাইবে এবং তাদের গন্তব্য স্থান হইবে উত্তর
গুজরাটের বিভিন্ন নগর গ্রাম। বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য
স্থানেও প্রচারমণ্ডলীগুলির গন্তব্যস্থল সমূহ সম্পর্কেও
আলোচনা হইল। তারপর সঙ্ঘের পরিচালক মণ্ডলীর
সভায় আলোচনান্তে সামান্য পরিবর্তন সহ পূর্বতন আলোচ্য
বিষয় প্রায় সমস্তই অম্লস্বাদিত হইল।

স্থির হইল গুজরাটের প্রচার-মণ্ডলীর পরিচালনার দায়িত্বে
থাকিবেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দস্বামী মহারাজ আর সর্বোপরি নেতৃত্বে
থাকিবেন সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির বরিষ্ঠ সদস্য ও
পূজ্যপাদ অন্ততম সম্পাদক শ্রীমৎ অধৈতানন্দ স্বামীজী।
পূজ্য স্বামীজী বাংলা, গুজরাট, হিন্দী, ইংরাজী বিভিন্ন
ভাষার খ্যাতিমান ধর্মপ্রবক্তা, প্রচারমণ্ডলীর যে সব বিশেষ
উদ্দেশ্য যথা—সভা-সম্মেলনের আয়োজন, ভক্ত নবনারীগণকে
নাথনা-দীক্ষা দান, সঙ্ঘের সেবা ও জনহিতকর কর্মের জন্য
অর্বসংগ্রহ সমস্ত ব্যাপারেই পূজ্য স্বামীজীর উপস্থিতি
একান্তই অপরিহার্য ও নিশ্চয় প্রেরণাপ্রদ।

তারপর স্থির হইল পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অধৈতানন্দ স্বামীজী



ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ ছাড়াও প্রচার দলে থাকিবেন স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী, ব্র: মুকুন্দজ, ব্র: চণ্ডী, ব্র: পরেশ, ব্র: মদন, গায়ক শ্রীমণী মোহন, বাদক শ্রীমতোজ্ঞ নাথ, সেবক মহানন্দ আর সেবক বিদ্যুৎ ।

আরও স্থির হইল মোট এগার জনের এই চারপদল প্রথমে যাইবে গুজরাটের বরোদা রাজ্যের সিঁহপুরে, তারপর ভীমনগর, বড়নগর, বিজাপুর, লাভোল, গোণ্ডারিরা প্রভৃতি স্থানে । যাত্রারস্তর প্রস্তুতি পূর্বে আশীর্বাদানান্তে সঙ্ঘ-সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বড় স্বামীজী সঙ্ঘদেবতার মহাবাগী স্মরণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন “অবিরাম অবিপ্রাস্ত প্রচার যতদিন চলিবে ততদিনই সঙ্ঘজীবিত থাকিবে । তিনি বলিলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “সমগ্র দেশে এমন ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে বাহার প্রভাবে প্রভাবাধিত হইয়া বাহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া এদেশ আবার জাগিয়া উঠিবে ।” তিনি আরও বলিলেন ব্যাস বশিষ্ঠ বাস্মীকি আদর্শ, ধ্রুব প্রহ্লাদ, শঙ্করের জ্ঞান লইয়াই তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন প্রহ্লাদ-শঙ্কর ।”

প্রণামান্তে তাঁর শ্রীচরণমূলে বসিলে সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, ‘যুগনিয়ন্তর স্তম্ভ মহান ও স্বকঠোর দায়িত্বভার উদ্ভাপনের জন্ম আর ছিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতির দেহ-মন-প্রাণে, তার ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে মহাশক্তির প্রবল বজ্রা আনিয়া তাহাকে পুনরায় সাঁহনী, দ্বিগুণরী, স্বাধীন ও সংগঠিত জাতিরূপে তৈয়ার করিবার অস্ত্র সম্বন্ধে সম্মানী ব্রহ্মচারীগণের এই প্রচার বাত্মা শত হুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা, শত ঘাত-প্রতিঘাত হাসিমুখে বরণ করিয়া গ্রাস হইতে গ্রাসান্তরে নগর হইতে নগরান্তরে উদ্ধা-গতিতে ছুটিয়া চলিতে হইবে । বাংলা, বিহার, আসাম, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব দিকে দিকে সর্বত্র জাতিকে মহাজাগরণ মহামিলনের মন্ত্র শুনাইতে হইবে ।”

যাত্রাপূর্ব্বের দুইদিন পূর্বে হইতেই পার্টির জিনিষপত্র গুহানো হইতেছে, যাত্রারস্তর দিন অতি প্রভূষ হইতেই পথের আহাৰ্যাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল । শ্রীমন্দিরে একে একে সকলেই আমরা আরতি করিলাম । অগস্ত্র সকলকে প্রণাম করিয়া সকলের স্নেহ ভালবাসা আর আশীর্বাদ লইয়া

আশ্রম হইতে আমরা যাত্রারস্ত্র করিলাম ।

সেদিন-ছিল ইং ১২৪৬ সালের, ২রা এপ্রিল । বৈকাল ৫টার সময় দিল্লী মেল হাওড়া হইতে ছাড়িবে, তাই আমরা তাড়াতাড়ি অর্থাৎ বেলা ২টার মধ্যেই মালপত্র সহ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম । দিল্লী মেল ৪।০টার ষ্টেশনে প্রবেশ করিল কিন্তু বড় ভীড় । তখনকার দিনে আসন সংরক্ষণের এত ব্যবস্থা ছিল না । ভীড় টেলিয়া এত মালপত্র লইয়া কিছুতেই আর ট্রেনে উঠা গেল না । অগত্যা রাত্রি ৯।০টার গাড়ীতে উঠা স্থির হইল । ষ্টেশনে কর্তব্যরত পদস্থ রেল-কর্মচারীদের সাহায্যে এবার আমরা ভালভাবেই স্থান করিয়া লইলাম । যথা সময়েই ট্রেন ছাড়িয়া দিল । বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশের উপর দিয়া ছোট বড় বহু ষ্টেশন, বহু জনপদ পাড়ি দিয়া ৪টা এপ্রিল প্রাতে মহাভারতের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর আর বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম ।

এই দিল্লী ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার এক আশ্চর্য্য নগরী । দেশীয় বিদেশীয় শাসকগণের এখানেই সেই লোভনীয় সিংহাসন কত নাদিরশাহ, তৈমুরলঙ্গ, কত সুলতান বামুদ, মহম্মদ গজনীর স্তেন দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে । এই গরবিনী নগরীর হতভাগ্য প্রজাদের বুকের উপর দিয়া কত অত্যাচার অনাচার রক্তের গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে, ইহার রাজপথ রাজসিংহাসন কত লাভহত্যা, কত পিতৃহত্যার কলকে কলকিত হইয়াছে, কে আজ সেই রোমহর্ষক মদিলিষ্ট স্বত্তিধার উদ্ভাটন করিবে ? হিন্দুভারতের বহু অঘটন ঘটনার সাক্ষী এই দিল্লী মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থান পতনেরও স্মৃতিস্তম্ভ । ইংরাজ শাসনের গৌরব এই দিল্লী অচিরেই আবার তার আসন্ন ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আজ অস্তিত্ব পূর্বে প্রবেশের মুখে ।

যাক সে কথা আমরা যখন দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন দিনের আলো শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া বাল্যে পৌঁছিয়াছে । বেলা তখন ৮ ঘটকা । জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বি, বি, সি, আই এর ট্রেন সঙ্গে সঙ্গেই আছে । উহা প্রায় ১০টার ছাড়িবে, তাছাড়া বৈকালেও এবটি ট্রেন ছাড়িবে ।

আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ইচ্ছা ছিল রাজ-ধানীটা এবং দানবীর স্বর্ধর্শনিষ্ঠ শেঠ বিড়লাজী দিল্লীর বুকে যে বিশাল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির তৈয়ার করিয়াছেন তাহা একবার দেখিয়া বাই।

সত্যই বিড়লাজীর এই মন্দিরে গেলে বিরাট হিন্দুধর্মের এক ছোটখাট অপরূপ রূপের বেন দর্শন হয়। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে হিন্দুধর্ম ও কৃষ্টির রক্ষার জন্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। আজ নিপীড়িত হিন্দুজাতির লক্ষ লক্ষ মন্দিরের মধ্যে এর বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর এই মন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে। যে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে এই মন্দির তারই। উচ্চপর্বের অভিযাত্রী হিন্দু যাহা তাদের আজ বলি, আগে তোমরা মিথ্যা অহঙ্কারের বড়াই করিও না, মিথ্যা অপ্সৃগতার মোহে পড়িয়া আজ আর ছিন্নমস্তা সাজিও না, নিজের শরীরকে এমনভাবে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া আর শূণাল কুকুরের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিও না। ভাই! অপ্সৃগতার কষাঘাতে তোমার মন্দিরের দেবতা পাষণ হইয়া বাইতেছেন, তুমি নিজেই নিজের মাঝে শত সংশয় জাত-পাতের ভেদের প্রাচীর তুলিয়া দিও না। অপ্সৃগতার বিষে জর্জরিত হেহ লইয়া তুমি কি করিয়া বাঁচিবে? বিচ্ছেদে মৃত্যু; মিলনেই যে স্বথ, শান্তি, জীবন। এ বিচ্ছেদ মন্ত তোমাকে কে শিখাইল? ক্রীমাম, ক্রীকৃষ্ণ? বৃদ্ধ; শব্দ, চৈতন্য? কে? নিজের মৃত্যুবান কেন নিজেই তৈরী করিতেছ? ভাই! একটু শান্ত হও, বিচার করিয়া চল, যদি উন্নতি চাও এখনও সময় আছে। হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া ডাক, ভাইকে ভাই বলিয়া কোলে তুলিয়া লও, আপনার অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিও না, তাহাকে ঘৃণা করিও না। তাহার ভিতরে তো তিনিই আছেন, সাবধান! একেও যদি তোমার ঘুম না ভাঙে তবে বিপদের তীব্র কষাঘাত যখন নামিয়া আসিবে, মহা প্রলয়ের রোলার তোমার বুকের উপর দিয়া যখন চলিতে থাকিবে তখন ত্রাহি ত্রাহি চিংকার করিলেও আর ত্রাণ পাইবে না। আজ ধন্ত তুমি বিড়লাজী। তোমার ঐ মহামন্দির হিন্দুজাতির আদর্শ হউক, দিকে দিকে আজ হিন্দু মিলন-মন্দির গড়িয়া উঠুক।

যুগদেবতা স্বামী প্রণবানন্দজী নগরে গ্রামে হিন্দু মিলন-মন্দির নির্মাণের ডাক শুনাইয়া গিয়াছেন সিংহনাদে হিন্দু জাতিকে। আজ সেই গাঢ়োথানের, মহাজাগরণের পথে হে বিড়লাজী তোমার এই মহামন্দির সেই পথেই একটি উজ্জ্বল পথপ্রদীপ হইয়া থাকুক।

যাক আমাদের দিল্লী দর্শনের ইচ্ছা এক্ষণে ইচ্ছামাত্র রূপেই রহিয়া গেল। নানারূপ অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া তখনকার মত নিরস্ত হইতে হইল।

আমরা আমাদের বাওয়ার পথের ট্রেণখানিতে বাইয়া বসিলাম। যথা সময়ে উহা রাজস্থানের জয়পুর, বোধপুর, আর বরোদা, আমোদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের যাত্রীদের লইয়া ছুটিয়া চলিল। বড়বড় স্টেশনগুলিতে একটু একটু বিশ্রাম লইলেও একেবারে গন্তব্যস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত ট্রেনটির ছুটির যেন আর শেষ হইল না।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত রাজপুতনার দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যদিয়া যখন গাড়ী ছুটিয়া চলে তখন অস্ত্রের কথা না জানিলেও শ্রামলা স্নিগ্ধা বজ্রজননী অনভ্যস্ত সন্তানগণের যে কি কষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। বিধাতার আবার কি ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন। এমন শুষ্কদেশের সমস্তই যেন শুষ্ক, জগৎ-জীবন জলের দর্শন ও প্রাপ্তি বড়ই আয়াস সাধ্য, সময় সময় অপ্রাপ্যও; আহাৰ্য্যও শুষ্ক, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এতদৈলীয় লোকদের ইহার জন্য তেমন উৎকর্ষ বা অভাব বোধ নাই। স্বাস্থ্যও এদের সময় বাংলার অধিবাসীগণের চেয়ে কোন অংশে খারাপ জো নয়ই বরং অনেক ভাল এবং ইহারা অনেক কষ্ট লহিয়াও।

পূর্বে হইতেই আমাদের কর্মসূচী স্থিরীকৃত আছে। উত্তর গুজরাটের মেসানা প্রান্তস্থিত সিদ্ধপুর নামক শহরে প্রথমে পৌঁছিব। কয়েক বছর পূর্বে এখানে পর পর কয়েকটি জাতি দাঙ্গা হয় এবং বিধর্মী গুণ্ডাগা হিন্দুদের উপর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে, তখন ওখানকার স্থানীয় এক ভক্তলোক দুঃস্বপ্নার কথা জানাইয়া এবং সেখানে হিন্দুদের সংগঠিত করিবার প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করিয়া পূজ্যপাদ ক্রীমৎ অধৈতানন্দ স্বামীজীকে পত্র দেন, এবং তাঁর

আগমন একান্তভাবে অপরিহার্য বলিয়া পত্রে বার বার সে বিষয়ে অহরোধ করেন, এই উদ্দেশ্যে গুজরাট অঞ্চলে সজ্জের কাঁচাবলী বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর ওজস্বিনী বক্তৃতার বিষয় গুজরাটের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বহুবার পড়িয়াছিলেন।

একশ্রেণী রাজপুতনার ও বর্মোদার উত্তম মনসম অঞ্চল, খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র, ইত্যন্ততঃ দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি, যত্রতত্র নিশ্চল স্বেচ্ছাবিচরণশীল ময়ূর প্রভৃতি প্রকৃতিদেবীর বিচিত্র রূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে আমরা ৫ তারিখের বেলা প্রায় ১০।০টায় মেসানা পার হইয়া সিদ্ধপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পাটিল সকলে জিনিসপত্র লইয়া নামিয়া পড়িল, কেবল পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূজ্য স্বামীজী ও আমি এবং অন্তরা আমেদাবাদের দিকে চলিলাম। সেখানে আশ্রমে কিছু জটিল সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্তম্ভ কাজের পক্ষে সমস্তাগুলি যথেষ্টই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সমস্ত সমস্তার আশ্রম সমাধান এবং নূতন জমির জন্ত চূড়ান্ত চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমৎ স্বামীজী আমেদাবাদ রওনা হইলেন।

স্বরাট আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী মহাবাজ এবং ওখানকার অন্তর তিনচার জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীও একই সঙ্গে রওনা হইয়া আসিয়াছিলেন। যথা সময়ে আমরা সবলেই আমেদাবাদ আশ্রমে যাইয়া পৌঁছিলাম। পূজ্য স্বামীজীর উপস্থিতিতে স্বামী আত্মস্বরূপানন্দজী ও আমেদাবাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যোগীশ্বরানন্দজীর অক্লান্ত চেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই জমি দেখা এবং উহা ক্রয় করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লওয়া হইল, এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের আশীর্বাদে রামনবমীর পূণ্য তিথিতে নূতন জমি কেনাও হইয়া গেল। জমি বেশ স্ববিধায়ই পাওয়া গেল এবং জমির অবস্থানও সকলেরই মনঃপূত হইল।

আমেদাবাদ শহরে ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি এবং অন্তর কতক কারণে লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। শহরের বিস্তার না হইলে আর স্থান সঙ্কলন হইতেছে না। অত্যধিক ঘন বসতির ফলে লোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি তথা স্থানীয়

প্রশাসন এবং চিন্তাশীল জনসাধারণেরও উহা শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

তাই পুরাতন শহরের সংস্কার ও বৃদ্ধির জন্ত নূতন সব স্বীকৃত করা হইতেছে। শহরের সর্বাদীন উন্নতির জন্ত কতকগুলি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এক একটি কমিটি বা সোসাইটির অধীনে এক একটি এলাকা। সেখানে বসতি স্থাপনে জনগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার জন্ত তাহারা ক্রমাগত খবরের কাগজে রকমারি প্রচার কার্য্যচালাইতেছে। কল্যাণ নগর, মহাবীর নগর, বজ্রভনগর এমনি সব কলোনী গড়িয়া উঠিবে। ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরত্বের মধ্যেই এই কলোনীগুলির অবস্থান হইবে, এখানে জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকিবে, পাশে বাজার থাকিবে, যাতায়াতের বড় বড় রাস্তা থাকিবে। কলোনীগুলিতে বাস চলচলের ব্যবস্থা রাখা হইবে। আরও অন্তরস্ববিধা থাকিবে। মধ্যবিত্তদের জন্তই সাধারণতঃ এই বসতিগুলি হইবে। সোসাইটিগুলিই হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ব্যায়ামশালা স্থাপন করিয়া জনসাধারণে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর বিশেষ নজর রাখিবে। আর একটি বড় কথা হইল—এখানকার কলোনীবাসীদের জাতি দ্বাধার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে না। এই সব কলোনীর জমি দাঙ্গাকারী, উৎপীড়ন হিংস্রাশ্রয়ী, প্রমত্তবিষেবী বিধর্মীদের নিকট বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

আমাদের জমি কল্যাণ নগরেই লওয়া হইল। দুইটি বড়রাস্তার উপরে চারটি স্ববৃহৎ আত্মস্বরূপসহ ছয়টি সমতল Plot লইয়া প্রায় আড়াই বিঘা জমি। অদূর ভবিষ্যতে গুজরাট অঞ্চলে সজ্জের অন্ততম বৃহৎ কেন্দ্র তথা এতদঞ্চলের হিন্দুগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার শাস্তি-সাক্ষ্যনার আশ্রয় স্থল, এবং আরক্ষার দুর্ভেদ্য শক্তিমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর এখানেই স্থাপিত হইল।

এদিকে কিছু ইতিমধ্যে সিদ্ধপুরে প্রচারক পার্টির অদম্য চেষ্টায় “গঙ্গাবাড়ীর” বিরূপ চেষ্টায় হিন্দুধর্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিপুলভাবে প্রচার চলিতেছে, খ্রিষ্টিয়-এর সংবাদ লইয়া পূজ্য স্বামীজীর নিকট দূত আসিয়া হাডিয়। পূজ্যপদ শ্রীমৎ স্বামীজীর দর্শন এবং তার বীর্ষ্যবাণী

শ্রবণ করিবার অগ্র সিদ্ধপূরবাসী তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

তাই পূজ্য স্বামীজী আর দেরী করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে আশ্রমের সমস্তাবলীরও সমাধান হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে অধিসংক্রান্ত বাকী কর্তব্যচুকুর দায়িত্ব স্বামী আশ্রম প্রধানমন্ডজী মহারাজের নিকট দিয়া তিনি ১০ই এপ্রিল সিদ্ধপুর অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে আমার আরও দুই তিন জন মহিলাম।

কঠোপনিষদ্

ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

ন বিস্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্যামহে বিস্তমজ্ঞানং চেৎ স্বা।

জীবিত্যামো বাবদীশিত্যসি স্বং

বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব। (১।১।২৭)

অর্থ—মনুষ্যঃ বিস্তেন ন তর্পণীয়ঃ, স্বা চেৎ অজ্ঞানং বিস্তং লপ্যামহে। স্বং বাবৎ ঐশিত্যসি (তাবৎ) জীবিত্যামো :। বরণীয়ঃ বরস্ত মে স এব।

শব্দার্থ—মনুষ্যঃ (মানুষ) বিস্তেন (বিস্তের দ্বারা) ন তর্পণীয়ঃ (তৃপ্তিযোগ্য হতে পারে না, তৃপ্তি পেতে পারে না), স্বা চেৎ (তোমাকে যদি) অজ্ঞান (দেখলাম) (অর্থাৎ তোমাকে যখন দেখেছি) [তদা] (তখন) বিস্তং লপ্যামহে (বিস্তলাভ করব) অর্থাৎ দেবতাদর্শনের ফল স্বরূপ বিস্তলাভ অবশ্যই হবে।) স্বং (তুমি অর্থাৎ সমাজ) বাবৎ (যতদিন) ঐশিত্যসি (ঐশিত্যে পদের স্থানে ঐশিত্যসি (ঐশিত্যে পদের স্থানে ঐশিত্যসি প্রয়োগ হতেছে; প্রাকৃত করবে অর্থাৎ যম-পদে অধিষ্ঠিত থাকবে) [তাবৎ] (ততদিন) জীবিত্যামোঃ (বৈচে থাকব)। (স্বতঃপূজ্য-বিস্তদীর্ঘজীবন চাই না) বরণীয় (প্রার্থনীয়) বরস্ত (বরটি কিন্তু) মে (আমার) স এব (সেই একটিই অর্থাৎ আশ্রিতব্যই)।

অনুবাদ—মানুষ বিস্তের দ্বারা তৃপ্তি পেতে পারে না। আপনাকে যখন দর্শন করেছি তখন তো বিস্তলাভ হবেই।

আরও আপনি যতদিন যম-পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন (আপনার অগ্রহে) বৈচে থাকব। (স্বতঃপূজ্য-বিস্ত বা জীবন বিষয়ে কোনও প্রার্থনা করি না) আমার প্রার্থনীয় বর কিন্তু সেইটিই (আশ্রিতব্যই)।

শাক্তরত্নাঙ্ক—কক ম প্রাকৃতেন বিস্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। ন হি লোকে বিস্তলাভঃ কশ্চিৎকৃত্বিকরো দৃষ্টঃ যদি নামান্নাকং বিস্তত্বা ত্রাৎ লপ্যামহে প্রাপ্যামহে ইত্যেতদ্ বিস্তম্ অজ্ঞানং দৃষ্টবস্তো বয়ং চেৎ স্বা স্বাম্ জীবিত্যসি তথৈব, জীবিত্যামো বাবদ্ বাম্যো পদে স্বম্ ঐশিত্যসি ঐশিত্যে প্রভুঃ শ্রাঃ। কথং হি মর্ত্যঃ স্বয়ং সমেত্যাপ্নয়নাযুক্তবৎ। বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব বদাত্মা বিজ্ঞানম্।

ভাঃপর্য—বহু বিস্তের প্রলোভন দেখিয়েও নচিকেতাকে যমরাজ টলাতে পারেননি। নচিকেতা তাঁর লক্ষ্য স্থির থেকে ব'লে চলেছেন যে, তৃতীয় বরে যা প্রার্থনা জানানো হয়েছে তাঁর থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না অর্থাৎ তাঁকে যদি বর দিতেই হয় তবে ঐ একটি মাত্র প্রার্থনাকে পূরণ করতে হবে। যমরাজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অথচ তৃতীয় বরের দ্বারা প্রার্থিত আশ্রিতব্য তিনি নচিকেতাকে উপদেশ দিচ্ছেন না। এই মধ্যে নচিকেতা তাঁর চিস্তের দৃঢ়তা প্রদর্শন করছেন এবং কেন যে অগ্র প্রলোভনে আকৃষ্ট হচ্ছেন না তাও মুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে বলছেন।

পূর্বমুখে নটিকেতা ইন্দিয়াজ্ঞা ভোগের অকিঞ্চিৎকর দেখিয়েছেন। এখানে বলছেন যে, বিস্তৃত ও দীর্ঘজীবনের আশায় একটি মহামূল্য তত্ত্ব জানার সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না। মানুষের জীবনে বিস্তৃত বা ধনের আবশ্যকতা আছে সত্য কিন্তু বিস্তৃতলাভের দ্বারা মানুষের মনে কখনই সন্তুষ্টি জন্মায় না। এই অপরিতোষ বা অতৃপ্তির ছাঁট তেতু আছে। প্রথমতঃ, বিস্তার পরিমাণে কখনই সন্তোষ আসে না। ক্রমশঃ স্বাধিকারিক বিস্তার জন্ম কামনা দেবা যায়। এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

ইচ্ছন্তি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষমীহতে।

লক্ষাধিপন্তথা রাজ্যং রাজ্যশ্চঃ স্পর্শমীহতে।

অর্থাৎ বার শত মূহুর্ত আছে সে সহস্র চার, বার সহস্র আছে সে লক্ষ চার, লক্ষাধিপতি রাজ্য চার এবং রাজ্যশ্চ ব্যক্তি স্পর্শ কামনা করে।

বিস্তৃতিবিষয়ে অপরিতোষের আরও একটি হেতু হল এই যে, বিস্তৃত সকল স্তরেই আমাদেরকে দুঃখ দিয়ে যায়। তত্ত্বদর্শীরা বলেন যে, বিস্তৃত অর্জনে দুঃখ লভ্য করতে হয়; অর্থ অর্জন কবলেই হয় না কিন্তু তাকে রক্ষা করাও দুঃখজনক। আর অর্থ নাশ হলে যে দুঃখ হয়, এ কথা সকলেরই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক পণ্ডিত দমোদরে প্রণীত আছে—

অর্থানামর্জনে দুঃখমজিতানাম্ চ রক্ষণে।

আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং কথমর্থঃ স্থখাবহঃ ॥

ভাব্যপাদ শ্রীধরচাৰ্য তাঁর “দ্বাদশপঞ্জরিকা” নামক স্তোত্রটিতে আরও বিশদভাবে বলেছেন যে, অর্থকে অনর্থ ব’লেই ভাবতে হবে, অর্থের দ্বারা বিস্মৃত্য সুখ হতে পারে না। এ কথা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ যে, দীন ব্যক্তির পুত্র থেকেও ভয় জন্মায়। শ্লোকটি উদ্ধৃত হচ্ছে —

অর্থধনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্।

পুত্রাদপি ধনভাজঃ ভীতিঃ সর্বত্রৈবা বিহিতা নীতিঃ ॥

(দ্বাদশপঞ্জরিকা ২)

নটিকেতা বলতে চান যে, বিস্তার দ্বারা তাঁকে প্রলুপ্ত করে তাঁর অতীত বস্তু থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে না। আর যদি বিস্তৃত স্থখদায়ক হ’ত তাহলে তাতে আকৃষ্ট

হওয়ার কিছু যুক্তি থাকত। আর ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্ত যদি অর্থের কিছু প্রয়োজন ঘটেই তবে তা তো পাওয়া যাবেই কারণ সমরাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে যে পুণ্য অর্জিত হ’ল তা বুঝা যেতে পারে না। দেবতাদর্শন সর্বদা ইচ্ছাগতের ও পরলোকের শুভ ফল জন্মায়, একথা প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং সমরাজ্যের দর্শনের ফলেই সেই প্রয়োজনীয় অর্থ অবশ্যই আসবে, নটিকেতাকে দারিত্র্যের দুঃখে কখনই পতিত হতে হবে না।

সমরাজ্যের দর্শনলাভের ফলে কেবল যে ধনপ্রাপ্তি হবে তা নয় কিন্তু আরু লাভও হবে। নটিকেতা বলছেন যে, সমরাজ্যই মৃত্যুর অধীশ্বর। তিনি অলুগ্রহ করলে দীর্ঘজীবন তো অনায়াসলভ্য। সুতরাং যতদিন সমরাজ্যের স্বীয় পক্ষে জয়মৃত্যুর নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন সমরাজ্যই অলুগ্রহে নটিকেতা অবশ্যই জীবিত থাকবেন। সমরাজ্যের ফলস্বরূপেই বা অনায়াসে পাওয়া যাবে তা পাওয়ার জন্ত আবার নটিকেতা তৃতীয় বরের দ্বারা সমরাজ্যের কাছে প্রার্থনা করবেন কেন? এইভাবে নটিকেতা সমরাজ্যের প্রলোভনকে অতিক্রম করে নিজের প্রতিজ্ঞার অবিচলিত থেকে বললেন—আমি অস্ত্র কিছুই চাই না, বা চেয়েছি তা এই তৃতীয় বরেই আমি পেতে চাই।

এই মন্ত্রে ‘লগ্ন্যমহে’, ‘অজান্দ’, ‘জীবিত্যামঃ’ পদগুলি উত্তমপুরুষ বহুবচনের প্রয়োগ, অর্থাৎ এই মন্ত্রেই ‘মে’ পদটি একবচনের প্রয়োগ। এই আপাতবিষোধের সমাধান এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। নটিকেতা যখন ঐ বর চাড়া অস্ত্র কিছু চান না ব’লে নিজের অভিমত প্রকাশ করছেন তখন ‘মে’ এই একবচনের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যখন প্রথম তিনটি পাদে বহুবচনের প্রয়োগ করেছেন তখন তিনি তাঁর নিজের একক মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। সেখানে বক্তব্য যে, আমার মতো অস্ত্র অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যিনিই বিস্তৃত অর্জন করেন (লগ্ন্যমহে), যিনি দেবতাদর্শনকে

(১) এখানে রজস্বামীজ্ঞা বলেছেন যে, সমরাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ায় ফলে বহু দীর্ঘকালব্যাপী জীবন যখন হবেই তখন নটিকেতা আর অকারণেই চাইবেন কেন

লাভ করেন (অজ্ঞান) তিনিই বিত্ত অর্জন করেন (লেন্সামহে), যিনি দেবতাপূর্ণ করেন তিনিই দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন (জীবিত্যামঃ)। সুতরাং এই বহুবচনগুলি কেবল 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত নয় কিন্তু 'আমি ও আমার মতো' অস্ত্র সকলে বা 'আমরা' অর্থে ব্যবহৃত।

অজীর্ণতামমৃতানামুপেত্য

জীর্ন মর্ত্যঃ কথং প্রজানন্।

অভিধ্যান বর্ণরতিপ্রমোদান্।

অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রম্যতঃ। (১।১।২৮)

অর্থঃ—কু-অর্থঃ স্বঃ জীর্ন মর্ত্যঃ কঃ অজীর্ণতাম্ অমৃতানাম্ (সকাশে) উপেত্য প্রজানন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ অভিধ্যান্ অতিদীর্ঘে জীবিতে রম্যতঃ।

শব্দার্থ—কু-অর্থঃ স্বঃ (কু অর্থাৎ পৃথিবী; অর্থঃ অর্থাৎ নীচে; স্ব অর্থাৎ দ্বিত; অস্ত্রিক-বর্ণ প্রভৃতি লোকের থেকে নাচে অবস্থিত পৃথিবীতে স্থিত। এই সমাসবদ্ধ পদের সমলার্থ-জুতলস্থিত বা জুলোকস্থিত) জীর্ন (জরায়ুক্ত, ডাবাৰ্ধ—জরারোগাদি দুঃখগ্রস্ত) মর্ত্যঃ (মরণশীল) কঃ (কে, কোন মানুষ) অজীর্ণতাম্ (জরারহিত) অমৃতানাম্ (মরণরহিতগণের অর্থাৎ মরণরহিত দেবগণের) [সকাশম্] (নিকটে) উপেত্য (উপস্থিত হয়ে) প্রজানন্ (ভালভাবে জেনে; নিজের অভিলষিত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যেতে পারে জেনে) বর্ণরতিপ্রমোদান্ (গান, কীড়া ও তজ্জনিত আনন্দের বর্ণন) অভিধ্যান্ (ভালভাবে চিন্তা করে অর্থাৎ অসারতা বুঝে) অতিদীর্ঘে জীবিতে (অতি দীর্ঘ জীবনে) রম্যতঃ (আনন্দ পেতে পারে) অর্থাৎ কেউ আনন্দ পেতে পারেন না।

অনুবাদ—জুলোকস্থিত জরায়রণশীল কোন মানুষ জরায়রণরহিত দেবগণের নিকটে উপস্থিত হয়ে (দেবসমীপে উপস্থিত হওয়ার শুভকর) ভালভাবে জেনে গীতকীড়াদি-জনিত আনন্দে (অস্থিরতা) নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করে অতিদীর্ঘ জীবনের সুখ অন্বেষণ করে।

শাক্তরভাষ্য—বত্চ অজীর্ণতাম্ বয়োহানিমগ্রাদ্ভবতাম্ অমৃতানাম্ সকাশম্ উপেত্য উপসম্যাস্তম উৎকৃষ্ট প্রমো-

জনাস্তমঃ প্রাপ্তব্যং তেভ্যঃ প্রজ্ঞানম্ উপলভ্যমানং স্বয়ং তু জীর্ন মর্ত্য জরায়রণবান কথং স্বঃ কুঃ পৃথিবী অধশাস্ত্রিকাদি-লোকোপেক্ষ্য তস্তাং তিষ্ঠতীতি কথং স্বঃ সন কথমববেকিভিঃ প্রার্থনীয়ঃ পুত্রবিত্তহিরণ্যদ্বাদিহিং বুনীতে। কতদাহ ইতি বা পাঠং স্বয়ং স্বশ্রিত পক্ষে চাক্ষয়-যোজন্য—তেষু পৃথিব্যাদিহিং আত্মা আস্থিতিত্তাৎপর্বেণ বর্তনং যন্ত সত্যদাহততোহধিকতর পুরুষার্থং হুপ্রাপমপি প্রাপিপরিমুঃ কতদাহো ভবেৎ, ন কচ্চিত্তদাহারজন্তদর্শী স্তাদিত্যর্থঃ। সর্বো হ্যুপমুপর্বেণ বৃত্ত্যতি লোকস্তম্য পুত্রবিত্তাদি লোভৈঃ প্রলোভ্যোহহম্। কল্পাপঃ প্রমুখান বর্ণরতিপ্রমোদান অবস্থিতরূপতয়া অভিধ্যান নিরূপয়ন যথাবদতিদীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রম্যতঃ।

[পরবর্তী সংখ্যায় 'তাৎপৰ্য্য' থাকবে]

বরলাভালাভযোরপি ভাবদেব জীবনমিতি ভাবঃ। (রঙ্গরামা-ভুক্তভাষ্য, ১।১।২৭)। এখানে অতি দীর্ঘ জীবন বলতে সর্বাধিক কত বৎসরের জীবন অভিপ্রেত হতে পারে। এ নিয়ে কোনও কোনও আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তা কিছু অভিনব মন্তব্য করেছেন। এতাদৃশ ব্যাখ্যাতা বলতে চান যে, যম চাইলে মানুষ বড় জোর পূর্ণ আয়ু অর্থাৎ প্রায় একশ বৎসর বাঁচতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পূর্ণ আয়ুর অধিককাল বাঁচা নটিকেভার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা স্বয়ং কয়তে পারি যে, ১।১।২৩ মূর্ত্তে যমরাজ নিজেই বলেছেন—“স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদ্বিচ্ছসি” অর্থাৎ যত বৎসর চাও বেঁচে থাক। মানুষ কি আর একশো দেড়শো বছর পরে মরতে চায়? সুতরাং এই ভাবে পূর্ণ আয়ু বলে আয়ুকে সীমিত করার কোন সার্থকতা নেই। আরও কথা, জীবিত্যামো যাবদ্বিচ্ছসি ইম্ (১।১।২৭) অংশের ব্যাখ্যায় শঙ্করচার্য স্পষ্টই বলেছেন যে, যমরাজ যতদিন এই পদে সমাসীন থাকবেন ততদিন আমরা (অর্থাৎ আমি) বাঁচব। অপর ভাষ্যকার রঙ্গরামাভুক্ত এই কথা ভো বলেছেন উপরন্তু বলেছেন যে, যম ছাড়া আর কেউ আমাদের জীবনের অস্ত্র ঘটতে পারে না। তাই যম চাইলেন তাঁর যমপদে বহাল থাকা পর্যন্তই বাঁচা সম্ভব। রঙ্গরামাভুক্তের পদ্ধতি—যাবৎকালং যাম্যে পদে সমাসীনতয়া বর্তসে তাবৎপর্ষন্ত মম্বাকমপি জীবনং সিদ্ধম্বেব। ন হি বহাভ্যন্তিলম্বনেনা-নজীবিতাস্তকরঃ কচ্চিত্তি।” অস্ত্র ব্যাখ্যাকারগণও এই ভাবেই অর্থ করেছেন। সুতরাং আধুনিক ব্যাখ্যাতার পূর্বোক্ত মতগ্রাহ্য হতে পারে না।

গঙ্গাসাগর

শ্রীমতী পারিজাত আয়কত

“সব তীর্থ বার বার

গঙ্গাসাগর একবার।”

কিছুদিন আগেও মানুষ এই কথাই বিশ্বাস করত। অগস্ত্য যাত্রার মত সংসারের মায়া ত্যাগ করেই মানুষ এই তীর্থে যেত। ফিরে আসতে পারলে সকলে আশ্চর্য হত। কিন্তু আজ এ ধারণা যে কতখানি ভ্রান্ত তা এই মহাতীর্থে না এলে বিশ্বাস করা যায় না।

পৌষমাসের মকর সংক্রান্তিতে বঙ্গোপসাগরের কূলে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে কুস্তমেলার মত বিরাট মেলা হয়। এই সময়ে প্রতিবছর এই মহাতীর্থে ৪।৫ লক্ষ যাত্রী ভারতের নানা স্থান থেকে আসেন।

এই মহাতীর্থে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ছিল কপিল মুনির আশ্রম। ভগীরথ সগররাজার ৬০ হাজার পুত্রের মুক্তির জ্ঞেয় গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে এই আশ্রমে এনেছিলেন। পুরাণের কথায় কপিলমুনি, গঙ্গা, ভগীরথ এখানে প্রধান আর সৌন্দর্যের বিচারে গঙ্গা, সমুদ্র ও সাগররূপী।

গঙ্গা ইহকালের তীর্থ, পরকালের বৈকুণ্ঠ। গঙ্গা কলিকালের মুখ্যতীর্থ তাই গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

পৌষমাসের মকর সংক্রান্তির দিনের ব্রাহ্মমূর্ত্তে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান ফল অবর্ণণীয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী—নাথ, সন্ন্যাসী, ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে একই সঙ্গে পুণ্যস্নান করছেন। সেই ব্রাহ্মমূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী কামরূপকী শঙ্খধ্বনি সহযোগে নামসংকীর্তন করতে করতে চলেছেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, সে নামকীর্তন শুনে মনে পড়েছে বিষ্ণু বিটঠল এর নামকীর্তনের কথা—

“নাম করো জীব নিত্য হরিনাম

সর্ব পুণ্য আছে হরিনামে

গান করো জীব হরি গুণগান

পূর্ণ মুক্তি পাবে হরিনামে।”

কার নাম করবে? কে তিনি, হরি? সৃষ্টির আদিতে যিনি নারায়ণ, ত্রেতার যিনি রাম, দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ কলিতেই তিনি হরি, তাঁর নামতরঙ্গী সঞ্চল করে কলির জীব ভবতরঙ্গ উত্তরণ করবে। সেই নাম তরঙ্গী সঞ্চল করে এই মহাপুণ্য দিনে মহাতীর্থে ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নিবিশেষে চলেছে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুণ্য অর্জনের মানসে।

সেদিনের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে মিলনের জন্তই তো মেলা। জাতিধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা-অবস্থা আর আভিজাত্য নিবিশেষে যে মিলন তাইতো মেলা, সেখানে শুধুই মেলামেশা। এই মহামিলনের জন্তই সেই হৃদয় অতীতে সূচনা হয়েছে সাগর মেলার। আজও চলেছে— অনাগত দিনেও চলবে আবাহমানকাল ধরে।

মকরসংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে পতিতোদ্ধারিণী সগর সন্তানদের উদ্ধার করেছিলেন, এই তীর্থ—মুক্তিতীর্থ।

এখানে কপিলমুনির কপিলমুনির মূর্ত্তির বামহস্তে আছে কমণ্ডলু, ডান হস্তে আছে জপ-মালা। আর দুটি মূর্ত্তির একটি হ'ল মকরবাহিনী চতুর্ভূজা গঙ্গার কোলে ভগীরথ, তৃতীয় মূর্ত্তিটি সগর রাজার। এটিই গর্ত্তমন্দির, কপিলমুনির মত সগর রাজাও যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। সগর রাজার বামদিকে আছে যজ্ঞের অশ্ব ও ইন্দ্রমূর্ত্তি, আর আছে সিংহচর্চিত বিশালাক্ষী মূর্ত্তি—সিংহবাহিনী অষ্টভূজা।

কপিলমুনি এই নির্জন সাগর রূপের দক্ষিণ প্রান্তে বসে জীবের হুঃখমোচনের কথা ভেবেছিলেন। সেই চিন্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্তই তিনি সগররাজার পুত্রদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন। ভয় হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। কপিলমুনি তাঁর ধ্যানে হুঃখমোচনের যে পথ খুঁজে পান তার নাম তত্ত্বসমাস। এই দর্শনের নামই সাধ্য্য দর্শন—ষড়দর্শনের অন্তর্গত এই সাধ্য্য দর্শন কপিল মুনিরই তপস্তার ফল।

এই পরমতীর্থে এসে উপলব্ধি করতে পেরেছি কত নগর
কত জনপদ থেকে এই সাগরে এসেছেন মানুষ প্রচণ্ড
ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে, তাদের ভাষা ভিন্ন, শিল্পা-দীক্ষা ভিন্ন,
ভিন্ন তাঁদের পেশা, ভিন্ন তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতি, তবু তাঁরা
আজ এক—তাঁদের লক্ষ্য এক—তাঁরা সবাই চলেছেন
গঙ্গাসাগরের মহামিলন ক্ষুদ্রিতে—যুগযুগান্তরের পরমতীর্থে।
আজকের দিনে এখানে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, রাজা-সকিরে
কোন প্রভেদ নেই—আজ এখানে সবাই সমান।

নিজের সত্তা এখানে এসে আমি ভুলে গেছি। সমস্ত
জঘন-মন প্রাবৃত এক একটি কথাই আমার বার বার মনে
হয়েছে এই মহাতীর্থে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থীদের একজন আমি।
স্বাভাব-বুদ্ধ-বণিতা দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে, অফুরন্ত
জীবনী শক্তি নিধে এগিয়ে চলেছে সাগর-সঙ্কম্বে, লক্ষ্য তাদের
সকলের এক—পুণ্য স্থানের উদ্দেশ্য। এই অফুরন্ত জীবনী
শক্তি কোথা থেকে আসে?—একেই কি বলে স্থান-
মাহাত্ম্য?

মনে মনে ভাবি কী অপরূপ এই তীর্থযাত্রা, আজ এই
ক্ষুদ্র দেহরথে অদৃষ্ট কাকে যেন সযতনে বসিয়ে নিয়ে
চলেছি, পরম আনন্দে উদ্ভাসিত সমস্ত অন্তর। মনে হয়েছে
এখানে এসে মানুষ পায় অশান্ত-বিক্ষুব্ধ অন্তরের সাধনা।

চরম জিজ্ঞাসার পরম উত্তর, অন্তরের চির প্রশান্তি, হৃদয়ের
শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। মানুষ এখানে এসে ভুলে যায় তার অহং
চেতনা—শূন্য বুলি তার ভয়ে ওঠে চরমসিক্তি, পরমশান্তি
পরম পাথের, পরম আনন্দের ও পরমজ্ঞানে।

মন তাই বলে ওঠে—

“আমার পরাণ কোথা যায় উড়ে
কে যেন ডাকিছে মোরে দূর সাগরপারে
বিরহ বিধূর হয়ে

হে অধীর হে উদাসী

হে মন অন্তরবাসী

কাহার ওনিলে বাণী

কোন সে প্রেমের সুরে।’

(অতুল প্রসাদ সেন)

মনে হয়েছে প্রকৃতির সব বিচিত্র দানই ভগবানের
স্বরূপ। মন বলেছে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাওতো
তীর্থে এসো। নিজেকে খুঁজে পেতে চাওতো তীর্থে এসো।

গঙ্গাসাগরের মকরসংক্রান্তির মেলা লক্ষ লক্ষ মানুষের
মহামিলন ক্ষেত্র। মনে হয়েছে লীলাময়ের এও এক অপরূপ
লীলাখেলা।—এই হল মুক্তি-তীর্থ পরম পুণ্যময় স্থান।

জননী জন্মভূমি

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

জননী-জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরিয়সী।

তাহাদের কোলে জন্মমৃত্যু, তাহাদের কোলে উঠিবসি।

একজন তার কোল থেকে পেড়ে,

আর একজনের বুকে দিলে ছেড়ে;

চেনায়ে দিল সে তাহার আকাশে গ্রহতারা বরি শশী ॥

সেই সে জননী বৃক্ষ তুলে নিল, বৃক্ষ-ভরা ধূলা-মাটি,

সারাটি জীবন সেই ধূলা-মাটি ক’রে যাই ঘাঁটাঘাঁটি

ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি,

যা কিছু পেয়েছি সব যে তাহারি;

তাই তার টানে স্বর্গ ছাড়িয়া তার বুকে পড়ি খসি ॥

দেবী সরস্বতী

জীদীপেন রাহা

শ্রীপঞ্চমীর মহাপুণ্যতিথি বাণী বন্দনার শুভ দিন।

বায়ুপুষ্ণাণ মতে দেবী সরস্বতী হচ্ছেন প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসকন্যা। কল্পান্তে সমুদয় জগৎ রক্ত কর্তৃক সংহত হলে পুনর্বার প্রজা সৃষ্টির জন্ত ধ্যানমগ্ন হন। সেই অবস্থায় তিনি মহানাদশালিনী দেবী সরস্বতীকে আশ্রয় করে নতুন প্রজা সৃষ্টির সূচনা করেন। ব্রহ্মার সন্ত গুণ থেকে জ্ঞানময় ভাব উদ্ভূত এবং সেই সত্তা হচ্ছে সরস্বতী অর্থাৎ ব্রহ্মার জ্ঞান-শক্তির অস্তিত্বব্যক্তিদেই সরস্বতী।

ঋষেদেবর মতে ভুলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষ থেকে হিরণ্য হ্রাতির ইন্দ্র এবং স্বর্গলোকে সূর্য্য, এই তিনের বে জ্যোতি-রাশি তা দেবী সরস্বতীর জ্যোতিঃ।

সরস্বতীর অর্থ জ্যোতিঃ। আলোকময়ী বলেই তিনি সর্বাঙ্গীণ শুভা। জ্ঞানময়ী ও চিত্তময়ীরূপে সর্বত্র বিরাজমানা। তাঁর জ্যোতিঃধারা শুধু জিলোকে নয়, উর্ধ্বে সপ্তলোক ও নিম্নে সপ্তলোক; চতুর্দশ স্তরে সেই জ্যোতিঃমণ্ডিয়া নিত্য প্রকাশিত। এই জ্যোতির জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান প্রণব। তিনি সকল সূক্ষ্ম নাদের উৎস, নিত্য নাদময়ী, তাই নদীতমা। নদী শুধু জলের আধার নয়, নাদের উৎস।

দেবীর শ্বেতবর্ণ অবয়ব সন্তগুণের প্রতীক। তাঁর বসন শুভ্র, বাহন শুভ্র হংস, গতি শুভ্র আলোকময়। কোটি ইন্দু হতেও দেবী দীপ্তিযুগী।

কথিত আছে ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে সৃষ্টি করে নির্দেশ দেন, তুমি কবিগণের বদনে অবস্থান কর।

সরস্বতী বলেন, আমি একা বহুজনের কণ্ঠে ও হৃদয় কী করে অবস্থান করবো?

উত্তরে ব্রহ্মা বলেন, ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন কর। তোমার প্রেরণায় তিনিই জগতে

মহাকবি বলে খ্যাত হবেন। তাঁকে অমুসরণ করে নব নব কবির আবির্ভাব হবে।

দেবী ভ্রমণকালে, ত্রেতাযুগের আদ্বিতে তমসা নদীর তীরে মহাতপস্বী বায়ীকির সাক্ষাৎ পান। মুনির কণ্ঠে তিনি আশ্রয় নেন। মুনিবর তখন ব্যাধবিশ্ব ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে মুহুমান। তাঁর মনে পক্ষী যুগলের প্রতি সংবেদনা জাগে। তাঁর এই শোকাবস্থায় এক শ্লোকের জন্ম হয়—

“মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাং ভ্রমণমঃ শান্তী সমাঃ।

যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাংদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

সেই থেকে মহামুনি বায়ীকি আদি কবি বলে খ্যাত।

সত্যকার শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও প্রতিষ্ঠাকেই প্রকৃত বাণীবন্দনা বলে। শুধু আত্মকল্যাণের জন্ত বিদ্বার্জন নয়। বৈদিক সামগায়কের প্রতীক বীণাপানি দেবীর করকমলে, তাই তিনি হসেন বীণাপানি।

বেদ বেদান্ত আশ্রয় পূর্বক বৈদিক যুগে বায়ী সাধন হ'ত। সেই ভাবসম্মত দেবী সরস্বতী হলেন পুস্তককত্রী হস্তে তাঁর গ্রন্থসহায়ক লেখনী।

ভক্তগণ দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান—

“ও অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

মৃত্যোর্গা অমৃতং গময়। আবিরাবির্গা এধি। বৃহদারণ্যক ১।

হে বিদ্যাধাশিনি জগদম্মে তুমি আমাদেরকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাবে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির রাজ্যে, মৃত্যুলোক থেকে অমৃতত্বে। হে মাতঃ! সর্বগতি ও সর্ব-প্রকার গুণ, জ্ঞান ও মহত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূতা হয়ে জগতের, কল্যাণ কর।

বা দেবী সর্ব ভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ।

মহা বাণী

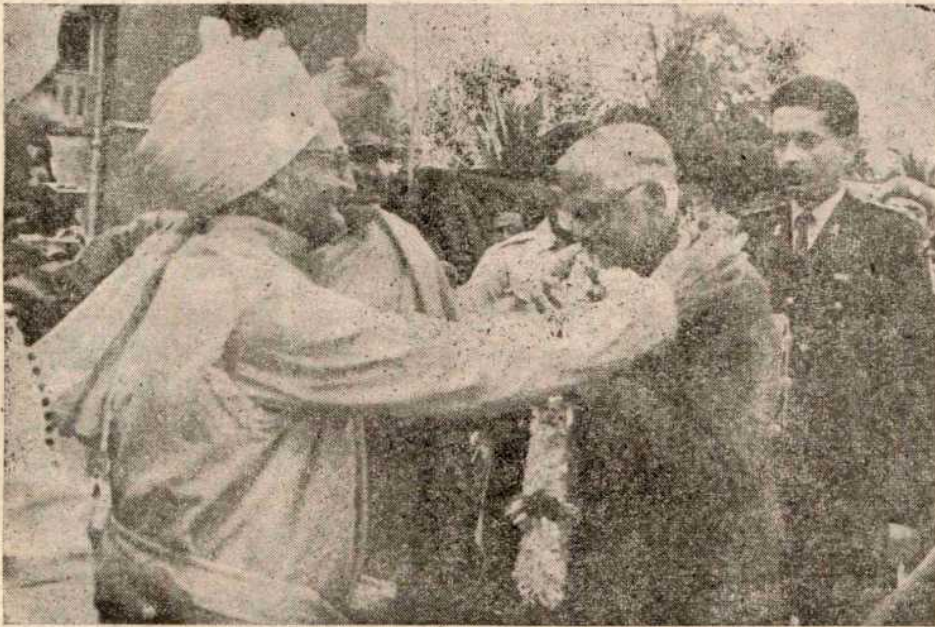
সংঘের গঙ্গাসাগর শাখা পরিদর্শনে ভারতের রাষ্ট্রপতি

দেশে ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণ অপরিহার্য : রাষ্ট্রপতি

“স্বাধীনতার পর দেশ শিল্পে উন্নত ও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভূত হয়েছে। কিন্তু চরম অবক্ষয় নেমে এসেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। ধর্মীয় জগৎও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাই পরমত সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয়ের প্রাচীন ভারতীয় আদর্শগুলিকে ভুলে ধর্মের নামে অশান্তি মাথা চাড়া নিয়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র নানা ধরনের

সংঘাত পশ্চিমী ভোগবাদের অনুকরণ ভুলে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকে গ্রহণ করেই এর থেকে মুক্তি সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা এমন ভোগবাদী হয়েছি যে বাথরুমেও টি ভি দরকার হয়।

“আজ দেশের সর্বত্র ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণ অপরিহার্য।” ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে রাষ্ট্রপতি শ্রী আর. ভেঙ্কট রমন ভারত সেবাশ্রম সংঘের গঙ্গাসাগর



রাষ্ট্রপতি শ্রী আর. ভেঙ্কট রমন সংঘের গঙ্গাসাগর সেবাশ্রম পরিদর্শনে এলে দ্বারপ্রান্তে তাঁকে মাল্যভূষিত করে স্বাগত জানাচ্ছেন আশ্রম-প্রধান স্বামী হংসেশ্বরানন্দজী। (৩১/১২/৯১)

শাখার এক অহুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেছেন।

স্বন্দরবনে কয়েকটি অহুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি সাগর দ্বীপে কপিলমুনির মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি কপিল মুনির মন্দিরে পূজা দেন এবং সজ্জের গঙ্গাসাগর সেবাশ্রমে এসে আশ্রমের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিভাগগুলি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সজ্জ-মন্দিরে পূজা ও প্রণামী দেন। স্বামী বিজ্ঞানন্দজী রাষ্ট্রপতিকে সন্মিলন জ্ঞাপন করেন। সজ্জের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে একটি শাল, কিছু সজ্জ প্রকাশনীর পুস্তক ও সজ্জবাণী এবং তদীয় সহধর্মিণীকে একখানি বালুচরী শাড়ী উপহার দেওয়া হয়।

গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য

১৯২২ সালে অহুষ্ঠিত গঙ্গাসাগর মেলায় এবারও সজ্জের সেবাব্যবস্থা হয়। মেলাক্ষেত্র, চেমাগুড়ি, কচুবেড়িয়া ও নামখানায় মোট ৪টি সেবাকেন্দ্রে খোলা হয়। তীর্থযাত্রীদের সর্বপ্রকার সেবাকার্যে এক হাজারের মত স্বেচ্ছাসেবক সজ্জ-সন্ন্যাসিগণের নেতৃত্বে গত ২ই জামুয়ারী থেকে ১৬ই জামুয়ারী পর্যন্ত দিব্যাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বাস, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতিতে যাত্রীদের উঠানামা, ভিড়নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, যাত্রীদের মধ্যে ঋাত্ত বিতরণ, দূরগত যাত্রীদের আশ্রমের যাত্রী-নিবাসে আশ্রয় দান, মৃতদেহের সংকার প্রভৃতি সেবাকার্য করা হয়। স্থানীয় মেলাকর্তৃক সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন।

মেলাক্ষেত্রে সজ্জের ভাবধারা প্রচারের জন্য ধর্ম-সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান হয়। এই সময় দুঃস্থ গ্রামবাসী ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কাপড় ও কখল বিতরিত হয়।

সজ্জের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে সেবাকার্য হস্তরূপে সম্পন্ন হয়।

নামখানায় অনুষ্ঠান

নামখানা সেবাকেন্দ্রে বঙ্গের দিন ১৬ই জামুয়ারী তারিখে একটি সংক্ষিপ্ত অহুষ্ঠানে সজ্জের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ গঙ্গাসাগর মেলায় সাহায্য ও তীর্থ-যাত্রীদের বর্ধব্য বিষয়ে ভাষণ দেন। বৈদিক যজ্ঞ

পৌরোহিত্য করেন সেবাকেন্দ্রের সঞ্চালক স্বামী বিশ্বানন্দজী। অক্লান্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে ছিলেন শিক্ষক শ্রীনলিনীকান্ত দাস। শেষে দুঃস্থ গ্রামবাসীকে মধ্যে একশত কাপড় ও কখল বিতরিত হয়।

ত্রিশূল উৎসব

সিদ্ধপীঠ বাজিতপুর (অধুনা বাংলাদেশ) ও কলিকাতা প্রধান কার্যালয়ে গত ১২শে জামুয়ারী সজ্জগীতা পাঠ, ভজন-কীর্তন, শ্রীগুরুপূজা, ত্রিশূল অভিষেক, আরাগিক প্রভৃতি অহুষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিশূল উৎসব পালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ে অপরাহ্নে এক ভাবগভীর পরিবেশে সজ্জ-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সহস্রাধিক ভক্তের সমাবেশে প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ ত্রিশূল উৎসবের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বিষয়ে আলোচনা করেন। পূজ্য সজ্জ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ সজ্জ-ভবনে উপস্থিত থেকে সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

এছাড়া সজ্জের বিভিন্ন শাখায় এবং হিন্দু মিলন-মন্দির-গুলিতেও এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় অহুষ্ঠিত হয়েছে।

জামসেদপুর সেবাশ্রমে ত্রিশূল উৎসব ও গুণীজন-সম্মিলন

৪২ তম ত্রিশূল উৎসব গত ১২ থেকে ২৬ জামুয়ারী আট দিনব্যাপী নানা বর্ণাচর্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ঠান্ডা অহুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল ভজন-কীর্তন, রামায়ণ গান, ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান ও প্রতিযোগীদের পুস্তক প্রদান, ধর্মীয় শোভা-যাত্রা, গুণীজন সম্মিলন, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন, বৈদিক যজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ, ত্রিশূল অভিষেক, গুরুপূজা, ছোঁনৃত্য, বস্ত্রদান প্রভৃতি।

এক বিশেষ অহুষ্ঠানে ২৬ জামুয়ারী সংস্কৃত ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষাবিদ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে “মানব-বৃত্ত” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সম্মিলন সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে সজ্জের দিল্লী শাখার প্রধান স্বামী বিজ্ঞানন্দজী

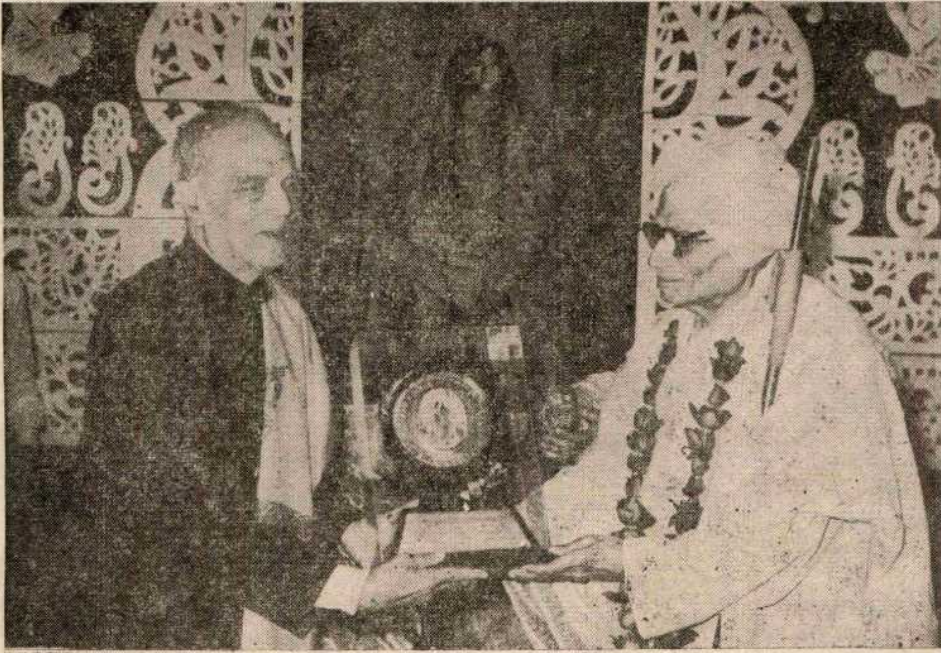
শিক্ষাজগতে ডঃ শাস্ত্রীর ছয় দশক ব্যাপী বিশিষ্ট অবদান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সজ্জের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ে সপ্রশংস উল্লেখ করেন। তাঁর হাতে একটি স্ততিপত্র এবং নগদ দশ হাজার টাকা প্রদান করেন ভারত সেবাশ্রম সজ্জের পূজ্য সভাপতির পক্ষে প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ।

অগ্রাণ্ড যে সব গুণীজনকে সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাঁদের মধ্যে আছেন—প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ টাটা ফুটবল একাডেমির ডিরেক্টর শ্রীপ্রদীপ কুমার ব্যানার্জী, জামসেদপুর স্টেডিয়াম সোসাইটির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সেবাব্রতী শ্রী এন এন মিত্র, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী শ্রীশান্তিলাল জে গান্ধী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ডঃ নি ভাস্কর রাও, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ শ্রীদেবেন দেব।

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও অগ্রাণ্ড অহুষ্ঠানের ভাষণে

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন—প্রবীণ শিক্ষাবিদ ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবশ চক্রবর্তী, রামায়ণ গীতিকারদ্বয় শ্রীবিশিষ্ট নারায়ণ তিওয়ারী ও সম্প্রদায় এবং শ্রীহৃতাচ চক্রবর্তী, সঙ্গীতকার শ্রীরাধকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী হুচিলা মিত্র, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ কাক্সিলাল, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আচার্য প্রভাকর মিত্র, টিঙ্কোর শ্রীঅশোক মাস্ট্র, স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী হিরণ্যমানন্দজী, সিংহুর ডেপুটি কমিশনার শ্রীগোবিন্দ লাল যাদব আই এ এস, পারচেট ইলেকট্রিক এর শ্রীহজিত বোস, উবা এ লয় এর শ্রী ও পি কপিলা, সাংসদ শ্রীশৈলেন্দ্র মাহাতো, টাটা ওয়ার্কস ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী ডি জি গোপাল, স্বামী শান্তানন্দজী প্রমুখ।

বিভিন্ন বক্তা ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে



জামসেদপুর সেবাশ্রমে অহুষ্ঠিত গুণীজন-সম্বন্ধনা সভায় ডঃ গোবীনাথ শাস্ত্রীকে 'মানব রত্ন'-উপাধি প্রদান করেন—পূজ্য সজ্জ-সভাপতির পক্ষে প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ (২৫।১।৯২)

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। ছোট্টা পরিবেশন করেন পদ্মশ্রী শ্রীনেপাল মাহাত। উৎসবের বিভিন্ন পর্বের স্ফুর্তি পরিচালনার তদারকি করেন স্বামী জানীশ্বরানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী।

এই অহুষ্ঠানে বিহার শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত ১৯৯১ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জামসেদপুরের সবচেয়ে বেশী নম্বর-পাওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কম্বল ও বস্ত্র-বিতরণ

গড়িয়া সেবাশ্রম

গত ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯১, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গড়িয়া শাখায় গড়িয়া ও তৎপার্ব্বর্তী অঞ্চলের দুঃস্থ নর-নারীদের মধ্যে দুইশত কম্বল ও তিনশতাধিক কাপড় ও

জামা বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘের দিল্লী শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানন্দজী এই বস্ত্র বিতরণ অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং বলেন যে এই কাপড় বা কম্বল কোন দান নয়, ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ স্বরূপ। অহুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবরেন্দ্র কুমার গুহ রায়।

সিউড়ী সেবাশ্রম

গত ২৫শে ডিসেম্বর কোটাস্বর বাস ঠ্যাণ্ডে জেলার অতিরিক্ত আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রী এম. এইচ ভারমার সভাপতিত্বে ও স্বামী শুভানন্দজী মহারাজের পৌরোহিত্যে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর, কোটাস্বর, নারায়ণঘাট, আকনা, বহড়া, হটলনগর কালিকাপুর ইত্যাদি গ্রামের ৭৪ জন দুঃস্থের মধ্যে ৭০খানি কম্বল ও ৪ খানি ধুতি শাড়ি এবং ময়ূরেশ্বর নেতাজী সেবাসমনকে কিছু ঔষধ দান করা হয়। সিউড়ীতেও ৩০খানা কম্বল দেওয়া হয়। উক্ত সভায় সঙ্ঘের



গড়িয়া সেবাশ্রমে সঙ্ঘের দিল্লী শাখার প্রধান স্বামী বিজ্ঞানন্দজী দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে কাপড় কম্বল বিতরণ করছেন।

উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন স্বামী শুভানন্দজী কুওলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীকিরীটিভূষণ মণ্ডল, শিক্ষক শ্রীঅরুণ কান্তি মজুমদার ও সাংবাদিক শ্রীসমর্পণ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

গয়া সেবাশ্রম

৩১শে ডিসেম্বর সজ্জের গয়া শাখার সহর ও সহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলের দুঃস্থদের মধ্যে ৫ শতাধিক কাপড় ও কবল বিতরণিত হয়। অহুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মগধ প্রমণ্ডের আধিকারিক শ্রী আর এন পেজিয়ার এবং বিধায়ক সুরেন্দ্র কুমার যাদব ভাষণ প্রসঙ্গে সজ্জের সেবামূলক কার্যের তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সুতাহাটা হোড়খালি সেবাশ্রম

৫ই জানুয়ারী তারিখে আশ্রম সঞ্চালক স্বামী বিধানন্দজী আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক অহুষ্ঠানের মাধ্যমে সুতাহাটা থানার বিভিন্ন গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে তিন শত কবল বিতরণ করেছেন।

কুরুক্ষেত্র সেবাশ্রমে গীতাজয়ন্তী

২০, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর '২১ ত্রিদিবসীয় নানা অহুষ্ঠানের মাধ্যমে কুরুক্ষেত্র সেবাশ্রমে গীতাজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অহুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন ছাড়াও গীতার শ্লোক আবৃত্তি ও চিত্রকলা প্রতিযোগিতা, গীতায়জ্ঞ প্রভৃতি অহুষ্ঠান বেশ আকর্ষণীয় হয়। ২০শে সম্মেলনের সভাপতি সজ্জের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ গীতার আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণের আহ্বান করেন।

২১ তারিখে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের মন্ত্রী ডঃ রাম প্রসাদজী। শুরুতে তিনি প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপদেশ দেন এবং সজ্জের জনকল্যাণমূলক কার্যের প্রশংসা করেন। অন্ত্যাহত বক্তৃতাগুলোর মধ্যে ছিলেন—স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী নারায়ণানন্দজী, স্বামী গীতানন্দজী প্রমুখ। আশ্রম সঞ্চালক



হরিয়ানার বিজ্ঞান ও কারিগরী দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ডঃ রামপ্রসাদজী সজ্জের কুরুক্ষেত্র শাখার আয়োজিত গীতাজয়ন্তী সম্মেলনে ভাষণরত। মঞ্চোপরি অন্ত্যাহত বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন সজ্জ-প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ। (২১/১২/২১)।

স্বামী শঙ্করানন্দজী উৎসবের বিভিন্ন অঙ্কঠান পরিচালনা করেন।

অগ্নিকাণ্ডে সেবাকার্য

৬ই জ্যৈষ্ঠ '৯২ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নয়াগ্রাম থানার লোহাগেড়িয়া গ্রামের (মেদিনীপুর) ৬টি গৃহ ভস্মীভূত হবে সর্বশ্রী শ্যামলাল বাস্ক, লক্ষ্মীরাম মাণ্ডী, মহেশ্বর মাণ্ডী, দুর্গাচরণ মাণ্ডী, শশাঙ্ক মাণ্ডী, হুলা মাণ্ডী, গাডু মাণ্ডী প্রভৃতি গ্রামবাসী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্ঘের স্থানীয় ডোকরা সেবাশ্রম ও আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র থেকে স্বামী অসীমানন্দজী ক্ষতিগ্রস্তদের কাপড়, কঞ্চল ও আর্থিক সহায়তা দান করেন।

গুজরাটে চারণদল

স্বামী যোগীধরানন্দজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের চারণদলটি নওসারীতে প্রচার শিবির স্থাপন করে প্রত্যহ প্রভাতফেরী, ত্রিসন্ধ্যা পূজা-প্রার্থনা, প্রবচন, বিভিন্ন ভক্তগৃহে ধর্মীকুঠান, ইত্যাদি করে।

বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের ভাবধারা প্রচারে নিয়োজিত হয়। ওয়া ডিসেম্বর আয়োজিত এক বিরাট ধর্ম-সম্মেলনে বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমজুমদার পুরোহিত সভাপতিত্ব করেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি বিধায়ক শ্রীমজুমদার প্যাটেল, পত্রকার শ্রীগোতম মেহতা, সঙ্ঘের গুজরাট শাখার সঞ্চালক স্বামী অক্ষয়ধরানন্দজী। ভজন-কীর্তন, পূজারতি, প্রসাদ-বিতরণ, গর্তানাচ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্কঠান বেশ আকর্ষণীয় হয়।

বোকারো লোহনগরীতে চারণদল

স্বামী সৌম্যানন্দজী-পরিচালিত সঙ্ঘের চারণদলটি মাসাধিককালব্যাপী বোকারো ষ্টীল সিটি এবং বোকারো থার্মলে প্রচারকার্যে নিয়োজিত হয়। ৬ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে চারণদলের উদ্বোধন ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন ও যজ্ঞকুঠান হয়। বোকারো থার্মলের প্রধান স্থপতি শ্রীগোপাল চন্দ্র



হরিয়ানার বিহাৎ ও কারিগরী বিভাগের মহী ভঃ রামপ্রসাদজী সঙ্ঘের কুরুক্ষেত্রে সেবাশ্রমে গীতাজয়ন্তী

উপলক্ষ্যে গীতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার এক কৃতী প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করছেন।

সাপ্তাহিক সভাপতির ভাষণে সঙ্ঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও বহুমুখী কার্যাবলীর সপ্রশংস উল্লেখ করেন। দলনেতা স্বামী সৌম্যানন্দজী দেশের ক্রমবর্ধমান ছদ্মনির্ভিত্তি বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ঐক্য ও মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

এ ছাড়া চারপদলের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ভক্তগৃহেও কয়েকটি ধর্মাহুষ্ঠান হয়।

বিহারের বিভিন্ন স্থানে চারণদল

স্বামী জ্ঞানীন্দ্রনন্দজী পরিচালিত চারণদলটি গত দুর্গোৎসবের পর পাটনা শহর ছাড়াও বিহারের মঞ্জঃকরপুর, সমস্তিপুর, লাহিড়ীসবাই, ঝারভাড়া, মতিহারী, গিগিডি, মধুপুর, বৈষ্ণবনাথদায় প্রভৃতি স্থানে প্রচার ও অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। উক্ত চারণদলটি গিগিডিতে শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ীতে অবস্থান করতঃ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা, স্বাস্থ্যগান, ভজন-কীর্তন, শ্রীশ্রীহরীর-পূজারতির মাধ্যমে প্রচার করেন। এছাড়াও চারণদলটি আশে পাশে ৫টি প্রবাসী ভক্তগৃহে পারিবারিক বজ্রাহুষ্ঠানে অংশ নেন। পরে চারণদলটি সঙ্ঘের গঙ্গাসাগর মেলা সেবাকার্যের সামিল হয়।

পুন্ডলিয়ার গ্রামে প্রচার

২৫শে ডিসেম্বর '১১ সঙ্ঘের উদ্যোগে পুন্ডাগ্রামে এক বিরাট হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন ও শান্তিবজ্র অহুষ্ঠিত হয়। প্রভাফেরী দিয়ে উৎসবের সূচনা। অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘের রাণীবীধ (বাকুড়া) শাখার সঞ্চালক স্বামী জিহিবানন্দজী। প্রধান অতিথি লৌলুড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও স্বামী অরুণানন্দজী, শ্রীতপানন্দ গিরি, শ্রীঅম্বারতন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। লাঠি-ছোরা খেলা, বৈদিক বজ্র, শ্রীগুরুপূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। সঙ্ঘনেতার ভাবাদর্শে নৈতিক জীবন গঠনে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় তরুণদের মধ্যে লক্ষ্য প্রকাশিত কিছু কিছু পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণিত হয়।

নয়ানগরে প্রাচীন জীবনমন্দিরের পুনর্নির্মাণ

ভারত সেবাপ্রথম সঙ্ঘের উদ্যোগে হুগলী জেলার যানগর গ্রামে প্রায় ৪০০ বছরের জীর্ণ বুড়োশিবের মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও তার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকার্য গত ১২ই এবং ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ভাবগভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশে সূসম্পন্ন হয়। বৈদিক বজ্র, ভোগ, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিতে সারাদিগ্রাম ছদ্ম দিন ধরে মেতে থাকে। দুই দুইসন্তর থেকে ধর্মপ্রাণ ভক্ত নরনারায়ণ আগমনে ছোট গ্রামখানি যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

উভয় দিবস হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি-সম্মেলনে তারকেশ্বরের মোহন স্বামী হুবিকেশ আশ্রম মহারাজ, রিষড়া প্রেম-মন্দিরের দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভারত সেবাপ্রথম সঙ্ঘের দিল্লী কেন্দ্রের প্রধান স্বামী বিজয়ানন্দজী, শ্রীদেবীপ্রসাদ সিংহরায়, স্বামী প্রেমানন্দজী প্রমুখ বক্তাগণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভক্তিমূলক ও জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত-সম্মেলনে শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসবিতারত দত্ত, শ্রীভবরত দত্ত, শ্রীমতী গুরা দয়কার, শ্রীলক্ষণ পণ্ডিত, শ্রীমতী বর্ণালী সিংহ রায় আরও অনেক স্থানীয় শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

উজ্জয়িনী কুম্ভমেলা

পুণ্য স্থানের নির্ঘণ্ট

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী সম্প্রতি আসন্ন উজ্জয়িনী কুম্ভ মেলায় সঙ্ঘের সেবাকার্যের প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য সেখানে গিয়ে মেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। পুণ্য কুম্ভস্থানের নিম্নোক্ত নির্ঘণ্ট স্বামীজী জানিয়েছেন :—

১৭ই এপ্রিল, ১৯৯২

পূর্ণিমা

২রা মে

মৌনী অমাবস্তা

৫ই মে

অক্ষয় তৃতীয়া

৭ই মে

শঙ্করাচার্য জন্মন্তী

১৬ই মে

বৈশাখী পূর্ণিমা

হিন্দু মিলন-মন্দির সংবাদ

লিডু হিন্দু মিলন মন্দির

বিগত ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর '২১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জাতি ও সমাজ গঠনমূলক হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বিশ্বশান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সজ্জের ধর্ম সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ সন্ধ্যাসী-মণ্ডলীসহ যোগদান করেন। স্বামীজীর যুগোপযোগী ভাষণ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে অল্পপ্রাণিত করে।

২৪ ডিসেম্বর '২১ স্বামীজীর কাছে ৬৬ জন ধর্মপিপাসু নরনারী সাধনোপদেশ গ্রহণ করেন। ২৩শে ডিসেম্বরের সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণে স্থানীয় মহাকুমাধিপতি শ্রীপুষ্পনাথ ভূঞা এ. সি. এস, এবং মিনিয়র ব্লক উন্নয়ন অফিসার শ্রীহুলন সনোয়াল এ. সি. এস সজ্জের ভাবধারা ও কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বুধনপুর (মহেশানা)।—গত ১২ই জানুয়ারী বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট হিন্দুধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমলপুর নেতাজী হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোবর্দ্ধন মিত্র। স্বামী অরুণানন্দজী, শ্রীশিবনাথ কুস্তকার, শ্রীরামপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীভোলানাথ কুণ্ড প্রমুখ হিন্দুধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

গুরুত্ব বীরত্ব ও আত্মরক্ষামূলক লাঠি ছোরা খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রযজ্ঞে সমবেত শত শত ভক্ত নরনারী আহুতি প্রদান করেন। শেষে শ্রীশ্রীযুগাচার্য পূজাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

আগাপুর—শ্রীশ্রীযুগাচার্যদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্র শিষ্য মায়ালা নিবাসী শ্রীমণীন্দ্র নাথের বাড়ীতে ১৯শে জানুয়ারী ১৯২২ তারিখে শ্রীশ্রীত্রিশূলোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের মঙ্গলারতির পর ছয় ঘণ্টা ব্যাপী ওঁ হর 'গুরো শব্দর শিব শব্দো' দিব্যনাথ সংকীর্তন করা হয়। নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি-সহকারে ত্রিশূল অভিষেকের পর ত্রিশূলতত্ত্ব

এবং ত্রিশূলোৎসবের সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীনরনাথ চক্রবর্তী। বিভিন্ন অস্থানে অংশ নেন সর্বশ্রী জামোদ সাভাল যোগেন্দ্রনাথ পাল, বামন চন্দ্র ধর, ডাঃ পুলিন বিহারী বিশ্বাস, আদিত্য কুমার রায় প্রমুখ। অস্থানান্তরে সকলে পংক্তিভোজে বিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ

গত ১২ নভেম্বর ১৯২১ তারিখে আসানসোলে প্রচারয়ত চারণদলের উপস্থিতিতে সজ্জ-হিতৈষী ও সজ্জাশ্রিত ভক্ত স্বর্গীয় শচীন্দ্র নাথ দত্তের হিলডিউ পার্ক বাসভবনে এক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। চারণদলের নেতা স্বামী জীবানন্দজী ও মিলন-মন্দিরের সম্পাদক শ্রীমুকুল চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে সজ্জ-প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ১৬ই নভেম্বর ১৯২১ তারিখে প্রয়াত শচীন্দ্র নাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপন পূর্বক বিদেহী আত্মার সদগতি প্রার্থন করেন।

কলিকাতা ময়দানে পুস্তকমেলা

ভারত সেবাপ্রম সজ্জের স্টল নং ৪৩৮

২৯ জানুয়ারী '২২ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বিভিন্ন ভাষায় ভারত সেবাপ্রম সজ্জ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ-প্রকাশিত ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গবেষণামূলক শতাধিক অমূল্য গ্রন্থরাজির বিপুল সমাবেশ।

প্রবন্ধক

ভারত সেবাপ্রম সজ্জ ও শ্রীশ্রীপ্রণব মঠ।

২১১ রাসবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা-১২

শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচর্য্যম্

স্বামী বেদানন্দ

তরুণ সমাজের দরদী, মরমী, বাথার-বাথী, আত্ম উদ্ধারের, অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন সজ্জনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের অমৃতোপম সাধনোপদেশ। সংযম ও শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র গঠনেচ্ছু বালক, যুবক ও ছাত্রছাত্রীগণের অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য—পাঁচ টাকা

জীবন সাধনার পথে

স্বামী আত্মানন্দ

দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদাপদ আসে তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীশ্রীসজ্জনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট উপায় ও কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ। বালক বৃদ্ধ, যুবা, ছাত্রছাত্রী, গৃহী-সন্ন্যাসী, দেশসেবক নির্বিশেষে প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই ইহাতে নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণে পথের সন্ধান পাইবেন।

মূল্য—দশ টাকা

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

মূল্য—৪০ টাকা

ঐ ইংরেজী সংস্করণ :

Essence of Hinduism

Price—Rs. 75

লিখেছেন—আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ ও কলিকাতা উচ্চ আদালতের ভূতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি ডঃ দুর্গাদাস বসু, সরস্বতী প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক এই গ্রন্থটিতে বিদগ্ধ গ্রন্থকার ‘হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও মর্মবাণী কি?—তা’ বহু শাস্ত্রীয় তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিবৃত কবেছেন। জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির স্বত্বাধিকার ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে অর্পণ কবেছেন।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যদেব বিষয়ে গবেষণা ধর্মী ও

তথ্যপূর্ণ দুটি অমূল্য গ্রন্থ

সম্পাদনা—স্বামী নির্মলানন্দ

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ

মূল্য আট টাকা

শতাব্দীর নবজাগরণ ও স্বামী প্রণবানন্দ

মূল্য এক টাকা

ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০১২

শ্রী শ্রীযুগাচার্য্য জীবনচরিত

শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী সম্পাদিত

ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের
তপঃস্বক দ্বিবা জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ, ভদ্রীর বর্নিতভিত্তে জাতিগঠন ও
সেবাস্রম সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে কর্মবিকাশের দ্বারা সম্বলিত সাবলীল ভাবার
দৃশ্যপুষ্টি জীবন-আলেখ্য। অক্ষসেটে মুদ্রিত মবকসেবরে প্রকাশিত-৫০০ পৃষ্ঠার প্রায় ৪৫ টাকা।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বিধরে গবেষণার্থী ও ভ্রম্যপূর্ণ দ্রুতি পুস্তক

জড়াজীর্ণ নবজাগরণ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ কলা—এক টাকা

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ কলা—আট টাকা

সঙ্ঘের নূতন গ্রন্থ

শ্রীগুরুসঙ্গে : শ্রীগুরু প্রসঙ্গে

অক্ষসেটে ছাপা

সুন্দর বঁধাই ৪০.০০

অন্য ৪০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের প্রথম পর্ধ্যায়ের
এগাবোটি অধ্যায়ে আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত
আচার্য্যদেবের পুত সঙ্গ লাভের কথা এবং আচার্য্য-
দেবের অমৃত উপদেশাবলী। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে
আছে সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের মহাজী-নেব
উপর লিখিত ৩৮টি স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধ এবং তাব সঙ্গে
আছে সঙ্ঘের দীক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও জপবিধি
শ্রীগুরুপূজারতি প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ক বিবিধ
আলোচন। প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে অনন্দ
দেবে এবং সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার দ্বিবা মহাজীবনের
উপর নূতন আলোকপাত করবে।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য সঙ্গ ও

উপদেশাবলি

শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী রচিত

(ভূতীয় সংস্করণ)

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যদেবের অতীত আখ্যানা নীলা-
সহচর ও মরনী সচর-সাধক শ্রীমৎ স্বামী আত্ম-
ানন্দজী ভদ্রীয় সাধন-জীবনের উদ্যোগে পরমারাধ্য
নন্দপুস্তকর শুভ সন্নিধো এসে যে দিনলিপি সংরক্ষিত
করেছিলেন, আলোচ্য মূল্যবান একটি ভারতীয় অমরত
প্রকাশন। ভদ্রন বৃক ও বিভাবীনের শৈথিল্য
চীবন গঠনের অমূল্য উপদেশাবলী প্রকৃতির হস্তে
হস্তে ভাবগভীর ও সুখপাঠ্য ভাবার কূটে উঠেছে।

মূল্য - বড়ি টাকা মাত্র

ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘ

২১১, দানবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা-১২

ফোন-৪০৫-১৭৮

প্রণব কার্যালয় : ২১১, দানবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা-১২, ফোন : ৪০৫-১৭৮ হইতে স্বামী ত্যাগবিরাম

দ্রুতি প্রকাশিত এবং ভদ্রাচার্য্য প্রণব প্রেস, ২১, মটরটোলা সের, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

মুদ্রাদক—স্বামী নির্মলানন্দ

ভারত সেবাস্রম সংঘের মাসিক মূখপত্র

প্রজব

ধর্ম ও জাতীয়তার বাণী



৬৬ বর্ষ, ১১ম সংখ্যা

১৯৯৩

বার্ষিক দৃশ্য-২৫'০০

প্রতি সংখ্যা-২'৫০

সত্বেৰ ধৰ্ম ও জাতীয়তামূলক গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের জীবনী ও		বারো নামে তেবো পাবণ		অঞ্জলি	
বাণীমূলক		কি ও কেন ?		সম্ভব-সমীত চংগিনী	
বৃগাচার্য্য জীবন-চরিত	৪৫'০০	হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব	৪০'০০	ঐ স্বরলিপি	
শ্রীশ্রীগুণাচার্য্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত	২০'০০	Essence of Hinduism	75'০০		
মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী		গুরুপূজা ও গুরুভক্তিমূলক		বিবিধ	
প্রণবানন্দ	১০'০০	শ্রীশ্রীসদগুরু	৭'০০	হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা	১২'০০
কঠে কঠে করুণা কথা ১ম খণ্ড	৮'০০	জগদগুরু	২'০০	বৃগধর্ম	২'০০
ঐ ৮ম খণ্ড	৬'০০	গদাধরোপাধ্যায় ও		শ্রীশ্রীসম্ভবাবাণী	১৫'০০
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ শতরূপেশতমুখে ১ম ২৬'০০		গদাগাগর ভীষ্মের কথা	৩'০০	ঐ ব ভারত	৫'০০
" " " ২য় খণ্ড ৩০'০০		গদা মাহাত্ম্য ও কৃত্য	৪'০০	বিদ্য সাধক স্বামী বেদানন্দ ও	
" " " ৩য় খণ্ড ৩০'০০		ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনমূলক		সাহিত্যকর্ম	৩'০০
শ্রীগুরুসঙ্গ ও শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে	৪০'০০	হিন্দুধর্ম	৫'০০	সম্ভব-সাধক চরিতমালা (২য়)	১৬'০০
প্রণবানন্দোপদেশ	২'০০	হিন্দু হ'শিয়ার	৫'০০	ত্রিশূলতত্ত্ব ও ত্রিশূলোৎসব	২'০০
ভক্তের প্রণবানন্দ	৭'০০	চেতনার ডাকে হিন্দু	৮'০০	পণপ্রথা সমাজের কলঙ্ক	২'০০
শিশুদের প্রণবানন্দ	৪'০০	হিন্দুধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য	১৬'০০	শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের কটো	
সম্মতিতা	২০'০০	মহাজাতি গঠনে হিন্দুধর্ম	১৪'০০	জীবনলীলা	৩'০০
প্রণবানন্দ স্মৃতিস্মরণ	১০'০০	শ্রীকৃষ্ণ	২'০০	বড় বঙ্গা ফটো	৩'০০
Reflections on Hinduism	15'০০	আদর্শ শিক্ষাপ্রচারমূলক		ছোট বঙ্গা ফটো	১'০০
Ten Divine Messages	9'00	Ideals of Indian		ত্রিশূল হাতে " (মাঝারী)	১'০০
Foundation of Religion	10'00	Education & Culture	35'00	ত্রিশূল হাতে " (বড়)	৩'০০
The Divine Life Builder	5'00	স্বত্বাধিতম	১২'০০	লকেট	২'০০, ৬'০০, ২০'০০
Acharya Pranabavanda	20'00	ঐ ২য়	১২'০০	লা'ব'ট	৪'০০, ৫'০০
আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ও		আদর্শ বিদ্যার্থী	৭'০০	হিন্দী গ্রন্থাবলী	
শ্রীশ্রীহৃদয় মঠ	৮'০০	শিক্ষা সমস্যার সমাধানকোষপ.থ.	১৫'০০	জীবন-চরিত	৮'০০
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ	১২'০০	শাস্ত্রীয় গ্রন্থ		বাণী ও নির্দেশ	১'০০
শতাব্দীর নবজাগরণ ও		শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৪০'০০	ভারত মে' গুরুপূজা (বহুধ)	১'৫০
আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ	১'০০	ঐ গুরুমুখী ভাষ্য	২৮'০০	চিন্মুখ্য	১'৫০
জাত্যগঠনমূলক		শ্রীশ্রীগুরুগীতা	১৫'০০	ব্রহ্মচর্য্য	১'৫০
ব্রহ্মচর্য্য	৫'০০	গুরুমুখী রামায়ণ	১২'০০	সম্ভবাবাণী	৪'০০
গার্হস্থ্য	৫'০০	গুরুমুখী মহাভারত	১২'০০	স্বামী প্রণবানন্দকে	
জীবন সাধনার পথে	১০'০০	শিশুদের রামায়ণ	৩'০০	জীবন কী ঝাঁকিয়া	৫'৫০
পাথের	৭'০০	শিশুদের মহাভারত	৫'০০	জীবন সাধনা কে পথপর	৪'০০
সাধনবাণী	৪'০০	জাত্যদের রামায়ণ	১০'০০	গদা মাহাত্ম্য ও	
পথপ্রদর্শনমূলক কয়েকখানি গ্রন্থ		ঈশ্বরগীতা	১৪'০০	গদাগাগর কী কথা	২'০০
দেবদেবী ও তাঁদের বাহন	৩০'০০	কবিতা ও গান			
হুই দেবী	৮'০০	প্রতিজ্ঞা	১'০০		
		সম্মতিবিধাণ	৪'০০		

জ্ঞানভ্য বিষয়—তাকমান্তল স্বতন্ত্র দিতে হয়। দশ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভি-পি-পি করা হয় না।

চিঠিপত্রে পুরা নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—(ক) ভারত সেবাস্রম সম্ভ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১২, ফোন-৪০৫-১৭৮

(খ) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ জামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ফোন—৩১-১৪৭২

(গ) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

(ঘ) অরুণ পুস্তকালয়—১২১২-বি, বক্সিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রণব—চৈত্র, ১৩১৮

সূচীপত্র

১। যুগবাণী	...	শ্রীযুগাচার্য	৪৪৩
২। জীবনের বাণী	...	সম্পাদক	৪৪৪
৩। ভারতের একতা	...	সম্পাদক	৪৪৫
৪। কঠোপনিষৎ	...	ডঃ সীতানাথ গোস্বামী	৪৪২
৫। অধ্যাত্ম সাধনায় ভারত	...	শ্রীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫২
৬। জীবনের সার (কবিতা)	...	শ্রীমহিষ কুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৫৭
৭। গীতোক্ত কর্মবাদ ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ	...	শ্রীমনোমোহন দেবনাথ	৪৫৯
৮। অতি নিকটে	...	শ্রীঅজিত কুমার রায়	৪৫৮
৯। ভারত পরিক্রমার আচার্য শঙ্কর	...	শ্রীঅমির কুমার রায়চৌধুরী	৪৬০
১০। বর্ষশেষের চিন্তাভাবনা	...	শ্রীঅজিত কান্তি সরকার	৪৬৪
১১। যুগার্ধ্ব স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁর আদর্শ	...	মহাপাত্র শ্রীনীলমণি সাহু	৪৬৫
১২। চৈত্র-চিন্তা (কবিতা)	...	শ্রীহৃদীর গুপ্ত	৪৬৭
১৩। ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে	...	শ্রীহিতেশ্বর শইকিয়া	৪৬৭
১৪। সঙ্কলন	...		৪৭০

প্রণবের নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি

১। বৈশাখে বর্ষ শুরু। যে কোন দাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা পঁচিশ টাকা; প্রতি সংখ্যা দুই টাকা; পঞ্চাশ পরস। মাত্র।

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার রূপে পুরো নাম, ঠিকানা গ্রাহক নম্বর এবং নতুন গ্রাহক 'নতুন' কথাটি লিখবেন।

৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে দেওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিন। বার বার ডাকের গোলমাল হলে Post Master General, West Bengal Circle Calcutta-1 ঠিকানায় লিখুন।

৪। চাঁদার মেয়াদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ যাবে। সেই অল্পসারে চাঁদা পাঠাবেন।

৫। প্রণব অফিসে এসে চাঁদা জমা দেওয়ার সময়—৭টা থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মি: থেকে ৫-৩০।

৬। চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই পোস্টকার্ড প্রেরিতব্য।

লেখকগণের প্রতি

১। সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুরা-কীর্তি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখক-গণের মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক দায়ী নহেন। আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশিত হয় না।

২। রচনার ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করবেন। তা না হলে লেখা বিবেচিত হয় না।

৩। কাগজের একপাঠে ছুঁদিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখবেন। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হাতের লেখা গৃহীত হয় না।

৪। লেখক কপি রেখে তাঁর পুরো নাম ঠিকানা সহ লেখা পাঠাবেন। অননুমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। লেখার সাথে খাম, পোস্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন না। লেখা মনোনীত হলে আয়তাই জানিয়ে দেব, কিন্তু লেখা ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে পত্রালাপের জন্য অস্বীকার করবেন না। ইতি—প্রণব সম্পাদক

TO LET

প্রণব

ধর্ম কি ?

তাগ

সংযম

সত্য

ব্রহ্মচর্য



মহাপুণ্য কি

বীরত্ব

পুরুষত্ব

মনুষ্যত্ব

মুমুক্শুত্ব

ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামীপ্রণবানন্দজী মহারাজ

৬৫তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯৮

সম্পাদক—স্বামী নির্মলানন্দ

{ প্রণব কার্যালয় : ২১১, রাসবিহারী
এভিনিউ, কলি-১৯, ফোন ৪০৫-১৭৮

যুগবাণী

ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া চলিতে পারিলে কোন পাপ-তাপের দ্বারা তোমাদের মন সন্তাপিত হইবে না, কোনরূপ ভ্রম-ভ্রান্তি তোমাদিগকে বিমোহিত করিতে পারিবে না। সতত স্মরণ রাখিবে যে, তোমরা যে শুদ্ধ-শাস্ত্র মহাপুরুষের শরণাগত হইয়াছ, যদি তোমরা তাঁহার নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চল তবে ক্রমশঃই তোমাদের মুক্তির পথ সরল ও সুগম হইবে। ভাবিবার ও ভয় কবিবার কিছু নাই। সতত তোমাদের আশ্রয়দাতার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক রাখিও।”

(শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা ১ম খণ্ড, ৩৯নং পত্রাংশ, পৃষ্ঠা ১০৬)

—আচার্য্য স্বামীপ্রণবানন্দ

জীবনের বাণী

[সম্পাদক]

ন কন্যায়াঃ পিতা বিধান্ গৃহীয়াচ্ছুকুমধপি ।
 গৃহ্ন শুল্কং হি লোভেন স্ত্রান্নরোহপত্যবিক্রয়ী ॥ মনু
 শুক্লেন যে প্রযচ্ছন্তি সন্তুতাং লোভমোহিতাঃ ।
 আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকলিষাকারিণঃ ॥
 পতন্তি নরকে ঘোরে সন্তি চাসপ্তমং কুলম্ ।
 গমনাগমনে চৈব সর্ব্বঃ শুক্লোহভিধীয়তে ॥ কাশ্যপ
 এতাবদেহি মে দ্রব্যমিত্যুক্ত্বা প্রাধরায় চ ।
 যত্র কন্যা প্রদীয়তে স বৈ দৈত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ পরাশর
 বঙ্গার্থ

শুল্ক গ্রহণের দোষ জেনে কন্যার পিতা স্বল্প পরিমাণ অর্থও গ্রহণ করবে না। লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করলে অপত্যবিক্রয়ী হতে হয়। (মনু) যারা লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ পূর্বক স্বীয় কন্যা বরকে প্রদান করে সেই আত্মবিক্রয়ী পাপী এবং মহাপাতকের অমুষ্ঠাতৃগণ নরকে পতিত হয় এবং বংশের সপ্তপুরুষকে পর্যাস্ত নষ্ট করে। (কাশ্যপ) এই পরিমাণ দ্রব্য (পণ ও যৌতুক) আমাকে দান কর—প্রথমে এইরূপ বলে যে স্থলে বরকে কন্যা দান করা হয়, সেই বিবাহ দৈত্যবিবাহবিধি নামে কথিত হয়। (পরাশর)

ভাবানুধ্যান

স্বর্গ যুগে বরপণ বলে কিছু ছিল না, কোথাও কোথাও কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু, কাশ্যপ, পরাশর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা এই কন্যাপণের তাঁত্র নিন্দা করেছেন এবং প্রভূত দোষ দেখিয়েছেন। বর্তমানে ব্যাপারটা গেছে উল্টে। কন্যাপণের পরিবর্তে বরপণের দৌরাত্ম্য তুঙ্গে। সন্তুতাং, স্মৃতির বচনের তাৎপর্যও উল্টে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। খাপ্পরটা গিয়ে পড়ছে বরের পিতার নির্লজ্জ গণ্ডে।

বরপণ অতি ক্ষয় প্রথা। হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-সংস্কৃতির অত্যাচ্ছ গৌরব ও আদর্শের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। বরের অতিলোভী পিতার পণ গ্রহণের লালসা বিষ্ঠাভুক্ত কুকুরের জিহবার মতই লক্ লকে

কিন্তু মানুষের সদাচার ও সমাজবিধির শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক মনু মহারাজ বলেন—এইরূপ পণ গ্রহণ অপত্যবিক্রয়ের তুল্য। সহজ বাংলায় এটা ছেলে বিক্রয়ের ব্যবসা। কাশ্যপ বলেন—এই প্রথা মহাপাপ এবং এই পাপীরা নিজেরা তো নরকে যাবেই, তারা সপ্তপুরুষ পর্যাস্ত নষ্ট করে পরাশর চুক্তি করে পণ ও যৌতুক গ্রহণ পূর্বক বিবাহকে দৈত্য-বিবাহরূপে অভিহিত করেন।

একশ্রেণীর অসং কুচক্রী ফুসলিয়ে মেয়ে পাচার করে পাপ ব্যবসায়ের জগৎ দেশে বিদেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করছে—এরূপ খবর সংবাদপত্রে শুনা যায়। আর ঘরে ঘরে পণগ্রহণের নামে উচ্চ মূল্যে যে ছেলে বিক্রয় হচ্ছে—তার দোষ কি কিছু কম? সাধারণ দরিদ্র থেকে ধনী ও অভিজাত মানুষ সকলেই মেতে উঠেছে এই অতি কদর্য ছেলে বিক্রয়ের ব্যবসায়ে চারণ গায়ক মুকুন্দ দাস সত্যিই গেয়েছেন—
 ছেলের বাবা বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে,
 মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল চোখের জলে ভাসে
 ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে।

সত্যি দেশে আর মানুষ নেই। সব পরিণত হয়েছে দম্ভ ও দৈত্যে। পাঁচ হাজারে আর পোষায় না। ক্ষেত্রবিশেষে ছেলের দাম চড়েছে অস্তুতঃ পঞ্চাশ হাজার বা ততোধিক। ঘরে ঘরে দৈত্যবিবাহর আর আহ্ব্যকরা মজা করে এই দৈত্যবিবাহের নিমন্ত্রণ খেয়ে আনন্দে প্রেতনৃত্যে উৎফুল্ল। ছি! ছি! ঘেন্না ধরে না? মনুষ্যত্ব আছে? বিবেক আছে? তাহলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছো না কেন? প্রতিকারে বন্ধপারিকর হচ্ছে না কেন? বন্ধ হোক এই অসামাজিক হীন ব্যবসায়। সঙ্কল্প কর—“পণ নেবো না, পণ দেবোনা।” তা হলে মেয়ের বিয়ের খরচ কড়ায় গণ্ডায় উশুল করতে ছেলের বিয়েতে আর পণের দাবী উঠবে না। পারম্পরিক ত্যাগের ভিতর দিয়েই এই পাপপ্রথার অবসান ঘটতে পারে।

ভারতের একতা

[সম্পাদক]

ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ড: মুরলী মনোহর যোশী তাঁর পনর হাজার মাইল দীর্ঘ একতা যাত্রার পূর্বে কলকাতা এসেছিলেন। গত ২২।১১।৯১ তারিখে একই দিনে তিনি বেলুড়ে জীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠে এবং বালিগঞ্জে ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘে সদস্যবলে আসেন। উদ্দেশ্য—এই একতা যাত্রার সঙ্ঘে জীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণতি ও ভক্তি নিবেদন এবং উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ। তিনি সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি ও জ্যেষ্ঠাঙ্গদ প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে মিলিত হন। অস্থায়ী অবস্থায় শয্যাশায়ী এই লেখকের সহিত সাংক্ষাৎকারেও তিনি ভুল করেন নি। তিনি কণ্ঠাকুমারিকা থেকে যাত্রারস্ত ক'রে কাশ্মীর পৌছাবেন এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের গর্জনে তুলে তথাকার লালচকে প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং ভারতের সকল রাজ্যের মাটি ও প্রধানতম তীর্থ-রাজ্যের পবিত্র সঙ্গিল ত্রিবর্গরঞ্জিত পতাকার বেদীমূলে সংস্থাপনপূর্বক দেখাবেন ভারত এক ও অখণ্ড তথা ভারতীয় জাতিও এক এবং অখণ্ড। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রাণে দেশ ও জাতিকে খণ্ডিত করা যায় না। কাশ্মীর ভারতেরই অঙ্গ রাজ্য। তা কেন ভাগ হবে ?

যোশীজী এই একতা যাত্রার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু বিতর্ক উঠেছিল। আমরা অবশ্যই তার সঙ্গে জড়িত নছি। বিশেষতঃ রাজনৈতিক প্রাণে তো নয়ই। কিন্তু যোশীজী সঙ্ঘের শুভেচ্ছা আন্তরিক ভাবেই পেয়েছেন। এই শুভেচ্ছা কোন রাজনৈতিক নেতাকে দেওয়া হয়নি, তা দেওয়া হয়েছিল ভারতের

একতা যাত্রার এক সাহসী সৈনিককে। একতার প্রাণে যে কোন মত-পথ ও দল-উপদলের প্রতিনিধিই শুভেচ্ছা ও সমর্থন পেতে পারেন। কারণ, ভারতের একতা কে না চায় ? কে কামনা করে দেশ আবার খণ্ড-বিখণ্ড হোক ? এই একতার প্রাণে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই সহমত হবেন—এটাই প্রত্যাশিত। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংস্থাসমূহেরও দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। এই প্রাণে সাধু-সন্ন্যাসীরাই বা গা বাঁচিয়ে ভাল মানুষ সেজে কেন নিরপেক্ষ থাকবেন ? তাঁরাও তো ভারতেরই সুনাগরিক। ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্য যদি বিঘ্নিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত অধ্যাত্ম সাধনা ও নীরব ধ্যান-উপাসনার স্থান ও পরিবেশ তাঁরা কোথায় পাবেন ? দেখা যাচ্ছে না কি কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আজ হয় উদ্বাস্ত হয়ে অসংস্কৃত শিবিরের নীচে অতি ক্লেশকর অবস্থায় দিন যাপন করছেন অথবা যে যেখানে পারেন নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন ? তাঁদের পূজা ও উপাসনার বহু মন্দির চূর্ণিত, জীবন বিপন্ন, নারীর মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত। এ সমস্তই বিচ্ছিন্নতাবাদের অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। সুতরাং, ভারতের একতার প্রাণে অতি স্পষ্ট ও অতি বলিষ্ঠ অস্তিমত সাধুসম্প্রদায়কেও দিতে হবে। এ কাজকে সাম্প্রদায়িকতা বলে যদি কেউ নিন্দাবাদ করে, তবে বুঝতে হবে সে মানুষটি ধান্দাবাজ, দেশদ্রোহী, সমাজের কুলাঙ্গার অথবা নিছক ভোটপ্রত্যাশী।

যোশীজী বলছিলেন স্বর্গত ড: শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পথরেখা অনুসরণ ক'রেই তিনি কাশ্মীর যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প। ভারতের অখণ্ডতা ও

জাতীয় ঐক্যের প্রস্বেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অভিযান করে অকালে প্রাণ বিসর্জন দেন। তৎকালে তিনি জনসংজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। হিন্দুর দাবী নিয়ে তিনি সেখানে যান নি, তিনি জীবন বিপন্ন করেছিলেন ভারতের অখণ্ডতার স্বার্থে, দেশের অখণ্ড সহতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়।

ডঃ মুখোপাধ্যায় উন্নত মুসলিম সাম্প্রদায়িক-তাকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলায় জন্তাই এক কালে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। তখন পঞ্জাব, সিন্ধু, বঙ্গ, আসাম, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি হিন্দু সংখ্যালব্ধিষ্ঠ রাজ্য ও জনপদে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয়—তাদের ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন। দেশ যখন খণ্ডিত হওয়ার মুখোমুখী, তখন শ্যামাপ্রসাদের ফর্মুলাই রক্ষা করেছিল পঞ্জাব, বঙ্গ ও আসামের বিশেষ বিশেষ অংশাবলীকে পাকিস্তান-ভুক্তির কবল থেকে। আজ বঙ্গের যে অংশে আমরা বাস করছি, লক্ষ লক্ষ পূর্ব বঙ্গের হিন্দু যেখানে এসে নিরাপদ মাথা গুঁজবার স্থান পেয়েছে, অধুনা মাননীয় জ্যোতি বাবু যে বঙ্গের অধীশ্বর, তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের দান। তিনি শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে আজ আমরা কোথায় ভেসে বেড়াতাম, তা ভাবতেও শিহরণ জাগে। শ্যামাপ্রসাদ সত্যই পণ্ডিত নেহেরুজীকে বলেছিলেন—“আপনি করেছেন ভারত বিভাগ, আমি করেছি পাকিস্তান বিভাগ।” এই বরণ্য বীরকেশরী নেতাকে বাঙ্গালী হিন্দু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে কি ?

বীর সাভারকর, ডঃ মুঞ্জ, ভাই পরমানন্দ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার বি, সি, চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সহিংস আন্দোলনের দম্ভ রুথতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, ঠিক সেই হৃদ্যোগের দিনে

সজ্জনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ অরাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলনের কর্তৃপ্রকল্প নিয়ে বিপন্নের পাশে। তিনি নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গড়ে তুলছেন, হিন্দুদের একতাবদ্ধ করছেন, তাদের ভিতর স্বধর্ম, স্বসমাজ ও আপন ধন-মান-প্রাণ রক্ষার অনুরোধের সঞ্চার করছেন। স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না হলেও রাজনৈতিক ভাবে যে সংস্কার মেতৃবৃন্দ বিপন্ন মানুষের জন্ত সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত, তাঁদের সঙ্গে নির্দিষ্টায় সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। মহাসময় ও মহামিলনের উদ্গাতা ঋষি হয়েও বাস্তব সমস্তাকে বাস্তব উপায়ে নিরসনের স্বার্থে তিনি এ কাজ করতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্তার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার বি, সি, চট্টোপাধ্যায়, এন, সি, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু মহাসভার নেতাকে তিনি বার বার ডেকে এনেছেন নিজ প্রকোষ্ঠে এবং সজ্জায়োজিত হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনের বিরাট মঞ্চে। যে সিদ্ধযোগী যুগাচার্য্য গুরুর আসনে উপবেশনপূর্বক সহস্র সহস্র সংসারতাপিত নরনারীকে অভয় আশ্বাস উপদেষ্টা ও অধ্যাত্ম সাধন দান করছিলেন, যার ক্ষণিক দর্শনের ব্যাকুলতায় শত শত মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তদীয় কক্ষদ্বারে লাইন দিয়ে প্রতীক্ষায় থাকতো, সেই মহাপুরুষ স্বীয় ব্যাসাসন ত্যাগপূর্বক বিপন্নের ত্রাণে পথে এসে দাঁড়ালেন। তৎকালে সর্বপ্রকার মান অভিমান ভুলে তিনি স্বয়ং সংবাদ পত্রের ছয়ারে ছয়ারে ঘুরছেন, দেশের গণ্য, মান্ত, ধনী, বিদগ্ধ জনকে আহ্বান করছেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়তে, তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন দিতে, আর শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আহার-বিজ্ঞান বিশ্বত

হয়ে পরিক্রমা করছেন সারা বঙ্গের সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে তৎপ্রবর্তিত সংগঠিত আন্দোলনের প্রচার-প্রতিষ্ঠায়। স্বীয় অন্তঃপ্রজ্ঞার প্রভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তদীয় জীবৎকাল স্বল্প। পক্ষান্তরে দেশের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর। ক্রমেই তা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। সম্মুখেই প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লব—যার প্রাণঘাতী আঘাত এসে পড়বে সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতনীদেবের উপর। কে বাঁচাবে দেশকে? কে সেই সংগ্রামী নেতা যিনি নিজ জীবনের বিনিময়েও শেষ চেষ্টা করে যাবেন? ব্যাকুল হয়ে উঠেন তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্ত। কিন্তু বার বার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েও অভ্যর্থিত ব্যস্ততায় ডঃ মুখার্জী প্রতি বারেই আসতে পারেন নি। সজ্জসন্ন্যাসীকে বলেন—আমি লজ্জিত। স্বামীজী মহারাজ ডেকেছেন, কিন্তু এবার আমি সময়ে তাঁর দর্শন লাভ করতে পারছি না। জন্মাষ্টমীর সম্মেলনেই সাক্ষাৎ হবে।”

সে ইংরাজী ১৯৪০ সাল। বালিগঞ্জে সজ্জা-য়োজিত জন্মাষ্টমী মহাসম্মেলনের বিরটি মঞ্চে সজ্জনেতা আচার্য্যদেব উৎকণ্ঠিত চিন্তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আগমনের প্রতীক্ষায়। তিনি আসতেই মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ান। স্বীয় কণ্ঠের পুষ্পমালাটি খুলে পরিয়ে দেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে। ঘরে এসে বলেন—“বিপন্ন হিন্দুর পাশে দাঁড়াতে পারে সেই নেতা ঠিক করে দিয়ে গেলাম।” বুঝলাম ডঃ মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ শক্তি ও আশীর্বাদ দিতেই মহাপুরুষ এত উদগ্রীব হয়েছিলেন। ঐ সালেই ডঃ মুখোপাধ্যায় ৬৬তম বর্ষের সময় সপরিবারে কাশীধামে। আচার্য্যদেব তাঁকে ডেকে পাঠান মহাষ্টমীর পূণ্য দিবসে। বহুক্ষণ রুদ্ধস্বর গৃহে উভয়ের মিলন ও কথোপকথন। ডঃ মুখোপাধ্যায় সপরিবারে সজ্জবর কাশীতীর্থে সেবাস্রমের তুর্গাপূজায় পুষ্পাঞ্জলি

দেন। এই ভাবে একাধিক বার সজ্জনেতা আচার্য্যদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ।

মহাপুরুষের এই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে যে মহাত্মত বরণ করেছিলেন, সে ব্রত নির্ভর সঙ্গে পালন করতে করতেই তিনি অকাতরে জীবন দিয়ে গেছেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় এক বিশেষ রচনায় মহাপুরুষের আশীর্বাদেব কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি লিখেন—

“স্বামীজী মহারাজের সহিত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েক বার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অলুপ্তিত কয়েকটি সম্মেলনে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি প্রবন্ধ সহিত স্মরণ করি এই বিরটি পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজো-ব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। তাঁহারই দূরদৃষ্টি বহু পূর্বে হিন্দুসমাজের রক্ষা ও সংগঠনকল্পে মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিল।”

পুনশ্চ উল্লেখ্য—আচার্য্যদেবের এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক। তিনিও ভারতের একতার স্বার্থেই বিন্দু বিন্দু শোণিতপাত করেছিলেন। এই কার্য্যে কঠোর জ্ঞানের ফলেই তাঁর যোগদূত শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি কখনই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে চান নি, উদ্যোগী হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের নিরসনে। তিনি হিন্দুকে যেমন স্বধর্মনিষ্ঠ হতে বলেছে, তেমনি

তদীয় সাক্ষাৎ সম্পর্কে আগত মুসলমানদিগকেও রোজানামাজে নির্ধা রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। হিন্দু মুসলমান সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতিই ছিল তাঁর সমান বাৎসল্য ও সেবার বৃত্তি। আচার্যের অকুণ্ঠ ঘোষণা—আমি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইনে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী ছুষ্টের দমন চাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার বা করবার কিছু নেই। আমরা চাই তারাও শান্তিতে, সুখে, আনন্দে থাকুক। মুসলমান ধর্ম বা শাস্ত্র বা পয়গম্বরের কোন নিন্দা আমরা করি না, বরং মুসলমানের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বাব, স্বজাতি স্বধর্মামুরাগ সজ্জনশক্তি, তা-ই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।”

আবার বলেছেন—“আমার হিন্দু সংগঠন কংগ্রেসের মহাজাতি গঠন পরিকল্পনার বিরোধী নয়। হিন্দু যদি হিন্দুর জাতিগঠন না করে, মুসলমান-খৃষ্টান যদি তাদের স্বীয় স্বীয় জাতিগঠন না করে, তবে মহাজাতিগঠনের কল্পনা কিরূপে সম্ভব” অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক সামাজিক সমস্যা আছে। কোন সম্প্রদায়ই সমস্যাযুক্ত নয়। সেই সমস্যাবলী নিরসনপূর্বক সামাজিক স্বাস্থ্য ও সুস্থিতি কিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা কোন অপরাধ নয়। কিন্তু এই খণ্ড আন্দোলনগুলির লক্ষ্যই হবে ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিকে বলিষ্ঠ ও সুনিশ্চিত করে তোলা। জাতীয় মূল শ্রোতে সকলেই একাত্ম। তা না করে যদি কোন সম্প্রদায় দেশকে টুকরো করতে বদ্ধ-পরিকর হয় এবং প্রতিবেশী ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ধন, মান, প্রাণ বিপর্যাস্ত করে তোলে তবে প্রতি-কারের শক্তি গর্জে উঠবে তাতে বাধা কোথা? প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ভারতের রাজনৈতিক চিত্রটা এ রকমই। সর্বপ্রকার মীমাংসা-মুত্র অগ্রাহ্য করে পাকিস্থানের জিগির উত্তুদ্ধে উঠে। ফলে হিন্দুরাও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। অভ্যুত্থান ঘটে হিন্দু মহাসভার। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত ব্যাঙ্ক চেকেও যখন জিন্মা সাহেবের মন গলে নি, সেই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ

শুনান জাতীয়তার সাধনার নূতন মন্ত্র—মিলন হয় সমানে সমানে—সবলে সবলে—সবলে ছুর্বলে কদাচ নয়। মুসলমান সংখ্যান্ন হয়েও স্বধর্মের ভিত্তিতে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। পক্ষান্তরে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মেস্বর্ঘ্যে বড় হয়েও অসংগঠিত ও ছুর্বল এই সুযোগেই তো সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আঞ্চালনের মুক্তাঙ্গন পেয়েছে আচার্যদেব বলেন “হিন্দু যেদিন মুসলমানের জায় শক্তিশালী ও সজ্জনবদ্ধ হবে, হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টানের প্রকৃত মিলন হবে সেই দিন, তৎপূর্বক নয়।” এই approach নিয়েই সেদিন নিষ্কিন্দন সন্ন্যাসী কণ্ঠিকার আশ্রয়ে শুধু বঙ্গদেশ নয়, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ জুড়ে সংগঠনের তরঙ্গ তুলে-ছিলেন। ভারতের অখণ্ড সংহতির অমুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই তাঁর এই উত্তম। ভারতের জাতীয় ঐক্য চুক্তির ভিত্তিতে হবে না, যুক্তির ভিত্তিতেও নয়। অবাধ সুবিধা দানের বদান্ততা সাম্প্রদায়িক ম্পর্দাকে আরো বাড়িয়েই তুলবে। সাপকে ছধ-কলা খাওয়ালে তার বিষবর্দ্ধনই হয়। দেশবিভাগের পয়তাল্লিশ বৎসর পরও এই একই ছবি মানুষ দেখছে। আজকের দিনে ভারতের পরিস্থিতি আরো ধারাপের দিকে। ভারতের অভ্যন্তরে সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট অধিকতর প্রকট। দেশকে আরো খণ্ড বিখণ্ড করতে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাজ্যে রাজ্যে ছোটবদ্ধ, এই ভয়ঙ্কর ছুদিনে ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্যের সংরক্ষণ এমন এক জরুরী প্রশ্ন যেখানে বিতর্ক উত্থাপন কেবল অসঙ্গত নয়—নিতান্ত মূঢ়তা। ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় একতাকে বাঁচাবার জঙ্কই সম্মুখে নেতা আচার্য একদা রাজনৈতিক নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে আশীর্বাদ ও প্রেরণা দান করেছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই আজকের দিনের একতা যাত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে অখণ্ড জাতীয়তাবাদী সজ্জন কুণ্ডা বোধ করেনি অধ্যাত্মসাধনার সনাতন লীলাভূমি ভারত। বর্তমান সমস্যাকটকিত, হিংসা-দ্রোহ-জঙ্ঘরিত, ভোগৈকসর্ববধ বিশ্বকে ভারতই শুনাবে শাস্তি, কল্যাণ ও অমৃতের বার্তা। সেই ভারতের অখণ্ডতা চিরজয়ী হোক।

কঠোপনিষৎ

ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণভীর্ষ

[পূর্বাত্মবৃত্তি]

[১।১।২৮ মন্ত্রে অধ্যয়, শরীর্ষ, অহুবাদ, শব্দ ভাষ্য মাধ, সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছে]

তাৎপর্য—যমরাজ যখন নচিকেতাকে তৃতীয় বরের দ্বারা লভ্য আশ্বত্থ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য বহু প্রলোভন দেখিয়েছিলেন তখন দীর্ঘজীবন লাভ করার কথাটিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল বাঁচা বিশেষতঃ যত বছর ইচ্ছা বাঁচা মানুষের একটি অসাধারণ কাম্য বস্তু। এই লোভ পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। নচিকেতা কিন্তু হৃদীর্ঘ জীবন লাভের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তিনি বলছেন যে, অতি দীর্ঘ জীবনের দ্বারা প্রার্থনাটি যমরাজের কাছে নিবেদন করা নিতান্ত অসঙ্গত যেহেতু যমরাজের কাছে অনেক মহামূল্য বস্তু লাভ করা যেতে পারে। নচিকেতা আশ্বত্থের দ্বারা অতি গভীর ও চিরন্তন পদার্থ তাঁর প্রাপ্য তৃতীয় বরের বিনিময়ে আগেই চেয়েছেন কারণ তিনি তাঁর তৃতীয় তথা শেষ বরটির সর্বোৎকৃষ্ট সদ্যব্যবহার করতে চান। এখন যমের প্রলোভনে যদি তিনি পুত্র, বিস্তৃষ্ণ বা দীর্ঘ জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন তবে তা চরম অববেচনার কাজ হবে। দেবতাদের দ্বারা নেই, তাঁদের মৃত্যুও নেই। এই জরাজীর্ণ (অজীর্ণ) এবং মরণ রহিত (অমৃত) দেবগণের সান্নিধ্যে আসতে পারা চরম সৌভাগ্যের সূচক। নচিকেতা এই সৌভাগ্য লাভ করেও অধ্যয় পুত্রের দ্বারা তাকে হেলার হালাতে চান না। ১। অস্তরিক-বাসী ও স্বর্গবাসী জীব মানুষের থেকে উন্নত কিন্তু মানুষ বাস করে ঐ লোকদ্বয়ের নীচে (অধঃ) পৃথিবীতে (কু)। কৃষ্ণ বা পৃথিবীতে বাস করে এমন মানুষ স্বর্গলোকে তথা অস্তরিকের থেকে নীচে বাস করার অনেক নিকৃষ্ট কল ভোগ করে। এই কথার অর্থঃ পৃথিবীলোকস্থিত মানুষ মৃত্যু-জরাস্থিত-ব্যাদি প্রভৃতি দুঃখের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েও এবং ভাগ্যবলে দেবতাদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেও সংকীর্ণ নগণ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তার কাম্য

হওয়া উচিত এমনই উত্তম কোনও বস্তু যার থেকে তার দুঃখের অবসান হবে। যার বিবেকশক্তি জাগ্রত হয় নি তিনি হয়তো ভোগ্য বস্তুসমূহের আপাতস্বমীয়াতার দ্বারা আকৃষ্ট তথা মুগ্ধ হতে পারেন কিন্তু বিবেচক ব্যক্তি এই বস্তুগুলি বর্ণ বা চাকচিক্য দর্শনে মুগ্ধ হন না, তেমনই স্ত্রী পুরুষ সংসর্গজনিত মত্তি তাঁকে আকৃষ্ট করে না এবং তজ্জনিত প্রমোদ বা আনন্দের বশবর্তী হয়ে নিজে থেকে বিনাশের পথে পরিচালিত করেন না। তিনি বুঝতে সমর্থ হন যে, এই সব আকর্ষণীয় ভোগ্যবস্তু নিতান্ত অস্থির এবং এর থেকে চিরন্তন আনন্দ ও শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকেই প্রকাশ করার জন্য নচিকেতা বলেন যে, ইহ জগতের ভোগ্য পদার্থসমূহে যে বর্ণ-ব্রতি-প্রমোদ রয়েছে তার থেকে বেশী তো আর এইগুলির থেকে পাওয়া যাবে না এবং চরম আনন্দ-তৃপ্তি তো আর এর থেকে কোন-ক্রমেই লাভ হবে না। সুতরাং কে আর (অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি আর) দীর্ঘজীবন লাভের জন্য লালসিত হবে এবং তা প্রার্থনা করে একটি বহুমূল্য বস্তুকে নামানু প্রার্থনার দ্বারা অনাগসে ব্যরিত করে ফেলবে? প্রলোভন কাছের দ্বারা নচিকেতা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনও বিবেচক ব্যক্তি এই ভাবে সুযোগের অপব্যবহার করবেন না। নচিকেতা একজন বিবেচক ব্যক্তি হওয়ায় তিনিও এমন প্রস্তাবে সম্মত নন—এই তাৎপর্য অবশ্যই বুঝতে পারা যায়। ২।

শ্রুতির 'বর্ণব্রতিপ্রমোদান্' শব্দটির ব্যাখ্যায় কিছু মতভেদ

(১) “উৎকৃষ্ট পুরুষার্ধলাভে সম্ভবতি অধ্যয়ঃ কাম্যমানো মূর্খ এবাহং শ্রাম্। ততোহপি মম স এব বরঃ।” (আনন্দগিতি)

(২) “ইহভা প্রবেক্ষেনোক্তস্ত প্রয়োজনমাহ—তন্মাদিতি যস্মাদ্ভং বিবেকাদিমান্ তন্মাদিতার্থঃ।” (গোপালেন্দ্র যতীশ্বর)

আছে। প্রথমোপস্থিত অর্থটি এখনই উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষ্কর্য শব্দরচাৰ্ঘ্য এর সম্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলেও অঙ্গরঃ প্রমোদান্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ বলায় কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। অঙ্গরাদেব গাত্রবর্ণ, চাকটিক্য, লালিত্য লোককে আকৃষ্ট করে। তাদের সঙ্গে রতিক্রিয়ার বহু পুরুষই আনন্দ হন এবং তাদের রতির দ্বারা প্রমোদ বা আনন্দ লাভের ক্ষমতা ব্যাকুল হন। এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে পূর্ব অঙ্কচ্ছেদ উল্লিখিত প্রথমোপস্থিত অর্থের সঙ্গে কোনও ভেদ হয় না। আনন্দগিরি তাঁর টীকায় এই অংশের কোনও ব্যাখ্যা দেন নি। গোপালেন্দ্র বতীকর ‘বর্ণ’ শব্দের অর্থ বলেছেন—গীতি, তাঁর মতে ‘রতি’ অর্থাৎ ক্রীড়া এবং ‘প্রমোদ’ অর্থাৎ রতিজন্য সুখ। এদের উৎপত্তি আছে। হিত আছে ঠিকই কিন্তু এদের দ্রুত বিনাশের কথা চিন্তা করেই বিবেচক ব্যক্তি এর দ্বারা আকৃষ্ট হবেন না এবং দীর্ঘ-জীবন লাভে আগ্রহী হবেন না—এইভাবেই গোপালেন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন। ৩ ‘বর্ণ’ শব্দের অর্থ গীতি বা গান। অথবা কোষে কোষকার অমরসিংহ বর্ণ-শব্দের অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, শুক্লাদি বর্ণ, স্ততি অক্ষর এই চারটি। ৪ টীকাকার ক্ষীরবানী আরও অতিরিক্ত অর্থ বলেছেন—আবরণ যড়জাদিগত (সা-রে-গা-মা) তাল-বিশেষ ইত্যাদি। ৫ গোপালেন্দ্রের অর্থের সঙ্গতি ভালভাবে থাকে যদি বর্ণ-শব্দের অর্থ ধরা হয়—স্বতন্ত্রাঙ্ক গান যেহেতু মাছুষ স্ততিগানে বা প্রাণসাম্প্রক কাব্যমুহে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ৬

এই মন্ত্রে “কথঃস্থঃ” অংশের অন্ত একটি পাঠ আছে বলে ভাষ্কর্য শব্দরচাৰ্ঘ্য উল্লিখিত করেছেন—“ক তদাহঃ”। (৭) যমরাজ নটিকেতাকে ১১১২৩ থেকে ১১১২৫ মন্ত্রে পূজাদি বহু প্রলোভন দেখিয়েছেন যাতে নটিকেতা আত্মত্যাগ লাভের প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন। নটিকেতাও ১১১২৬ থেকে ১১১২৮ পর্যন্ত তিনটি মন্ত্রে ঐ প্রলোভনের বস্তুরাজি অশ্রয়তা দেখিয়ে চলেছেন। তিনি পূজাদি বস্তুর বস্ত্রদ্বারা বৃত্তে পেরেছেন এবং অধিকতর ফলভ তথা উন্নতমানের দার্ঘ্যের সন্ধান পেয়েছেন তিনি কোনও ভাবে আর ঐ

অসার বস্তুর প্রতি আত্মবান্ হন না অর্থাৎ তদাহঃ (তাহাতে আত্ম বাহার) হন না। এই স্থলেও যমরাজ বা কাহুর দ্বারা অর্থের বৈপরীত্য বোঝানো হয়েছে। ক অর্থাৎ কোথায়। ‘ক তদাহঃ’ অর্থাৎ কোথায় আর ঐ সব পদার্থে আত্মবান্ হবেন? এর তাৎপৰ্য—উন্নততত্ত্বের সন্ধান-প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সব পূজাদি পদার্থে আত্মবান্ হবেন না। নটিকেতা নিজে সেই আত্ম-তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন বলে তিনিও আর পূজাদি প্রলোভনে প্রলোভিত হন নি, এ কথাই যমরাজকে তিনি বলেছেন।

এই পাঠ ও পূর্বপাঠের মধ্যে তাৎপৰ্যতঃ কোনও ভেদ নেই। এই পাঠ ধরলে এই মন্ত্রটি ৪৪ অক্ষরের হয় অর্থাৎ অর্থাৎ ত্রিষ্টুপছন্দক হয়। আর ‘কথঃস্থঃ’ পাঠ গ্রহণ করলে ত্রিষ্টুপ থেকে এক অক্ষর কম অর্থাৎ ৪৩ অক্ষর হয়। তেমন

(৩) “বর্ণো গীতিঃ রতিঃ ক্রীড়া, প্রমোদস্তজ্জং সুখং নিরুপমং যথাবহুৎপত্তিস্থিতিনাশৈবীচায়মিচ্ছামঃ।” (তত্রৈব

(৪) “বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ বর্ণং তু বাহুস্বরে।”

(অমরকোষ ৩.৩ ৪৮)

(৫) “বর্ণোতি ত্রিযতে বা, বর্ণ্যতে বর্ণনং বা বর্ণঃ।

যড়জাদিগতো তালবিশেষে গুণবশোবিলেপনব্রহ্মচর্যেণপি।”

(ক্ষীরবানী, তত্রৈব)

(৬) রঙ্গরামাচুজ ‘বর্ণ’ শব্দের দ্বারা আদিত্যভূলা উচ্ছল বর্ণ বুলিয়েছেন। ‘রতিপ্রমোদ’ বলতে ব্রহ্মভোগাদি-জনিত আনন্দবিশেষকে বুলিয়েছেন। এই ভাষ্কর্য দেখে যেন হয় যে, ভাষ্কর্য বর্ণ, রতি, প্রমোদ এই তিনটি একককে না বুলিয়ে বর্ণমুহ ও রতিপ্রমোদমুহ এই দুটির সম্মান স্বীকার করেছেন। “বর্ণা আদিত্যবর্ণদ্বাদ্বিরূপরিণেবাঃ। রতি-প্রমোদা ব্রহ্মভোগাদিজনিতানন্দবিশেষাত্তান্ সর্বান অভি-ধ্যয়ন্ নিপুণতয়া নিরুপমং।...” (রঙ্গরামাচুজ)

(৭) রঙ্গরামাচুজ একটাই পাঠ স্বীকার করেছেন এবং তা হল ‘ক তদাহঃ’। সংশ্লিষ্ট অংশের রঙ্গরামাচুজকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হচ্ছে—“প্রজ্ঞানং বিবেকী, জরামরণোপপ্লুতোহং জনসদাম্বো জরামরণাঢ্যাপপ্লুতাপ্তঃ প্রভৃতি বিষয়বিষয়কা-হাবান্ ক কথং ভবেদিত্যর্থঃ।”

ছন্দকে নিচুং জিহ্বপূ বলা হয়। তবে যদি 'ক' পদটি ভেঙে 'কু অ' উচ্চারণ করা হয় তবে অবিকৃত জিহ্বপূ, (৪৪ অক্ষরের) হয়।

যশ্মিন্দিং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো।

যৎ সাম্পর্য্যে মহতি ক্রহি নন্তং।

যোহয়ং বরো গুত্মমুপ্রবিষ্টো

নাত্তং তস্মাচ্চিকিত্তা বৃণীতে। (১।১।২৩)

অবয়ব—(হে) মৃত্যো, যশ্মিন্ (প্রেতে) (জনাঃ) ইদং বিচিকিৎসন্তি মহতি সাম্পর্য্যে যৎ (নির্বয়জ্ঞানং) তৎ নঃ ক্রহি; যঃ অয়ং বরঃ গুত্মমু অহুপ্রবিষ্টঃ তস্মাদ্ অন্তঃ নচিকিত্তাঃ ন বৃণীতে।

শব্দার্থ—হে মৃত্যো (হে বস) যশ্মিন্ [প্রেতে] (যে মৃতলোকের বিষয়ে) [জনাঃ] (লোকেরা) ইদং (এইরূপ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দেহ পোষণ করে) মহতি (মহৎ ফল সম্পাদক) সাম্পর্য্যে (মোক্শের বিষয়ে) যৎ (যে) [নির্বয় জ্ঞানম্] (নিষ্কর জ্ঞান) তৎ (তা) নঃ (আমাকে) ক্রহি (বলুন)। অয়ং যঃ বরঃ (এই যে বর) গুত্মমু অহুপ্রবিষ্টঃ (গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে) তস্মাৎ অন্তঃ (তার থেকে অন্তঃ) নচিকিত্তাঃ (নচিকিত্তা) ন বৃণীতে (বররূপে প্রার্থনা করে না)। সাম্পর্য্য শব্দের অর্থ পরলোক, সাম্পর্য্য পরলোকসম্বন্ধী। মহতি সাম্পর্য্যে অর্থাৎ মহৎ পরলোকসম্বন্ধী অবস্থার অর্থাৎ বিদেহমুক্তিতে। [বিভূতির অস্ত্র তাৎপর্ষ্য্য প্রত্যয়।]

অনুবাদ—হে বসরাজ, (মৃতলোকের বিষয়ে লোকেরা) এই যে সন্দেহ করে, মহাকালের জনক মোক্ষের বিষয়ে যে নিষ্করজ্ঞান তা আপনি আমাকে বলুন। এই যে বর (বরপ্রার্থিত বিষয়) গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে তা ছাড়া নচিকিত্তা আর অন্তঃ কিছু বররূপে প্রার্থনা করে না।

শাস্ত্রভাষ্য—অতো বিহায়া নিত্যোঃ কামৈঃ প্রলোভনং যমরা প্রার্থিতং যশ্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসন্তং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাতীত্যেবং প্রকারং হে মৃত্যো সাম্পর্য্যে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎ প্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যৎ তৎ ক্রহি কথং মঃ অশ্রুতম্। কিং বহনা,

যোহয়ং প্রকৃত আত্মবিষয়ো বরঃ গুত্মমু গহনং দুর্বিবেচনং প্রাপ্তঃ অনুপ্রবিষ্টঃ তস্মাৎ বরাদ্ অনাম্য অবিবেকিত্তিঃ প্রার্থনীম্ অনিত্যবিষয়ং যৎ নচিকিত্তা ন বৃণীতে মনসাপীতি শ্রুতের্চনমিতি।

তাৎপর্ষ্য—এই মন্ত্রের তাৎপর্ষ্য বৃত্তে হলে প্রথমে 'মহতি সাম্পর্য্যে' অংশের অর্থ বৃত্ত হবে। সাম্পর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হল—সম-পর্য্য-ই-অচ্। সমপূর্বক পরাপূর্বক ই ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দটি নিপ্পন্ন হয়েছে। সম্যকভাবে (সম) পরবর্তিকালে বা দেহপাতের পরে (পর্য্য) গমন (ই ধাতু) যেখানে সেই পরলোকই এই সাম্পর্য্য শব্দের ব্যাচ। সাম্পর্য্য+অণ্ প্রত্যয় বোগ ক'রে সাম্পর্য্য শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ—পরলোকসম্বন্ধী এই 'সাম্পর্য্য' শব্দের বিশেষণরূপে 'মহতি' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মহৎ ফলের সম্পাদক বা সাধক। পরলোকে গমনকারী মানুষের স্থলদেহ বিনষ্ট হয়, সূক্ষ্মশরীরের দ্বারাই পরলোকের ভোগ্যপদার্থের ভোগ সম্পাদিত হয়। পরলোকগামী জীবের স্থলশরীর নষ্ট হয় কিন্তু সূক্ষ্মশরীর এবং অজ্ঞানাত্মক কারণশরীর বিজ্ঞান থাকে। বিদেহ মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষেরও স্থলশরীরের বিনাশ হয় এবং তৎসহ সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরেরও বিনাশ হয়। সুতরাং মোক্ষের সঙ্গে পরলোকের সাদৃশ্য এই যে, উভয় অবস্থাতেই স্থলশরীরের বিনাশ হয়। এই সাদৃশ্য অবলম্বন করেই মোক্ষ বিদেহমুক্তির সম্বন্ধীকে সাম্পর্য্য বলা হয়েছে। তবে স্বর্গলোকসম্বন্ধী ও বিদেহমুক্তিসম্বন্ধী—এই দুই অর্থের ভেদ থাকায় এবং বিদেহমুক্তির উৎকর্ষবশতঃ বিদেহমুক্তিসম্বন্ধী 'মহতি' এই বিশেষণটি যুক্ত করা হয়েছে। বিদেহমুক্তির মহৎপ্রয়োজননিমিত্তঃ এই যে, এই অবস্থার আর কোনভাবেই দুঃখ-সংস্পর্শ থাকে না এবং অনবচ্ছিন্ন অনন্ত আনন্দ লাভ হয়। ঠিক একই প্রক্রিয়ার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কোনোপনিষদের শেষ স্তরে (৪।৩) মোক্ষ অর্থ বৈক্যনয় অস্ত্রই যে শ্রুতিতে 'অনন্ত জ্যেষ্ঠ স্বর্গলোক' বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। শুধু 'স্বর্গলোক' বললে প্রসিদ্ধ পরলোকাত্মক স্বর্গকেই বোঝায় কিন্তু 'অনন্ত স্বর্গে' লোকে

জ্যোত্রে' এইভাবে 'অনন্ত' ও 'জ্যোত্রে' ও এই দুটি বিশেষণ স্বর্গলোক-শব্দের সঙ্গে যুক্ত করার যোক্ত অর্থই বুঝতে পারা যায়। (৮) এখানেও 'মহতি' শব্দটি যুক্ত করার একইভাবে যোক্ত পর্যন্ত অর্থ লাভ হয়।

এই সংগ্রহে নটিকেতা যমকে বলছেন, 'মহাকল সম্পাদক বিদেহমুক্তির স্বরূপ জ্ঞান'। এই বিষয়ে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে। অথচ নটিকেতা ভালভাবেই জ্ঞানেন যে, আত্মার অবদান ঘটে না, পরলোকগমন হয় এবং যোক্তপ্রাপ্তিও হয়। এই জন্যই তিনি সেই 'মহৎ সম্প্রদায়' সম্বন্ধে উপদেশ পেতে চান যমরাজের কাছে নটিকেতার অমুরোধ—আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিন (ক্রিহি নন্তং)। নটিকেতা যমকে বলছেন যে, এই বরের দ্বারা লভ্য কল অত্যন্ত নিগূঢ় এবং তত্ত্বটি গভীরে অন্তর্নিহিত আছে। নটিকেতা আত্মতত্ত্ব বিষয়েই উপদেশ চান এবং অন্ত কোনও প্রাপ্তব্য তাঁর কাছে নিতান্ত তুচ্ছ।

এই সংগ্রহের বিতীরাধটি আর নটিকেতার উক্তি নয়।

শ্রুতি নিজেই এবার স্বেচ্ছায় উপদেশ দান করছেন। এ গহন নিবিড় তত্ত্বটির একমাত্র শ্রুতি উপদেশ দিতে পারেন। তাই উপাখ্যানের শেষে শ্রুতি নিজেই তত্ত্বটির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। নটিকেতা তিনটি সম্বন্ধে প্রলোভন সমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করেছেন। (১।১।২৬-২৮)। তিনি এখন আর অধিক কালক্ষেপ করতে চান না এবং এইজন্য গোজাহাজিভাবে তত্ত্বের উপদেশ পেতে আগ্রহী।

'গুঢ়মহৎপ্রতিষ্ঠাঃ' অংশের আক্ষরিক অর্থ—গভীরে প্রবেশ করে আছে। যে-পদার্থের অনেকটা অন্ত পদার্থের ভিতরে গভীরে ঢুকে থাকে তা সহজে বোঝা যায় না অর্থাৎ দুর্জয়ের হয়। এখানেও ঐ অংশের দ্বারা আত্মার দুর্জয়ের বোঝানো হয়েছে।

(৮) "অনন্তে অপৰ্যন্তে স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মবীত্যন্তং। অনন্ত ইতি বিশেষণায় ত্রিবিষ্টপে, অনন্তশব্দ ঔপচারিকোহপি শ্রাদ্ধাত্ম্য আছে—জ্যোত্রে ইতি। জ্যোত্রে জ্যায়সি সর্বমহত্তরে বায়ানি মুখ্য এব প্রতিষ্ঠিতা।" (কেনোপনিষদ্, ৪।২ পদভাষ্য)

অধ্যাত্ম সাধনায় ভারতবর্ষ

শ্রীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মসাধনা তাহার মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই একান্ততার একটি চিরন্তন ধারাবাহিকতা এখনভাবে প্রবহমান বাহাকে কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি চিরজীবন লাভ করিয়া রহিয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনায় অবশ্য কতকগুলি স্তর আছে যেগুলির মধ্যে উচ্চ আদর্শ বিস্তারিত এবং মানবজীবনগঠনে একান্ত উপযোগী। চিত্রা-চরিত আদর্শের ভিত্তিভূমি এতই কঠিন বাহাকে কোন উপায়েই টানানো সম্ভব নয়। এক কথায়, বৈদিক সভ্যতাই ভারতবর্ষের মূল সম্পদ বাহার প্রাচীনতার বর্তমানেও কোন ক্ষয় পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতভূমির প্রাচীন ঋষিরা শাস্ত্র

তপোবনের আশ্রমিক তরুছায়াতে শুভাসনে বসিয়া উপনিষদের গুরুগম্ভীর অথচ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ মহাবাণীসমূহ মহামিলনময়ে অমূল্যভব করিয়া গিয়াছেন বাহা আজিও অম্লান। কেবলমাত্র ভাবাবেগ দ্বারা তাহা যে প্রচারিত হয় নাই ইহার একমাত্র প্রমাণ—উজ্জল নীল গগনে জ্যোতিষ্কের মত সেই মঙ্গলমূহ মানবজীবনে স্তম্ভ উদ্ভাসিত।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম-চেতনাই অমূল্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বের অন্ত কোন স্থানে এ সম্পদের ভাণ্ডার নাই বাহার দ্বারা জীবকল্যাণ সাধিত হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের

জন্ত নয়, সকলের জন্ত যাবতীয় বস্তু এবং বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সমবর্তনের স্বাভাবিক ব্যবস্থার কথা ধর্মবাক্যে বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে অর্থাৎ উদারনীতি এমনভাবে রচিত যাহা সমস্ত সংকীর্ণ নীতির উর্ধ্বে।

অধ্যাত্ম-চেতনা ধর্মীয় নীতির প্রধান অঙ্গ। ধর্ম এখন একটি স্থির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বাহ্য দ্বারা বা সহাবে মানব-জীবন ফুলে ফলে পল্লবিত হইয়া পরস্পরকে আপন সবার সঙ্গে আত্মিক সংস্কৃতি স্থাপন করিতে পারে। কেননা, ধর্মীয় অহংসাননীতি কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়, আত্মিক উন্নতিতে, সামাজিক শ্রমবিচারের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম ধর্ম। সম্প্রদায়গত ধর্মে দলগত বিভেদ-সৃষ্টি হইলে সামাজিক শ্রম-নীতির অগ্নি ঘটিবেই—একথাও কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। সম্প্রদায়ভিত্তিক তথাকথিত ধর্ম উন্নত দৃষ্টির পরিচয় না দিয়া ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও পক্ষসুখ হয়। ইহার মধ্যে সংরক্ষণ নীতির প্রশ্ন আসিয়া ক্রমশঃ সনাতন নীতির উর্ধ্বে আসন বিছাইয়া বসিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সম্প্রদায় বা সংরক্ষণ নীতি যে কোন মতেই ধর্ম আখ্যায় ভূষিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় ঋষিগুরুদণ্ড নানা বৈদিকমন্ত্রে তাহা বারংবার উচ্চারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ক্রমশঃ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং নিকট বা অদূর ভবিষ্যতে তাহা ঘটয়া যাইবেই। নতুন নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি আসিয়া পবিত্রতাপূর্ণ নীতির উপর প্রভাবের দ্বারা আবৃত করিবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের 'নিত্য-নৈমিত্তিক' উৎপাতে উপর অংশের কিছু কিছু বস্তু বা বিষয়ের ক্রম পরিবর্তন ঘটয়া যাইবে এবং বাহ্য ফলস্বরূপ জনজীবনের মানসপটে নৈতিক আচার-ব্যবহারের অবিরাম এমন একটা অবনতি চাপ সৃষ্টি করিবে যাহাকে কোনক্রমেই সার্বিক ওদ্বিতির লক্ষণ আখ্যায় ভূষিত করা যাইবে না। কিন্তু একদিন না একদিন পলি সরিয়া যাইবে এবং পূর্ণ পবিত্রতার আসল রূপটি প্রকাশ হইয়া চিরন্তন নীতির সনাতন ধারাটি অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র মত পুনর্বার দৃষ্টিপথে উদ্ভিত হইবে।

হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম। ইহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ, এই ধর্ম বেদভিত্তিক। বৈদিক আচার-ব্যবহার অচ্যুতান একটি বিশেষ সামাজিক অহংসানের দ্বারা প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত বাহ্য প্রতীতি পদক্ষেপ বৈজ্ঞানিক বা বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অত্যন্ত স্বচ্ছ সরল এবং সমযোচিত। হিন্দুধর্ম যে সাম্প্রদায়িক বা কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম নয় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতির পদচিহ্ন পড়িয়াছে এবং তাহাদের ধর্মচরণ সম্প্রদায়গত ভাবে অবাদে প্রবেশলাভ করিয়া হিন্দু বা সনাতনধর্মকে সংকীর্ণ নীতি, সংরক্ষণপুট, পৌত্তলিক, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, অহংমত ইত্যাদি আখ্যায় কলুষিত করিয়া আপনাদের সংকীর্ণ নীতির পতাকাকে আধিপত্যের সর্বোচ্চ শিখরে উড়াইবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাহাদের স্বাধীন কর্মপদ্ধতি যে ফলপ্রসূ হয় নাই বা ভবিষ্যতেও হইবে না সমগ্র মানবজাতি সমক্ষে হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল অগ্নি নিঃসৃত জ্যোতির্ভি তাহার একমাত্র প্রমাণ।

ভারতবর্ষীয় মানব জীবনধারায় বেদ ও উপনিষদের প্রভাবরাশি প্রায়শঃ সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে বিরাজিত। এইটি একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মকর্মাধি যে ভাবধারা অবলম্বনে পরিচালিত হয় তাহার মূল কারণ বা বিষয় হইতেছে বেদ ও উপনিষদ। ইহাই সর্বত্র সত্য যে, যিনি বেদকে অস্বীকার করিয়া চলিবার চেষ্টায় সদা-সর্বদা উন্মুখ—তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী বলিয়া জগৎ সমক্ষে পরিচিত হইতে পারেন না।

এই প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপটি তুলিয়া ধরা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব, দেশ-বিদেশে, কাল বিশেষে বা পাত্র বিশেষে আবদ্ধ নহে। সর্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। অলৌকিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক কিংবা পরিমাণে অস্বদেশীয় ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকে ও বিদেশীয় ধর্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম

সম্পূর্ণ ও অধিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্থজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ বেদ-নামধের চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী সমগ্র জগতের পূজার্য এবং আর্থ বা পাশ্চাত্য সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রামাণ্যত্ব। 'আমরা দেখি, স্বামী বিবেকানন্দের পর আবির্ভূত স্বামী প্রণবানন্দজীও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতি-গঠনে বৈদিক ধর্ম ও সদাচারকে প্রোদ্রাব্য দিয়াছেন।

বেদ শব্দটি জ্ঞানের চিহ্ন স্বরূপ। বিদ্যাত্মক হইতে ইহা নিপন্ন। হইয়াছে। তাই বেদ অনাদি অনন্ত। এ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত :—‘ধর্মশাসনে এই বেদই’ একমাত্র সক্ষম। পুণ্যাগাদি অস্ত্রান্ত পুস্তক স্মৃতি-পদবাচ্য এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অমূল্য করিবে, সেই পর্যন্ত। ‘সত্য’ দুই প্রকার—(১) বাহ্য মানব-সাধারণ পক্ষে প্রযোজ্য ও তদুপস্থাপিত অমূল্যমানের দ্বারা গৃহীত। (২) বাহ্য অতীন্দ্রিয় স্মরণযোগ্য, শক্তি গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সঙ্কলিত জ্ঞানকে ‘বেদ’ বলা যায়।

‘মন্ত্র’ শব্দের অর্থ যাক্দের মতে—‘বাহ্য দ্বারা মনন করা যায় তাহার নাম মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাং (৭।৩।৬)। জৈমিনী ‘মন্ত্র’ শব্দ সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ‘অভিযুক্তেরা বাহ্যকে মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন তাহাই মন্ত্র।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে এবং বিশেষতঃ স্বদেশীয়ের ধর্মীয় অপব্যবহার অতীত শাস্ত্রসমূহকে অপাক্ষেপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ, শাস্ত্রব্যবহার মূল্যহীন। সামাজিক জ্ঞান-নীতিকে কোন নূতন পথের সন্ধান দিতে তাহা অপারগ। অতীত আধুনিক দৃষ্টিবিচারে ‘শাস্ত্র’ ব্যাপারটি অপ্রচলিত। কিন্তু এ-কথা নিঃসন্দেহে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা যায় যে, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি-ভূমি হইতেছে হৃদয়রূপে ঈশ্বরে আত্মরিক বিশ্বাস। তাহার কলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই ভারতবর্ষের মানুষেরা সকল সম্প্রদায়গত ধর্ম এবং মানুষদের বিশেষ মর্যাদার ভূষিত করেন। সকলেই বদ্ধ। সকলেই পরম পিতার সন্তান। বিনি যে রূপ বা ভাবেই উপাসনা করুন না কেন তাহার দ্বারাই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। হিন্দুধর্মের এই

মহৎ বাণী ভারতীয় সাধনায় উজ্জল দৃষ্টান্ত। হিন্দুয় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মর্মসুধান অথবা অধ্যাত্ম চিন্তার দ্বারাদ্বার বিশ্বাসী নহেন। কেবলমাত্র তাঁহারা এই অজ্ঞতাবশতঃ হিন্দুধর্মের অপব্যবহার করেন।

তাই প্রাথমিকভাবে একটা সুস্পষ্ট আকৃতি সামাজিক কার্যপ্রণালীতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। নিরীশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরবিশ্বাসীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একদল মানবকল্যাণের নিমিত্ত এক বিশেষগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করি লিপ্ত। ভোগের মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের সম্ভাব্যতা। কল্যাণের পরিবর্তে রক্তশ্রোতের প্রাবন—তথ্য-নিষ্ঠ ইতিহাসে তাহার সভ্যতা ক্রমশঃ সাক্ষ্য দিয়া চলিয়াছে। অপরদিকে ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা মানবকল্যাণকামী। তাহারা সকলেই সমানভাবে সকলকে আপন করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট শত্রু-মিত্র বলিয়া কিছু নাই। ভারতীয় সাধনায় মিত্রতার মধ্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সাম্য-নীতির আদর্শ হিতকর এবং বাঞ্ছনীয়।

ভোগবাদে বাহ্য বিশ্বাসী তাহাদের কামনা-বাসনার কখনই নিবৃত্তি হয় না। তাই তাহারা পরস্পরকে বঞ্চিত করিবার জন্য সদা-সর্বদা উন্মুখ থাকে। কেননা, পাপপুণ্য, আদর্শ নীতিবোধহীনরাই ত্যাগের পরিবর্তে ভোগ্যবস্তুর সন্ধানে অবিরাম ছুটিয়া বেড়াইতে অধিকমাত্রায় ভালবাসে। ভোগ এবং সাম্যতাব উভয় আদর্শই পরস্পর বিরোধী।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, ত্যাগই পরম শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। ত্যাগই মানব-জাতিতে প্রকৃত মহত্বের আসনে বসাইয়া তাহার মহত্বকে উজ্জল করে। প্রবল ইচ্ছা-পরায়ণ ব্যক্তি তাহার সহজাত ভোগ প্রবৃত্তি লইয়াই জয়লাভ করে। অতএব এই প্রবৃত্তি স্বীকারপূর্বক প্রাচীনরা বলিয়াছেন, ‘প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাকলা।’ হিন্দুধর্মের সার্বিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ত্যাগের গোপন চিত্রটি সুপ্রতিষ্ঠিত। উদরপুতির জন্য বস্তুতঃ ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন ততটুকুই তাহার অধিকার। ইহার অধিক বাহ্যিক অধিকার করিতে আগ্রহী বা করিয়া বলিয়াছে তাহারা চৌর্ধ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত মানব সমাজকে কলুষিত করিতেছে, অতএব সর্বপ্রায়ে

দণ্ডনীয়। এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন,
'অধিকং বোহিত্তিমস্তেভ স শ্বেনো দণ্ডযহতি।' ভাগবত—
৭।৪৮।

প্রাচীন ভারতবর্ষ অখণ্ডনীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু
বর্তমান ভারতবর্ষ খণ্ডনীতি লইয়াই পথ চলিতে ব্যস্ত।
বর্তমান ভারতবর্ষ তাহার অতীত গৌরবকে হারাষ্টয়া
ফেলিয়াছে। বিদেশীর আক্রমণে বার বার পৃথুদন্ত হইয়া
অবিন্ধা, অনিত্য বস্তুকেই বিত্তা, নিত্যবস্তু বলিয়া আঁকড়াইয়া
ধরিবার মন আবাদন করিতে করিতে তাহাতেই ভোগী সুখী
হইতে অভ্যস্ত হইতে চাহে। কিন্তু সে মন যে অতিশয়
ভিত্তি ইহা অসুস্থ করিয়াও তাহার ত্যাগ করিবার
মানসিকতাও বিসর্জন দিয়াছে।

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মসাধনায় গীঠস্থান। তাই শাস্ত্র-
বিহিত ধর্মসাধনায় এখানে 'যত মন্ত ততপথের' উদ্যোগতা।
একনিষ্ঠ সাধক মূল লক্ষ্যের দিকে আপনায় সাধনায় ত্রুতী
ধাকিয়া অগ্রণর হইতে পারিবে। ইহাতে কাহারও কোন
বাধা নাই। হিন্দুজাতির আদর্শ মূলতঃ আধ্যাত্মিকতা। হিন্দু
জাতীর সাহিত্য বলিতে শ্ববি, তপস্বী, আচার্য ইত্যাদি সাধক
শ্রেণীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে সত্যতাব-আদর্শ-প্রকটিত
হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে সাহিত্যের
সৃষ্টি হয়। সেই সাহিত্য আজিও বিদ্যমান। শতাব্দীর পর
শতাব্দী ধরিয়া সকল মানবজীবনকে ঘিরিয়া তাহা শক্তি,
প্রেরণা শাস্তিদান করিতেছে। প্রকৃত সাহিত্যের
প্রয়োজনীয়তা জাতির চরিত্রগঠন। সেই সাহিত্য জাতীয়
সাহিত্য আখ্যায় তখনই জ্বলিত হইবে যখনই তাহা উচ্চ
হইতে নিম্নতম সকল শ্রেণীর মানবদের জীবনাদর্শ, শক্তি,
প্রেরণা তথা সর্বোপরি পরম শান্তি দান করিবে।

বিশ্বাতীত বিদেশী অধ্যাপক মোক্ষমূলার সারা জীবন
বৈদিক চর্চা করিয়াছিলেন। ভাণ্ডতর্কণী হিন্দুজাতির প্রতি
তাঁহার শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার
জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করেন নাই। স্বামী
বিবেকানন্দের সহিত লণ্ডনে সাক্ষাৎকালে তিনি অপরিণাম
শ্রদ্ধায় ভারতীয় হিন্দুজাতির প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে

উচ্চমন্ত পোষণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী সেই জ্ঞানবৃত্ত
তপস্বীকে স্বচক্ষে সেই প্রাচীনতম দেশ দর্শন করিবার
আহ্বান করাত্তে তিন গভীর আনন্দের আবেগে বাহা
উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই যে, বৈদিক চর্চার
মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া তিনি যে ভারতবর্ষের শাস্ত্র সুনিবিড়
ছায়াঘন আশ্রমিক প্রতিকৃতি হৃদয় ভাবে হৃদয়মাঝে অঙ্কিত
করিয়াছেন, বর্তমান ভারতবর্ষ তথা হিন্দুজাতির অধঃপতনের
দৃষ্ট দর্শনে তিনি নিদারুণ বেদনা অসুভব করিবেন।

ভারতীয় শাস্ত্র ত্যাগধর্মের কথা বারংবার আবৃত্তি করি-
য়াছেন, বাহার মধ্যে শাস্ত্রের মহান আদর্শ বিরাজমান।
'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।' 'ত্যাগেনৈকমমুখ্যমানশ্চ—ত্যাগেন
জুজীথাঃ।' হৃদয় মন-প্রাণ-মুখ এক করিবার অভ্যাস
করিলে তবেই ত্যাগ করা বোঝায়। হিন্দুধর্মের মধ্যে
বাহা কিছু উন্নত ভাব রহিয়াছে তাহার একবিন্দুও আমাদের
উপলব্ধির মধ্যে আসে না। বৈদিক ধর্মকে আমরা কেহই
বুঝিতে পারি না। কারণ তাহার ভাষা প্রচলিত সংস্কৃত
ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বেদান্তের তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়া বৈদিক-
ধর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাই ভাগবতধর্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠির,
অনুশ্রবর বৈদিক ধর্মের মধ্য রাজসূয়, অশ্বমেধ, সর্পধ্বজ করিয়া
ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কামনামূলক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ
করিয়া নিকাম-ভাবে বিশ্বসংসারের সর্বকর্মে আত্মনিয়োগ
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহারাম্।'।
অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব গুহার নিহিত। আরণ্যক পরিবেশের রহস্যবিজ্ঞা
রূপে বাহা প্রচারিত ছিল মুষ্টিমের মানুষদের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব
সাধারণের অধিকারে তাহা আনয়ন করিয়া ঔপনিষদিক ধর্মকে
বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া ভারতবর্ষ
তথা বিশ্ববাসীর জীবনে নূতন চিন্তাধারার স্রোত বহাইয়া
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাত্মসে হিন্দু বৈদিক ধর্মের সমস্ত কিছু
গ্রহণ করিয়া এক মহা সমস্তর সাধন ঘটাইলেন। বিদ্যুতভাবে
সমালোচনা করিয়া তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিলেন
তৈত্তির্য্য বিষয়া বেদা নিঃস্রগুণো ভবাক্ষুণ—'অর্থাৎ বৈদিক
ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে ত্রিগুণের—সত্ত্ব, রজঃ, তমের
বিষয় রহিয়াছে বাহা 'স্বারা স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে। তা'

জন্ম জিওপের উর্ধ্বে যাইয়া ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে তিনি নানাবিধ যজ্ঞের কথা প্রকারান্তরে গীতামুখে আলোচনা করিলেন। যথা—ঋতযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, আধ্যাত্ম-যজ্ঞ—যাহা না করিলে ধর্ম-কর্ম দ্বারা আদৃত মানবজীবন ধারণ বুধা হয়। যজ্ঞ—সর্বসাধারণের কল্যাণের নিবিস্ত। যেমন—যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্ত্র, শস্ত্র হইতে সর্ব-প্রাণীর দেহস্থষ্টি এবং রক্ষার উপায়। ‘ভূত্বতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।’ কেবলমাত্র আপনার জন্ম ঋত্ব পাক পাপান্ন ভোজনেরই নামান্তর।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার আর একটি দিক পরিলক্ষিত হয়, ‘ভূমৈব সুখং নাহ্নে সুখমস্তি।’ অর্থাৎ ভূয়া বা বৃহত্তের আশ্বাসনই প্রকৃত সুখ-শান্তি-পরমানন্দ। ক্ষুদ্রতার মধ্যে থাকিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র চিন্তায় আত্মোনিয়োগ করিলে মন ক্ষুদ্র হয়। পরমেশ্বর বাহ্যেব যিনি তিনি সমস্ত জগতে বাস করিতেছেন এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বাস করিতেছে। ‘যুঁবেব ধর্মশীলঃ স্ত্রাৎ।’ বালককালেই ধর্মশান্তির জন্ম তৎপর হওয়া, মহত্ত্বজীবনের কর্তব্য। ধর্ম বাহিরের কোন বিষয় নয়, পরন্তু উহা আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত অতি গোপনীয় বিষয়। ধর্ম বস্তু চৈতন্যরূপ। ভারতের সনাতন আদর্শ হইতেছে ত্যাগ, সেবা, ব্রহ্মচর্য। জ্ঞান-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলপ্রাণীর একমাত্র কল্যাণের পথ। স্বামী প্রববানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—“জড়-

বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে, এ দেশ সে দেশ নয়। এ দেশ চার নীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।”

হিন্দুধর্মে দীর্ঘকালের ইতিহাসে বারংবার বিভিন্নকালে একই মন্ত্রগাণি ঋষিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ধর্মের লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মহাসংহিতায় বল হইয়াছে যে, প্রধান দশটি ধর্মাদর্শের যথা—ত্যাগ, ক্ষমা, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, নিঃস্বার্থভাব, জ্ঞান, জ্যোতির্ময়তা, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বোপরি মানবপ্রেম—ইহা একমাত্র সনাতন বৈদিকধর্মের মাধ্যমেই একদা সংঘটিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার এইরূপ জ্যোতির্ময় চির সত্যকে স্বীকৃ-নাথের বাণীতে, ‘I felt at last that I found my Religion—the Religion of Man.’

সত্যদর্শন এবং অধ্যাত্ম অমৃতভূতির সার্বিক অর্থতা ভাবযুক্তি মহামানবের মিলন-তীর্থ ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের গভীর আরণ্যক শান্তগভীর পরিবেশে ঋগ্বেদের সেই সাম্যগীতি—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী

সমানং মনঃ সহ চিন্তা যোনাং।

সমানং মন্ত্রমন্তি মন্ত্রয়ে বং

সমানেন বো হবিষা জুহোমি।

সমনানী ব আকৃতিঃ সমানী

হৃদয়ানি বং।

সমানমন্ত বো মনো যথা

বং সুসহাসতি ॥ (১০।১২১, ৩, ৪)

জীবনের সার

শ্রীমিহির কুমার চট্টোপাধ্যায়

আসবে না ফিরে আর তুর্বার যৌবন.....

ফেলে আসা জীবনের স্বপ্ন-মাখা দিন।

অথর্ব এ বুদ্ধকালে ভাব সারাক্ষণ—

মৃতু তে নীরব হবে জীবনের বীণ।

কি বা আছে এ জীবনে? শুধু দিন যায়.....

ভোগ-সুখ-কামনাতে মত্ত প্রাণিগণ

আমার সংসারে চলে রিপু-তাড়নায়।

জীবনের সারবস্তু বোঝে কয় জন?

অশান্তি-গরলে কেন আপনাকে ক্ষয়,

শান্তির অমৃতবারি নাও প্রিয় শিরে,

আলো পেলে অন্ধকার হয়ে যাবে লয়

মন প্রাণ রাখ যদি ‘প্রণব’ই ঘিরে।

গীতোক্ত কর্মবাদ ও স্বামী আচার্য্য প্রণবানন্দ

শ্রীমোনোমোহন দেবনাথ

শ্রীমদ্ভগবৎগীতার কর্মবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। এই কর্ম
তু বেদোক্ত বাগ-বজ্র বা আচার অহুষ্ঠানেই নয়, সাধারণ
মাহুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাও কর্মসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।
কেহই কর্মব্যতিরেকে একমুহূর্তও বসে থাকতে পারে না;
মাহুষের প্রকৃতিই তাকে কর্মে প্ররোচিত করে 'কার্য্যতে
হৃৎকর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিবৈজ্ঞানৈঃ।' বৈরাগ্যের নামে,
ত্যাগের নামে কর্মবিশুবীনতা মূলতঃ আলস্যের নামান্তর।
সন্ন্যাসী ও ত্যাগীদের কোন কর্ম নেই এটি ভ্রান্তমতবাদ।
কর্মহীন হ'য়ে মাহুষ ক্রীত ও কাপুরুষের পর্যায়ে
অবনতি হয়ে গেছে। আমরা যে কর্ম করি তা নিছক
নিজ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে; কিন্তু এই সীমাবদ্ধ
কর্মসূচী ব্যক্তি বিশেষের পার্থিব স্বর্থ-তৃপ্তির সহায়ক
হলেও আত্মার সম্বোধনের ক্ষেত্রে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।
সমষ্টি বা মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণার্থে এই
আত্মস্বার্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই প্রেম-প্রীতির
অহুশীলনের মাধ্যমে চিন্তের প্রসার ও ঔদার্য্যের
বাস্তাবরণেই মহুশ্বের উদ্বোধনে ঘটতে পারে। সম্বৎসর
আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ সন্ন্যাসী ও ত্যাগীদের অগ্রাণ্ড
কর্মকাণ্ডের অহুশীলনকে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য
করেছেন। তবে তাঁর প্রবর্তিত কর্মচক্র শ্রীকৃষ্ণ-কথিত
নিকাম কর্মবোধের নবরূপায়ণ। কর্তৃত্বাভিমান ও ফলা-
কাজ্ঞা বর্জন ব্যতীত কখনও কর্ম যোগে পরিণত হয় না।
সম্বৎসর বিচিত্র সেবাকর্মের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিধাতার নিখিল
কর্মবৈচিত্র্যের সাথে সামঞ্জস্যীকৃত প্রণবানন্দ প্রবর্তিত কর্মচক্র
ভূবনবঙ্গল ও কল্যাণপ্রদ। কামিনী-কাকন ত্যাগী সন্ন্যাসীকে
তিনি দিয়েছেন স্বকঠোর কর্মের দায়িত্ব। এই কর্ম গীতার
উপদিষ্ট নৈকর্য্যনিষ্ঠির নির্ধারিত পথ, কারণ তা দ্বারা
সমর্পিত কর্তব্য বোধে সম্পাদিত। নিজ মূর্ত্তিকে উপেক্ষা
না করেও সন্ন্যাসীকে 'জগজ্জিভার' কর্মের অহুষ্ঠান করতে
হবে।

আচার্য্য প্রণবানন্দ অমেষ তপঃশক্তির অধিকারী হয়েও
হৃৎ-তাপক্লিষ্ট মানবতার সেবাকেই নিকাম সাধনার মর্য্যাদা
দান করেছেন। জটা-কমণ্ডলু নিয়ে নির্জনে ধ্যান জপের
চেয়ে হর্বল অসহায়ের হৃৎযমোচনের প্রচেষ্টাকে প্রাশংসা
করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'সমাহিত চিন্তাই নির্জন
গিতিগুহা। সংসার কোলাহলের মধ্যে যিনি ইন্দ্রিয় বিজয়
এবং সংযমকে অবলম্বন করেছেন, সত্য ও ত্যাগের
অহুশীলনে ব্রতী হয়েছেন, তিনিই চরমপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে
যেতে সক্ষম। সম্বৎসরক সন্ন্যাসিবৃত্ত ত্যাগের স্বমহান
আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে সম্বৎসরপ্রতিষ্ঠাতার নির্দেশকে অক্ষরে
অক্ষরে রূপায়ণ করে চলেছে। এই ত্যাগের অর্থ জগৎ
স্বার্থে আত্মস্বার্থের বিলোপ। আচার্য্যদেব কল্পকর্ত্তে নির্দেশ
দিয়েছিলেন "এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্ত তোমাদেব
সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। হীন ও অন্ত্যজ জাতিকে
কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। এদেশের আলস্য, ঔদাস্য,
নিদ্রা, তন্দ্রা ও ভড়তাকে দূর করিয়া দেশের প্রাণে কর্মশক্তি
জাগাইয়া দিতে হইবে....." আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ
মূলতঃ প্রকৃতই আচার্য্য ছিলেন। যিনি নিজে আচরণ
করে অপরকে শিক্ষা দেন এবং যার নিকট থেকে আত্মতত্ত্ব
বা ধর্মের গূঢ় সমাধান পাওয়া যায় তিনিই 'শাস্ত্র নির্দেশিত
আচার্য্য। 'যশ্রাদ্ধর্ম্মমাচিনোতি আচার্য্য'—(আপত্যস্ত)। গুরু
ও আচার্য্য তাঁর তপঃপুত সাধনজীবন তুলে ধরেন শিষ্যদের
কাছে। সেই সাধন-শক্তিই শিক্ষার্থীর জীবনকে শ্রীমণ্ডিত
করে। পরম কারুণিক গীতাপ্রবক্তা প্রিয় শিষ্যের মোহনাশের
জন্ত কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগের জন্ত নানাভাবে উপদেশ
দিয়েছেন। সন্ন্যাসি-জীবনের কঠোর আদর্শকে অহুশীল
করতে গিয়ে শিষ্যগণও পেয়েছেন আচার্য্যদেবের সম্বৎসর
অহুপ্রেরণা এবং গঠনমূলক পরামর্শ। তাদের শারীরিক
ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ত তাঁর উৎকর্ষার অবধি ছিল
না; সম্বৎসরগীতার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁর যমজাপূর্ণ নির্দেশগুলিতে

তার অস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের ধর্মচক্র ও কর্মচক্র ভারতীয় ধর্মসাধনার এক অভিনব সংযোজন। পূর্বতন আচার্য্যগণ পারমার্থিক তত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মনুষ্য জীবনের ঐহিক দিকটিকে দারুণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন। মাহুকের দুঃখকষ্ট ও নানাবিধ জীবনবহনাকে আচার্য্যদেব অস্বীকার করেন নি বরং উত্তরণের পথ দেখিয়ে ব্যক্তি তথা সমষ্টি জীবনে স্থিতি আনার প্রয়াসেই তাঁর কর্মচক্রের প্রবর্তন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা হাঙ্গামার পীড়িত আর্ন্ত মাহুকের দেবা, তীর্থযাত্রার, তথাকথিত অস্পৃশ্যজনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এই কর্মচক্রের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর সজ্ঞ আত্মও সেই কর্মবহন অব্যাহত রেখেছে। হিন্দুর আদর্শ ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা আচার্য্যদেব হিন্দুদের সংগঠিত করার প্রয়াসে হিন্দু মিলন-মন্দির আন্দোলন প্রবর্তন করেন। গোষ্ঠীধন্দে, বিদীর্ণ শতাব্দী বিভক্ত হিন্দু সমাজের দুর্বলতা তাকে পীড়িত করতো। প্রাচীন গৌরবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি শুনিয়েছেন 'ভারত! তুলিও না, তুমি ঋষির বংশধর। তুলিও না, তোমার ধর্ম ও সমাজ ঋষির হস্তে গঠিত ও অক্ষুণ্ণ। ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য

তোমার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র।' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত মাহুকেই নিকায় কর্মযোগের সার্থক অধিকারী। আসক্তিমুক্ত কর্মই বন্ধন, তাই অর্জুনের প্রতি উপদেশ 'যোগঃ কুরু কর্মার্থি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়' আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের ভাষায় "সব রকম বাসনার নাশ যেখানে, প্রকৃত মুক্তিও যেখানে।" নিকায় কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়—অবশেষে মুক্তি।

অর্জুন তথা পাণ্ডবদের উপলক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অত্যাচার, শোষণ এবং ঈর্ষ্যাভেদের বিলোপ নাহলে চিত্তের দৈজ্ঞ বোচনা। প্রেম ও মঙ্গলের স্পর্শেই কল্যাণের ভ্রতবুদ্ধি জাগ্রত হয়। কিন্তু প্রেম বা কল্যাণের আবাহন কখনও সংগ্রাম ব্যতিরেকে সার্থক হয় না। অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুর সাথে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ত্যাগ, বীর্য্য এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রয়োজন। কৃষ্ণ-ক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠনের স্থিতিশীল পরিকল্পনার সার্থকতা অস্বীকার্য্য হয়। জাতিগঠনের প্রাথমিক শর্ত নিরবচ্ছিন্ন নিকায় কর্মসাধনা যা গীতার উপদিষ্ট কর্মযোগের মূর্তপ্রতীক আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ গীতার মন্ত্রকে রূপায়িত করেছেন তাঁর কর্মচক্রের মাধ্যমে।

অতি নিকটে

শ্রীশ্রুজিত কুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ একদা তদীয় অল্পজুতির পরম বিচারে বলেছিলেন যে, আমরা সেই পরম স্রষ্টাকে ভুলে যেতে চাইলেও তিনি একমুহূর্তের তরে আমাদের ভুলে যেতে চান না, এমন কি ভোলেনও না, তার কারণ কিন্তু একটাই। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আমাদের সৃষ্টিমুহুরে রয়েছে একটা সাধুত্ব-সম্বন্ধ। এই ধাতিরেই জীবলোকের সঙ্গে দেবলোকের এমন পরোক্ষ-আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানেই :তো

বলেছেন, "তোমার মত এমন টানে কেউ তো টানে না। (স্বরবিতান ৫২)।

ভগবানের অস্তিত্ব সর্বভূতে, অতি নিকটে। স্থলে-জলে-বোম্বে-মসাতলে-হলাহলে তিনি প্রকাশিত হন 'নব নব রূপে'। শ্রীমুখের সেই মধুর অমিয় বাণী—

'সমোহং সর্বভূতেষু ন মে ঘোষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

(গীতা ৯.২২)

অর্থাৎ ‘আমি সকল ভূতে সমান ভাবে বিরাজ করি। আমার প্রিয় অপ্রিয় নাই। কিন্তু বাহারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করে তাহারা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করে। আমি স্বভাবতই তাহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের অমুগ্ধাহক হই।’ শ্রীভগবানের এই মহতী পরাকাষ্ঠী অসীম জীবলোকের মহামুক্তির মন্ত্র। প্রকৃতার্থে শ্রীমুখনিঃসৃত দিব্যমুখ্যমণী অমির বাণী সঙ্করনী ‘শ্রীমদগীতা’র প্রতিটি শ্লোকই মুক্তিপ্রদাতৃ মন্ত্র। গীতা মানব জীবনের পরম স্পন্দন।

ফলাকাজ্জরহিত সকল জাগতিক কর্মাদি মহামুক্তির চোতক। কর্ম থেকে চির-মুক্তিই কর্মের উদ্দেশ্য। ধর্মাত্মস্বরূপ বা ধর্মাত্মচরণ কখনই বুদ্ধির ব্যাঘ্রম নয় বলেই তা ক্রমোন্নতি প্রদায় ও উচ্চকোটির বোধিসত্ত্ব আত্মার প্রতিবিম্বিত। বোধকে শ্রীশ্রুত চালিত করেন, তখন শ্রীমাত্ম কৃতকর্মকে জাগতিক স্নায়ু-স্নেহ কালিমাসিক্ত করে না, নতুবা আমরা সেই মহান, আদেশলিপিকে: বাহ্যতঃ শিরোধার্য করে অন্তরে পাপ ও কালিমা স্রাবক কাঙ্ক্ষণ করি যাই। ফলতঃ অনিবার্য দুঃখে আমাদের পতন হয় ও তাঁকে বিশ্বস্ত হই। গীতাতে ভগবান বলেছেন (২।২৭), ‘যাহা অমুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্তা কর—সেই সমস্তই হে কৌন্তেয় সর্বপ্রাণে আমাকে নিবেদন করিবে। কাজেই দেবদত্ত দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন না করিলে ত কখনো পবিত্র হইতে পারে না’ (গীতা ৩।১২)।

এই স্নায়ব সংসারে থেকেও যদি আমাদের কখন জ্ঞানেন্দ্র উন্মোচিত হয় তাহলে দেব বিধের সকল অমু-পরমাণুতেও তাঁর অবস্থান। এখন প্রশ্ন ওঠে—‘দেব সাধন-সাপেক্ষ, না কি সাধনাতীত’? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীতি বলেন—‘স বৃণুতে’—অর্থাৎ তিনিই বরণ করেন। তিনি ‘সর্বভূতাদিবাঃ’ তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কারণ রূপে সর্বপ্রাণে বিরাজিত। সর্বভূতে তদীয় বিকৃতি স্ব-মহিমার বিরাজিত।

জীবলোকের অন্তঃস্থলে তাঁর অবস্থান।

খেতাবতঃোপনিদং (৩।১০) বলেছেন—

‘অদৃষ্টমাতঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সর্বা জনানাং হৃদয়ে সম্মিষিঃ’।

অর্থাৎ ‘যিনি অদৃষ্ট পরিমাণ অথচ পরিপূর্ণরূপে এবং যিনিই অন্তরাত্মারূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তিনি জগৎ সংসারে পরিব্যাপ্ত হ’য়ে আছেন। তাই তিনি বাস্তব ‘স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্ত্যতিষ্ঠদশাঙ্কলম্’ এ জগৎকে অতিক্রম ক’রে অসীম স্বরূপে বিস্তারিত। একান্ত ভক্তের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ‘তুমি আমার অন্তঃস্থলের খবর জানো’। ভক্ত আরো জানে “তুমি হে সর্বদা আমার ” জীবগণের প্রাণস্বরূপ সেই মুক্তাত্মা হৃদয়ে হৃদয়ে বিচাঙ্কমান। -উপনিষদ (২।১।১২) বলেছেন। তিনি অদৃষ্ট পরিমাণ পুরুষ রূপে শরীর মধ্যে অবস্থিত। উপনিষদ সেই হৃদয়পুণ্ডরী-কাক্ষের অবস্থান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য রূপ স্বীকার করেন সর্বগুণস্বরূপ সেই যুগপুরুষোত্তম এই দেহেই বর্তমান—প্রখ্যাত কবির উক্তি “নিকটে দাঁড়ালে আমি, ভুলে যাই হুঃখরাশি”। তিনি যখন আমাদের সম্মুখে স্বরূপে আসেন তখন মনে হয় “আধারের দ্বার খুলে দিলে কে গো প্রভাতে জ্যোতির্ময়”। তখন সর্বজ্ঞান হয় ভাবভালিত, সর্বমহিমা হয় চোতক। সর্গাভ্যর্থী শ্রীভগবান আমাদের সকলের অতি নিকটেই অবস্থিত থেকে জীবলোককে পরম শান্তিলাভার্থে নিয়ন্ত্রণ করেন।

অতি নিকটে থেকে ভগবান আমাদের কর্ণবিবরে শুনিয়েছেন যে, তিনি ব্রহ্ম থেকে কীট পর্যন্ত সকলের হৃদয়ে অবস্থিত (গীতা ১৫।১৫)। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে (১।৩।১১) যে, “স কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ”। অর্থাৎ তিনি জীবকুলের শেষ সীমা ও তিনিই পরম গতি। ভগবান শ্রীমুখে বলেন ‘মুক্তিঃ সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিয়ামি’— অর্থাৎ ‘আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার অমুগ্ধাহে তুমি হৃদয় সংসার ও তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিবে’। সেই স্নায় উদ্ধারক অন্তর্ধানী নারায়ণ সর্বপ্রাণীর অতি নিকটে থেকে সর্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ’য়ে সর্বজীবকে বহ্নারূপ পুস্তলিকার মত সর্বদা চালনা করছেন। জগতের সকল পাপ ও তাপ বিদারক সংসারার্তিনাশক সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক প্রাপ্ত পরমশান্তি ও পরম শাস্ত পদটী জীবের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

ভগবান্ সর্বদা আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি ছাড়া এই জীবজগলের প্রাণবায়ু বন্ধ হ'য়ে যায়। তিনিই প্রাণবায়ু, চতুর্বিংশতিতত্ত্বের লয়ক্ষেত্র। তিনি যুগে যুগে মায়াবতার পুরুষ হ'য়ে কখনো স্বরূপে, কখনো আচার্য রূপে, কখন আদিত্যরূপে প্রকাশিত হন। তিনি সর্বদা আমাদের কাছেই আছেন, কিন্তু মায়াবিমোহিত আমাদের নয়ন তাঁকে চিনেও চিনতে পারে না। তিনি আমাদের রক্ষক ও শাসক হ'য়ে নিকটেই থাকেন ও অস্তরমুদ্রা প্রদান করেন। জীবের আর্তি—‘চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে’। যিনি এই জ্ঞাবা-পৃথিবীতে ভূমারূপে বিরাজিত তিনিই সেই অবিনাশী আত্মা। দৈশোপলিষদ বলেন,

‘দৈশা বাস্তমিহং সর্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’।

এ জগতের সব কিছুতেই তিনি আছেন, তবে বিদ্যাটের মধ্যে, মহতের মধ্যে তাঁর প্রকাশ আরো স্পষ্ট, মহিমময়। তাই গীতোক্ত ধার্মীতে আমরা দেখি, সেই পূর্ণ ব্রহ্ম ঘোষণা করছেন তিনি “সর্বভূতাদিवासঃ”।

এ ময় জগতের সব ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানই পরোক্ষ। পরম অপরোক্ষ সত্য আরো উচ্চ-কোটিতে। তাঁর কাছে উপনীত হবার বা আত্মদর্শনের পথনির্দেশের জন্য চাই শ্রীগুরুপূজা। তাই নিত্য স্মরিত সেই প্রণব-নাদ—“ওঁ গুরু কৃপাহি কেবলম্” ॥ যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর অজ্ঞাস্ত নির্দেশ—“আত্মাহুত্বী ও আত্মদর্শন—এই অবস্থা মানুষ চায়। কিন্তু এই আত্মাহুত্বী ও আত্মদর্শন কেবলমাত্র গুরুর কৃপার দ্বারা গুরুর প্রসাদেই লাভ হইয়া থাকে।”

ভারত পরিক্রমায় আচার্য্য শঙ্কর

শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী

রামায়ণ মহাভারত যুগে আমাদের দেশের মুনি ঋষি সাধু সন্তগণ সারা ভারত পদব্রজে পরিক্রমা করতেন তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে। সে যুগের অনেক কাল পরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আর এক মহাপুরুষ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পদব্রজে ঘুরেছেন বৈদিক ধর্মের বার্তা বহন করে। তিনি শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর।

অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শ্রী আচার্য্য শঙ্কর মাত্র অষ্টম বর্ষে দম্ভানধর্ম দীক্ষিত হন। ৩২ বৎসরের জীবনে সমগ্র ভারত পরিক্রমা ক'রে ওৎকালীন তাত্ত্বিক কুসংস্কার অনাচার কদাচার ইত্যাদি পরূদন্ত করে হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উদ্ভটন করেছিলেন। কুসংস্কারাজ্ঞ সমাজ জীবনে বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন। তিনি ভারতের চারিপ্রান্তে চাষিটি মঠ স্থাপন ক'রে বৈদিক ধর্মের পঠন-পাঠন এবং প্রচারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই চারটি মঠ

হ'ল দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বাতে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকা এবং উত্তরে যোশীমঠ।

আচার্য্যের ভারত পরিক্রমার পূর্বে তাঁর জন্ম ও বাল্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরলের কালাডি (কালাটি) গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিবগুরু এবং মাতা বিশিষ্টা (সতী দেবী)। উভয়েই পরম শিবভক্ত। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁদের সন্তান না হওয়ায় তারা চন্দ্রমৌলী শিবের কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করার ফলে অত্যন্ত কালের মধ্যে তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মে। শিবের বরে জন্ম হয়েছিল তাই শিবুর নাম রাখা হল শঙ্কর।

অতি শৈশবেই শঙ্কর অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাত্র তিন বৎসর বয়সেই মালয়াম ভাষার সমগ্র গ্রন্থ তাঁর অধিগত। প্রতিধর এই শিশু বা একবার স্নাত

তা তার একেবারে কর্তৃত্ব হয়ে থাকত। পঞ্চম বর্ষে তার উপনয়ন সংস্কার হ'ল। ব্রাহ্মণ-সম্মান উপনয়ন না হলে ত' বেদপাঠের অধিকার জন্মে না। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র অধিগত করেন। বালকের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অকাট্য বুদ্ধি, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান সমগ্র বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করেছিল।

শঙ্কর ছিলেন অসাধারণ মাতৃভক্ত। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আলোয়াই নদী। গঙ্গার স্রব পবিত্র। শঙ্করের বৃদ্ধা মাতা প্রত্যহ নদী স্নানে যেতেন। একদিন পথকটে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তখন শঙ্কর মা'কে হুঁহু করে তোলেন এবং যোগবলে নদীকে তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন যাতে তাঁর মা'র প্রত্যহ নদীস্নানে যেতে আর কষ্ট না হয়। তাঁর মাতৃভক্তির আর এক নিদর্শন পাই পরবর্তী কালের এক ঘটনার। তিনি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মা'কে ইষ্টদর্শন করাবেন এবং তিনি মৃত্যুকালে মার কাছে উপস্থিত থাকবেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন। মায়ের অন্তিমকালে শঙ্কর অনেক দূরে তীর্থ পর্যটনে রত ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পূর্বে তিনি যোগবলে মা'র কাছে এসে তাঁকে ইষ্ট দর্শন করিয়ে-ছিলেন।

অষ্টম বর্ষেই শঙ্কর গৃহত্যাগপূর্বক তীর্থ পরিক্রমার পথে উত্তর দিকে যাত্রা করেন। দুই মাস কাল পথ হেঁটে হেঁটে নন্দীয়া ভীমে ঠাকুর নাথ পাহাড়ে উপনীত হলেন। সেখানে এক গুহায় বাস করতেন মহাযোগী গোবিন্দপাদ। বহু বৎসর বাবৎ তিনি সমাধিস্থ। তার বৃদ্ধ শিষ্যগণ গুরুর সমাধি ভক্তের আশায় অপেক্ষাকৃত। বালক শঙ্করের আগমনে যোগীস্বর গোবিন্দপাদ সমাধি থেকে ব্যুথিত হলেন এবং শঙ্কর দর্শন করে বৃত্তে পারলেন যে ঐ বালক ঐশী শক্তিসম্পন্ন। উপযুক্ত আধারেই তিনি সম্যাসের বীজ বপন করেন। অচিরে উহা প্রকাণ্ড মহৌল্লসে পরিণত হয়ে মানবের অধ্যাত্ম সাধনার প্রেরণা স্ফূর্ত করে।

কিছুদিন গুরুসম্মিধানে গুরুর শরিরচর্যাদির সম্বন্ধে একদিন সেখানে প্রবল বক্তা উপস্থিত। বক্তার জল বাড়তে বাড়তে

গুহামুখে ঢুকবার উপক্রম। একটু পরেই হস্তো সমাধিস্থ গুরুজীর নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা। শঙ্কর তখন তাঁর অলৌকিক যোগশক্তির বলে বক্তার গল শুষ্ক করে দিলেন;— গুরুজীর প্রাণরক্ষা হ'লো।

অতঃপর গুরুর আদেশে শঙ্কর সমগ্র ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রচারে পর্যটন শুরু করেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি কাশীধামে উপনীত হলেন। হরিশ্চন্দ্রবাট ও মনিকর্ণিকার ঘাটে অবস্থান কালে গুরু বেদান্তপ্রচার। অচিরে তাঁর অদ্ভুত শাস্ত্রবিচার ও অতুলনীয় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে দলে দলে লোক তাঁর শিষ্য গ্রহণ করল।

এই সময় কোলদেশের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সনন্দন শঙ্করের অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দর্শন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি পদ্মপাদ নামে খ্যাত হন। তিনি পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষ হ'লেন।

ততঃপর শঙ্কর গুরুর নির্দেশে বজ্রীনাথের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে নির্জনে বসে তিনি প্রস্থানত্রয়ের (গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তসূত্র) ভাষ্য রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

পুণ্যতীর্থ স্বমিকেশে এসে জানতে পারেন দহ্ম্যদের হাত থেকে নারায়ণমূর্তি রক্ষার জন্য উহা গদাগর্ভে নিমজ্জিত করে রাখা হত। শঙ্কর ঐ মূর্তি উদ্ধার করে পুনঃস্থাপনা করেন এবং নিরমিত পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করেন।

এর পর তিনি ব্যাসতীর্থে গেলেন। ব্যাসদেব এখানে দীর্ঘকাল তপস্তা করেছিলেন। পুনরায় তিনি বজ্রীনাথে উপস্থিত হ'লেন। এখানেও দহ্ম্যদের ভয়ে নারায়ণমূর্তি অলকানন্দে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। শঙ্কর যোগবলে ঐ মূর্তির অবস্থান জেনে তাঁকে উদ্ধার করে মন্দিরে পুনঃস্থাপিত করেন। বজ্রীনাথে চার বৎসর কঠোর পরিশ্রমে নানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক গ্রন্থ তিনি পরে দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠে বসেও রচনা করেছিলেন। সর্বমোট ১৫১ বানি শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

এরপর শঙ্কর বোঙ্গীমঠে এসে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের প্রভাব দূর করেন। প্রথমে কেদারনাথ ও পরে গঙ্গোত্রী গোমুখী দর্শন করেন। উত্তরাখণ্ডের বহু তীর্থ দর্শনের পর

শঙ্কর দশিষ্য উত্তর কাশীতে বাস করেন। তখন তাঁর বয়স ষোল। এখানে একদিন অতি বৃদ্ধ ব্যাসদেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শঙ্করের ষোল বৎসরে মৃত্যুযোগ ছিল। ব্যাসদেব তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে তাঁর পরমাণু আরও ষোল বৎসর বাড়িয়ে দেন।

শঙ্কর গুরুর আশীর্বাদে উত্তর হিমালয় থেকে দক্ষিণে কঙ্গাকুমারিকা এবং পশ্চিমে দ্বারকা থেকে পূর্ব অমরের কামাখ্যা, পরশুরামকুণ্ড এবং পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ পরিভ্রমণ করেন।

এ সময় ভারতে প্রায় সর্বত্র ধর্মক্ষেত্র নানা অনাচার কদাচার ইত্যাদি প্রবেশ করেছিল। আচার্য শঙ্করের অসীম জ্ঞান এবং অলৌকিক যোগপ্রভাবে সর্বত্র আবার বৈদিক ধর্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মেছিল।

দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা ও মাহীশতী নদীর সঙ্গমস্থলে মণ্ডন মিশ্রের বাসস্থান। তিনি তখন বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ প্রচার করছিলেন। শঙ্কর তর্কযুদ্ধে মণ্ডন মিশ্রকে পরাজিত করেন। মণ্ডনের স্ত্রী উত্তরভারতী ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী। তিনিও তর্কযুদ্ধে শঙ্করের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও পরাজয় স্বীকার করেন। তবে তাঁকে পরাজিত করতে শঙ্করকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শঙ্করের সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যা'হোক পরাজয়ের পর মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। নাম হলো সুরেশ্বরচার্য। তিনি শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হলেন।

শঙ্কর পুনরাব দ্বিবিজয়ে বের হয়ে নাসিকে উপস্থিত হন। সেখান থেকে পাহাড়পুর, বিষ্ণুলনাথের মন্দির। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা মধ্যে ত্রিশৈবতীর্থ মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অগ্রতম। এখানে ঘটল এক ঘটনা; উগ্র ভৈরব নামে এক কাশালিক শঙ্করকে ঘরে নিয়ে দেবীর নিকট বলি দিতে উদ্বৃত্ত হ'ল। এমন সময় শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে কাশালিককে হত্যা করে শঙ্করকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের নরবলি প্রথা উঠে যায়।

কর্ণাটকের সমুদ্রতীরে গোবর্ধন তীর্থ। সেখানকার দার্শনিক নীলকণ্ঠ শঙ্করের সাথে তর্কে পরাজিত হয়ে তাঁর

মতবাদ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে শ্রীশৈল। এখানে অবস্থানকালে শঙ্কর আর এক অলৌকিক-কার্য সম্পন্ন করেন। জনৈক প্রভাকর দত্তের এক মুক ও জড়ভাবাপন্ন তের বৎসরের পুত্রকে স্থূহ ও স্বাভাবিক করে তোলেন। বালকের মুখে কথা ফুটল। শঙ্কর তাকে তাঁর শিষ্য করে নিবেন। নাম হলো হস্তামলক।

এর পর শৃঙ্গেরী মঠ। এখানে শঙ্কর আর একজন শিষ্য পেলেন। নাম হলো তোটাকাচার্য। তারপর রামেশ্বরম্। এখান থেকে গেলেন ত্রিপুরমে। বৈষ্ণবদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে তাদের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

কাশীকে বলা হয় দক্ষিণের বারাণসী। এখানে শিব ও বিষ্ণু উভয়েই পূজিত হন : নাম শিবকাশী ও বিষ্ণুকাশী। শিবকাশীতে শঙ্কর কামাখ্যাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তিরুপতি। দক্ষিণের সর্ববৃহৎ বিষ্ণুমন্দির। তারপর কর্ণাটক হয়ে উজ্জয়িনী। এখানে মহাকালের শিবমন্দির। এখানকার ক্ষপণক জৈন এবং বৌদ্ধরা শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অদ্বৈত বেদান্তবাদ গ্রহণ করেন।

সেখান থেকে পুরীধাম। এখানে বৌদ্ধদের ভয়ে পুরোহিতরা জগন্নাথের রত্নপেটিকা চিহ্নাহ্নদে নিক্ষেপ করে। শঙ্কর যোগবলে পেটিকার অবস্থান নির্ণয় করে সেটি উদ্ধার-পূর্বক পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনরায় বারাণসী। সেখান থেকে অবস্টি। পরে দ্বারকাধাম। দিল্লুদেগ, গান্ধার ও বহলীক দেশে পরিভ্রমণ এবং বেদান্ত প্রচাৰ। তারপর হিমালয়ের সারদাতীর্থে এবং পবে কাশ্মীরের শ্রীনগরে যান। তক্ষশীলা, জালামুখী হয়ে নৈমিষারণ্য এবং ক্রমে বিহাবের নালন্দা, রাজগৃহ, গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে পূজা অর্চনা। সেখান থেকে বঙ্গদেশের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করেন। তাম্রলিপ্ত, ত্রিবেণী এবং পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধে উপনীত হন। পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করে স্বাতন্ত্র্যের পাপ থেকে মুক্ত হন। এর পর কামরূপ কামাখ্যা। সেখানকার তান্ত্রিকদের তর্কে পরাজিত করে সম্মতে আনয়ন করেন।

তিনি পুনরায় গোড়দেশ হয়ে নেপালে যান। পশুপত্তিনাথের মন্দিরে পূজা অর্চনা করেন। তারপর আবার বত্রীনাথ হয়ে শিবস্থান কৈদারনাথে গমন করেন। এখানে তাঁর মহাসমাধি লাভ হয়।

এইরূপে আচার্য্য শংকর সারাভারতে শিষ্য পর্য্যটন করে ভারতের লুপ্তপ্রায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড স্বমহিমায় পুনঃস্থাপিত করেন। যুগে যুগে ভগবান এই ভাবেই অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মগানি থেকে ভারতকে মুক্ত করেছেন।

বর্ষশেষের চিন্তা-ভাবনা

শ্রীঅজিত কান্তি সরকার

অবিরাম বেগে ঘুরে চলেছে কালচক্র; এর ফলে পৃথিবীর বুকে হয় দিনরাত্রির ক্রমিক আবির্ভাব। একটি আলোকোজ্জ্বল দিনের আবির্ভাবে ধরণীর দিকে দিকে জাগে প্রাণচাক্ষুণ্য; আবার সেই দিনের আলো হারিয়ে যায় রাত্রির ঘন অন্ধকারে। এই ভাবে গত হয় এক একটি সপ্তাহ, মাস ও ঋতু; তারপর একটি বর্ষও বিলীন হয়ে যায় মহাকালের করাল গর্ভে। বর্ষ বিদায়ের বিষয় লগ্ন আজ সমাগত। তাই বিশ্বজুড়ে আজ যেন ধনিত হচ্ছে করুণ রাগিনী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষশেষ' শীর্ষক কবিতায় বলেছেন—

“বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,

চৈত্র অবসান—

গাহিতে চাহিছে হিরা পুরাতন বরষের

সর্বশেষ গান।”

শুধু বিশ্বকবিরই নয়—এই ইচ্ছা সকলেরই। বর্ষশেষের গান গাওয়ার জন্ত সকলেই হয় আকুল। তাদের গানের ভাষা হয়তো বিভিন্ন; কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে লক্ষিত হয় অভূত সাদৃশ্য। তাদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় একই কামনা; বর্ষরূপী মহাকালের কাছে সবাই প্রার্থনা জানায়—তাদের অনাগত দিনগুলি যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে আলোকে ও পুলকে, তাদের চলার পথ যে হয়ে উঠে সহজ ও স্বগম।

বর্ষ বিদায়ের করুণ লগ্নে সকলের মনে জেগে ওঠে অনেক চিন্তাভাবনা। আমার হৃদয়ও আজ অনখ্য চিন্তাভাবনায় হচ্ছে আলোড়িত। চৈত্র শেষের এই নির্জন সন্ধ্যায় একান্তে বসে বসে ভাবছি যে, যার স্বপ্ন আছে—তার শেষও আছে। নশ্বর জগতে কোন কিছুই নয় অবিনশ্বর; মানুষের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। বর্ষ শেষের যতো প্রত্যেকের জীবনেই একদিন ঘনিরে আসবে অন্তিম লগ্ন। জন্ম এবং মৃত্যু নিঃশ্রিত অলঙ্ঘ্য বিধান। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায়—

“জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে?”

চিরস্থির কবে নীর হারের জীবন-নদে?”

হৃদয়াং, বঙ্গবন্ধু মানুষের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্যবহার করা। সবাইকে মনে রাখতে হবে—

আপনা বাধিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা।

জন্ম বিধের তবে পরার্থে কামনা।” (চিন্তাচক্রে দাশ) প্রতিটি মানুষকে নিজস্ব চিন্তে কর্তব্য সাধনে ব্রতী হতে হবে—কর্ম সম্পাদন করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। যেহেতু মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, তাই মানুষের আচার, আচরণ এবং কর্ম মনুষ্যোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবি হেমচন্দ্র বলেছেন—

“সহায় সম্পদ বল সকলি ঘৃণার কাল
আয়ু যেন পদ্মপত্রনীর।”

সুতরাং, কোন মানুষের পক্ষেই শোভনীয় নয় ধন, জ্ঞান ও শক্তির সমস্ত গর্ব প্রকাশ করা। প্রতিবর্তনশীল জগতে সব কিছুই পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। আজকের ধনী আগামী দিনে পরিণত হচ্ছে পথের ভিখারীতে; জনবলে বলীয়ান ব্যক্তিও একদিন হয়ে পড়ছে নিঃসহায়। সুতরাং, প্রত্যেকটি মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, সহায়, সম্পদ ও ব্যক্তির সমস্ত উন্নত আচরণ করা এবং অপরকে হীন মনে করা মুখ্যতাই নাসামান্য। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রভূত ধনের অধিকারী ব্যক্তি এত বেশী আত্মগর্বি এবং আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন যে, তিনি মঙ্গলময়, পরম কার্যণক ঈশ্বরের কথাও বিস্মৃত হন; কিন্তু এরূপ আচরণ নিন্দনীয়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই স্মরণ-যোগ্য যে সমস্ত জাগতিক বস্তুই ঈশ্বরের দান; সর্বশক্তিমান বিধাতার শক্তিতেই মানুষ শক্তিমান, ঐশ্বরিক করুণাই তার দেহকে রেখেছে সজল।

“সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম তুমি কথাও না, লোকে বলে করি আমি”

সাধক কবি রামপ্রসাদের এই বাণীতে উদ্ভূত হয়ে প্রত্যেকের উচিত জগন্মাতার অভিপ্রেত কর্ম সম্পাদনে ত্রুতী হওয়া।

বর্ষশেষে মানুষ সারা বছরের লাভ ক্ষতি ও ঘেনাশাওনার হিসাব নিকাশে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই বর্ষশেষের চৈত্র মাসটিকে বলা হয় মালতামাসের মাস। এরূপ হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে প্রতিটি মানুষের মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র পার্থিব ধনসম্পদের হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়—তার লক্ষ্য আরো বৃহৎ, আরো বৃহৎ। বর্ষশেষের লগ্নে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আমরা কতদূর ধনে কতখানি ধনী হতে পেরেছি। জাহাড়া পরম পিতা আমাদের প্রত্যেকেই মর্ত্যালোকে প্রেরণ করেছেন তাঁর অভীক্ষিত কর্ম সম্পাদনের জন্য। আমাদের উপর প্রস্তুত দায়িত্ব আমরা বিগত বছরে কতদূর পালন করেছি, আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা কতদূর—এ সব কথাও চিন্তা ভাবনা করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। সাফল্য এবং বিফলতার হিসাব নিকাশে যত্ন হলে আমরা

যেমন সেগুলোর কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হব, তেমনই ব্যর্থতার প্রতিবারের উপায় উদ্ভাবনে হব সমর্থ। এর কলে আমাদের আগামী দিনে চলার পথ সুগম হয়ে উঠবে; আমাদের লক্ষ্য সাধনের প্রয়াসও হবে অযব্যস্ত।

বর্ষের শেষ দিনটিতে অল্পকিছু হর গাজনের উৎসব। আমরা সাধারণভাবে বলি যে, গাজনের ঢাকের বাজনাই স্মৃতিতে করে বর্ষের বিদায়। এই দিনটি হিন্দু জনসাধারণের কাছে খুবই পবিত্র। ভক্তজনেরা মন্দিরে মন্দিরে সমবেত হন মহাকালরূপী শিবের আরাধনার জন্য; তাছাড়া ষাঠা গাজনের পবিত্র অস্থানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন তারাও কঠোর ভাবে কল্লুতা সাধন করে শুদ্ধ দেহে ও শুচি অন্তরে শিববন্দনায় হর মুখর। আরাধ্য দেবতা মহাকালের কাছে তাঁরা প্রার্থনা জানান ভবিষ্যত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি; আসন্ন দিনগুলি যাতে শান্তি ও আনন্দের মধো দিয়ে অতিবাহিত হয়—এই কামনাই ধ্বনিত হয় তাঁদের কণ্ঠ থেকে; তাঁরা চান—নববর্ষ তাঁদের জীবন-পাত্র পূর্ণ করে দিক কাণায় কাণায়।

একথা ঠিক যে পুরাতনের বিদায় মানেই নূতনের আগমন। জগতে কোন স্থানইত অপূর্ণ থাকে না। নূতনকে স্থান করে দেওয়াই পুরাতনের ধর্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃকে আমরা প্রতিনিয়তও লক্ষ করি এই যাওয়া আসার বেলা। বিবর্ণ শুষ্ক পাতা যখন ঝরে যায়, তখন বৃক্ষশাখায় হয় নব কিশলয়ের উদ্গম, একটি কুসুম বৃক্ষচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাত হয় নূতন কুসুমকলি। বহুযাজগতেও এই রীতির ব্যতিক্রম হয় না। সেখানেও আমরা লক্ষ করি যে, একটি জীবনের বিদায় আরেকটি নবীন জীবনের স্মৃত্য: আবর্তিত্বকে করে সূচিষ্ঠিত। আজ বর্ষ বিদায়ের এই ব্যাধাতরা লগ্নে আমরা স্মরণে পাচ্ছি নববর্ষের আনন্দময় আগমন বার্তা। আহুন, নববর্ষকে আমরা আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই। পুরাতনকে বিদায় দিতে আমাদের হৃদয় ব্যাধায় ভাবাক্রান্ত হলেও নবজীবনকে বরণ করে নিতে আমরা যেন বিধাষিত না হই। নববর্ষকে উদ্দেশ্য করে আমাদের বর্ধ থেকে ধ্বনিত হোক—

“ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আবাতে

উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম ভূগমম পুরাতন বৎসরের যত

নিফল লক্ষ্য।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যুগার্ঘ্য স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁর আদর্শ

মহাপাত্র নীলমনি সাউ

সভাপতি, ওড়িশা সাহিত্য একাডেমি

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ঋষি মুনিদের দেশ—যোগী সন্ন্যাসী-দের দেশ—সাধুসন্তদের লীলাভূমি। হাজার হাজার বছর এদেশে অধ্যাত্ম জ্ঞানের মহাদীপ জলে এসেছে—অধ্যাত্ম-নিষ্টির সমুদ্র সমুদ্রল চূড়ান্ত মহাকাশবক্ষে দৃশ্যমান হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলোক প্রদর্শন করে এসেছে। ব্রহ্ম উপলব্ধির অনন্ত অখণ্ড ভূমানন্দে নির্বিকল্পলাভ করার সাধনমার্গ এখানেই আবিস্কৃত হয়েছে। যুগের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে ঈশ্বরের শক্তি, চেতনা ও বিস্তৃতি নিয়ে দিব্য-পুরুষগণ আবিস্কৃত হয়ে উক্ত যুগের আধ্যাত্মিকতাকেই পূরণ করেছেন। সনক, সনন্দন, সনৎকুমারের মত বৈদিক ঋষিদের থেকে আরম্ভ করে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র পর্যন্ত এবং মধ্যযুগের শঙ্কর, রামানুজ, নানক থেকে আরম্ভ করে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ মহর্ষি রমণ ও শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত দিব্য পুরুষগণ এই ভূমিতে আবিস্কৃত হয়ে কেবল ভারতবাসীকেই নয় সমগ্র মানবজাতির জন্য সৌরালোকিত অধ্যাত্ম পথ উন্মুক্ত করে গেছেন।

আমাদের এই বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভেই সেই রকম একজন যুগজন্ম অধ্যাত্ম মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক মহাজাগরণে ভারতবর্ষের যুগযুগ ধরে ঘনিষ্ঠতামসিকতার অবসান হয়েছিল। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চেতনায় হ'ল নব উদ্বোধন।

ভারতাত্মার মর্মবাণী—ভারতের সীমা অতিক্রম করে সাত সমুদ্রের অপ পারে পশ্চিম ভূখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। এই ভাববাহার গতি সফারের জন্য শত্রুবর্তীকালে এই ভূমিতে জ্বলিষ্ট হয়েছিলেন সেই যোগীরাজ মহাত্মা প্রণবানন্দ। বাল্যকাল থেকে তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সূর্যধ

হয়েছিল। কঠোর কৃচ্ছ্রতার ভিতরে নিজেকে সদাসর্বদা আবদ্ধ রেখে অধিকাংশ সময় ধ্যানের গভীরে ডুবে থাকতেন, থাকতেন অগ্নাজ্ঞ ধার্মিক কার্যে লিপ্ত। প্রতি চক্ৰিশ ঘণ্টার মাত্র দুই ঘণ্টা নিদ্রা, খাওয়া বলতে আলুনিষ্ঠ ভাত, বস্ত্র বলতে দুই খণ্ড খেত বস্ত্র; আর শয়নের উপকরণ একটি মাত্র তক্তায় পর্যবসিত হয়ে যায়। স্বকঠিন তপস্যার ফলে তিনি যোগলব্ধ সিদ্ধি সাধন করে নিয়ে নিজের ঐশ্বরিক শক্তিকে মহাশক্তি সমাজের উন্নয়ন কার্যে লাগাতে স্থির করেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেশের ক্ষয়িষ্ণু যুব-সমাজ এবং অগণিত জনসাধারণের দারিদ্র্য দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, অজ্ঞানতার প্রতি—যাদের মধ্যে শক্তি নেই, সামর্থ্যও নেই, আশা নেই, উৎসাহ নেই, প্রেরণা নেই, উদ্বোধন নেই। মূলতঃ তিনি কোটি কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের দুর্দশার উপরই অধিক পরিমাণে দৃষ্টিপাত করেছিলেন ও তাদের ভিতরে কার্য করার জন্যই সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন। আরম্ভ করলেন একটি ধর্ম ও জনহিতকর সংগঠন। শত শত যুবক এই সংগঠনে যোগদান করলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপিত হ'ল। এই যুবকদ্বিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, আদর্শ ছাত্রাবাস প্রভৃতি। উন্নত চরিত্রের এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন, ব্যায়াম, নৈতিক শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হলো। উচ্চ সংস্কারযুক্তদের নানা ধর্মীয় আদর্শের শিক্ষা দিয়ে উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন বিভিন্ন শাখা আশ্রমের মধ্যে দিয়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রণবানন্দজী দুর্বল গ্রামবাসীদের অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য রক্ষিদল গঠন করলেন, স্থাপিত হ'ল অসংখ্য মিলন-মন্দির। সর্বোপরি তিনি সারা দেশে ও বহির্ভারতে 'ভারত সেবাপ্রিয় সঙ্ঘ' নামক এক মহান সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তার শাখা প্রশাখা

বিস্তার আরম্ভ করলেন। এই সেবাপ্রদ এবং মিলন-মন্দির তথা প্রণববর্ষের বিভিন্ন unit গুলিকে কেবল নিজ শিল্পের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যবহার না করে জনহিতকর বিভিন্ন সেবাকার্যে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত করলেন। আজ আমরা নারা ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে যে সন্ন্যাসী স্বেচ্ছাসেবীদের ক্ষুদ্রচিহ্নে অক্লান্তভাবে পয়স করণীয় বিগলিত হয়ে জনসেবা কার্যে নিযুক্ত থাকতে দেখি তাঁরা হলেন সেই স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সেবাত্রুতধারী ভারত সেবাপ্রদ সন্তের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ।

হিন্দুজাতির নব আগরণের জন্য যুগার্চ্য প্রণবানন্দজী চেয়েছিলেন—

প্রত্যেক হিন্দুকে দেহ ও মনে বলিষ্ঠ হতে হবে। প্রত্যেক হিন্দুর মনে ধর্মবোধ এবং জীবনে ধর্মোচরণ অব্যাহত থাকবে। হিন্দুদের নিজেকে ভিতঃ ঐক্যবোধ প্রাপ্ত হতে হবে। আভিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে হবে।

প্রত্যেক হিন্দুর থাকবে আত্মমর্ধ্যবোধ এবং নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধর্ম, সমাজ, মন্দির, বিগ্রহ ও নারীজাতির মর্ধ্যনা রক্ষার উদ্দেশ্যে যেন প্রত্যেকে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন এবং এই সকল উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনও স্থাপিত হবে।

প্রণবানন্দজী ব্যক্তিগত নৈতিক এবং মানসিক শক্তির ক্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক শক্তির সংগঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে যতদূর এই যুগে ব্যক্তিগত শক্তি প্রতিপন্ন তাই সংগঠন শক্তির স্বরূপ। মতঃ কার্য সম্বন্ধে। প্রত্যেক সংগঠনের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা করা। সকলেরই দৃষ্টি এক লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। তবেই সংগঠন স্থায়ী ও অসাধ্যসাধনের হাতিয়ার স্বরূপ হতে পারে। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যেও তিনি সম্ভাব্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা হয় সবলে সবলে—সবলে দুর্বলে কদাচ নয়।

হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর সমতারের প্রতিষ্ঠা চাইলে প্রথমে হিন্দুদের মুসলমানদের মতই দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে হবে।

প্রণবানন্দজী বলেছিলেন— বীর্ধ্যসাধনায় ত্রুতী না হলে সে জীবন সর্বদা মৃত্যুর হাতে বন্দী হয়ে থাকবে। ক্রীত ব্যক্তি ক্ষমা ও অহিংসা সব আচরণ করতে পারে না, কেউ যেন উদারতার দোহাই দিয়ে আত্মমর্ধ্যবোধকে বলি না দেয়। যে ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্ধ্যবোধ রক্ষা করতে পারে না, সে পৃথিবীর কোন বন্ধনই করতে পারবে না। অকর্মণ্য শক্তির ধর্মসাধনা বৃথা। আত্মোৎসর্গের দ্বারা যদি মৃত্যু হয় তবে তোমার স্বর্গলাভ অনিশ্চিত। প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্বোধন করে প্রণবানন্দজী যা বললেন তার মর্ম এই—

তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলে কখনো ভেবো না। যেন যথো তুমি নিজেকে সেই প্রণব, সেই ঐক্য, সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি সব কিছুই তুমি নিজে। যেন রাখ তুমি আছ বলেই যগৎ আছে।

ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানালেন—নিজের ভেতরের পৌরুষ ও শক্তিকে জাগ্রত কর। সেই পৌরুষ ও শক্তি ফুটে উঠুক তোমার চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে জীবনের ধর্মই সংগ্রামশীলতা। মৃত্যুকে ভয় কোরনা। জীবনের মৌলিক বিষয়গুলির উপর প্রণবানন্দ যে সম্ভব্য করেছেন তা সাধারণ নৈতিক বা সামাজিক বিচারকে অতিক্রম করে সনাতন ধর্মের মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত ধর্ম বলতে প্রণবানন্দ মতঃ সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য-এর সাধনাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে বীরত্ব, পুরুষত্ব, মহাব্যম্ভ ও মুমুক্ষুত্বই মহাপুণ্য। অপর দিকে পাশ বলতে বোঝায়—দুর্বলতা, ভীর্ণতা, কাপুরুষতা, সংকোচতা ও স্বার্থপরতা।

কেবল ব্যক্তিগত আচরণের কথাই নয়, প্রণবানন্দজী, ভারতীয় জাতীয় আচরণ কিরূপ দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্ধ্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। জাতীয় চরিত্র থেকে কি উপায়ে আলস্য, নিজরা, তন্দ্রা, জড়তা দূর হবে তার জন্য তিনি বঙ্গ নির্ঘোষ কর্তে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। কি জাতি, কি ব্যক্তি সকলের উদ্দেশ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন— “আত্মবিশ্বাসই প্রকৃত মৃত্যু। যখন আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে

উঠবে তখনই তুমি বাঁচার মত বাঁচার অধিকারী। আদর্শকে প্রাপণ ধরে কার্য করে গেলে বিনাশ নেই পুনরুত্থান অবশ্যস্বভাবী।

যুগাচার্য্য প্রণবানন্দজী মহারাজ ছিলেন ভারতীয় যোগী-ঋষি পরম্পরায় এক অসাধারণ দিব্য প্রতিভা ও তপঃশক্তিশালী মহানামব। মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর ধরাধামে তিনি তাঁর দিব্যালীলা প্রদর্শন করে মহাসমাধি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর যোগাসিদ্ধ শরীর, মন ও প্রাণে তিনি যে প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করেছিলেন—সেই অমিত প্রাণশক্তিকে তিনি “মাহুঘের কল্যাণের জন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। আজকের “ভারত সেবাপ্রসন্ন সঙ্ঘ” তাঁরই সংকল্প থেকে জন্ম নিয়ে তাঁরই শক্তিতে বেঁচে আছে ও পরিপুষ্ট হয়ে চলছে।

এখানে একটি কথা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তা হ'ল ভারতবর্ষ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। এই মহাজাতির জাতীয় প্রকৃতির সঙ্গে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা হ'ল

আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতাকে কেহ না করে কোন প্রকার রাজনৈতিক শক্তি এ জাতিকে উন্নতি সাধে পরিচালিত করতে পারবে না। আজ ভারতবর্ষে যে অনভিপ্রেত জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধান হলে আমাদের যুগাচার্য্য প্রণবানন্দের মত জাতীয় দিব্য মহাপুরুষের আদর্শ ও নির্দেশকে অচুশীলন করতে হবে। স্বামী প্রণবানন্দজীর ভাব্য—“এ যুগ মহাজাগণের যুগ, মহামিলনের যুগ, মহাসম্বন্ধের যুগ, মহামুক্তির যুগ।” এই মহানবাণী এ যুগে কেবল ভারতবর্ষের জন্ত উদ্দিষ্ট নয়, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্য উৎকৃষ্টতার জন্ত ইহাই একমাত্র মন্ত্র বলে বুঝতে হবে। কিন্তু এই মহামন্ত্রে সাধনায় দায়িত্ব বর্তমানে বিধাতা ভারতবাসীর উপরেই অর্পণ করেছেন—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

আজকের এই পুণ্যক্ষেত্রে, শুভ মুহূর্তে স্বামী প্রণবানন্দজীর মত যুগধর্ম পুণ্যস্বতী চারণ করে তথা তাঁর আদর্শের মননের আশ্রয় নিয়ে আসুন আমরা লকলে ধস্ত হই।

[মূল রচনা ওড়িশা ভাষা থেকে অনূদিত]

চৈত্র-চিতা

ঈশ্বরীর গুণ

(১)

মহাকালের অট্টহাসি শুনতে কি পাও।
চৈত্র-চিতায় বর্ষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
অনলে যা' পুড়লো না তা' সব ভুলে নাও ;
বৈশাখে তা' উজ্জীবিত করবে ধরায়।
নোতুনকে পথ দিতেই করে কাল যে উধাও
আবজ্ঞানা, পুড়ে পুড়েই বিলুপ্তি পায়।

(২)

সৃষ্টি করার তাগিদ যে তার কমবে না গো।
জাভ-ভারে পঙ্খ থাকার উপায় তো নাই।

অব্যাহত নবীকরণ-কর্মে লাগো,
বৈশাখী শীখ কালের বিষণ্ণ জ্ঞানায় যে তাই।
মহাকালই মুক্তিদাতা, অভয় মাগো,
কালের বরেই ভার-মোচনের মন্ত্র যে পাই।

(৩)

চৈত্রী চিতায় অনল দহন-অস্তুরালে
বৈশাখেরই বোধন থাকে ; প্রবুদ্ধ জন
সাধা-সাধন ক'রেই চলে কালের তালে।
সত্যতারই সঞ্জীবনে হও নিমগন।
ধ্বংস-সৃজন ক'রে ক'রেই কালই পালে
অভয়-মন্ত্র দীক্ষা লভে বৈরাগী মন।

ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে

ঐতিহ্যের শইকিয়া

প্রকাশ্যে স্বাধীন,

ভারত সেবাপ্রদ সঙ্ঘের মত সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিশ্বপ্রেমের মহান আদর্শের আধারে গড়ে উঠা আত্মজ্ঞান-পূর্ণ সেবাব্রতী এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আয়োজিত হিন্দু ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। সঙ্ঘের সমূহ ভক্তবৃন্দের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজ আপনাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করে ধর্মপ্রাণ সেবামর্মী ভক্ত-সমাজের কল্যাণ-শোধিত সমারোহে যোগ দিয়ে ধর্ম সংস্কৃতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতীয় সনাতন সভ্যতার এক চিহ্ন মূর্তির বিস্তারিত আমি যেন দর্শন করেছি। ভারতবর্ষের কথা ভাবলে আমার মনে আসে বিবেকানন্দের মন্তব্য—এই সেই ভারতভূমি যেখানে অল্প সকল দেশ থেকে আগেই জ্ঞান বিস্তার লাভ করেছিল, যেখানে ধর্মের স্রোত সমুদ্রে পতিত নদীর মত বাস্তববাদী রূপ পেয়েছিল। এই সেই ভারতভূমি যেখানে হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়া স্বর্গের রহস্য ব্যক্ত করে। এই সেই ভারতভূমি যেখানের মাটিতে মহান ঋষি-মুনির চরণস্পর্শ পড়েছিল। এখানেই প্রথমে 'মাহুয়ের ধর্ম' এবং অনন্ত বিশ্বের গবেষণা হয়েছিল। এখানেই প্রথমে আত্মার অমরত্ব, সর্বশক্তিমান ভগবান এবং ধর্ম, দর্শন, সম্পর্কীয় উচ্চ তত্ত্বালোচনা স্থান পেয়েছিল। এই দেশ থেকেই ধর্ম এবং দর্শনের তরঙ্গ সমগ্র বিশ্বকে আশ্রিত করেছিল। এখন ইহারই তরঙ্গে ধর্মসাম্প্রদায়িক বিশ্বমানবকে রক্ষা করতে হবে। এই সেই ভারত, যাহা মহত্ব যুগের বিপত্তি এবং বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, অসংখ্য পরিবর্তিত নীতি-নিয়ম গ্রহণ করে আসছে। এই সেই দেশ, যাহা একটি স্থির শিলপুণ্ডের মত অন্তর্নিহিত শক্তিতে অক্ষয় জীবন বিধে বেঁচে আছে। ইহার জীবন অনাদি, অমর। আমরা এই দেশেরই সন্তান।"

আমাদের এই দেশ হচ্ছে ধর্মভূমি এবং কর্মভূমি হিন্দুধর্মের কর্ম এবং পুনর্জন্মের তত্ত্বই নিহিত রয়েছে, মাহুয়ের স্বজনমুখী স্বাধীনতা এবং জীবনের সঙ্গে অতীত ভবিষ্যতের যোগসূত্র। কেবল ধর্ম এবং কর্মের ভূমিই নয়, ভারত হচ্ছে সময়ের এক মহান তীর্থভূমিও। আর্থ-অনার্য, মোগল, পাঠান আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছে এবং কালক্রমে এখানেই সকলে বিলীন হ'ল। সকলের সময়ের গড়ে উঠল মহান ভারতীয় জাতি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য—ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্ত বৈশিষ্ট্য। চিত্তের উদারতা, বিশালতা, সহনশীলতা ভারতীয় ঐতিহ্য-পরম্পরার উজ্জল গুণাবলী। সত্য, অহিংসা, প্রেম, ভারতীয় জীবন দর্শনের মূল আধার। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিংসা এবং সংকীর্ণতার স্থান নেই। বেদে বলা হয়েছে আত্মা ব্রহ্মরূপ, পঞ্চভূত থেকে মুক্তি পেলে জ্ঞান, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি থেকে আত্মা মুক্তি পায়। পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন লোকে ভগবানের রূপে ইহ জীবনেই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। আত্মা সে পূর্ণাবস্থা লাভ করলে মাহুস নিজেই সংস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে। বৈতজ্ঞান পরিশূদ্ধ হয়ে অর্হত, নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্তিই প্রাতিজন হিন্দু পরম লক্ষ্য। আমরা যদি এই ছোট একটি দেহে আত্মজ্ঞান লাভ করে স্বাধীনভাবে চলতে পারি তবে একাধিক দেহে আত্ম-জ্ঞান স্থাপন করতে পারলে আমরা তো আরো বেশী স্বাধীন লাভ করতে পারব। এরূপ মত বেশী দেহে আত্ম-জ্ঞান স্থাপন করতে পারব, ততই আমাদের স্বাধীনতা বেড়ে যাবে। যখন এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের আত্মবোধ

সঙ্ঘের উদ্যোগে শিবরাত্রি উপলক্ষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঐতিহ্যের শইকিয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। (২৩ মার্চ, ১৯৭২)

আসবে, সামান্য ক্ষুদ্রদেহ বিশ্বদেহ লাভ করতে সমর্থ হবে, তখন মানুষ হয়ে বাবে আনন্দময়, জ্ঞানময়।” একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই অশ্বৈত জ্ঞানেরই পোষকতা হিন্দুধর্ম যুগে যুগে করে আসছে। এই সনাতন আদর্শ দ্বারা পুনরায় দৃঢ়ীভূত করে ভারতবাসীর এগিয়ে যাবার সময় হয়েছে। তা’হলে আমাদের গর্ব, অহঙ্কার, উচ্চ, নীচ আদি ভেদ-ভাব, সামাজিক ব্যবধানসমূহ দূর হবে। ধর্মীয় গোড়ামী, সংকীর্ণতা, হিংস্রতা, আদি-ব্যাধি থেকেও ভারতকে আমরা মুক্ত করতে পারব। আজকের ভারতের পটভূমিতে আমাদের সমস্তাঙ্গলোকে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে সমাধানের পথ সহজ হবে। হিন্দুধর্ম এবং দর্শনের বিশেষত্ব এই যে ভাল-বন্দ, উচিত-অনুচিত দুটি বিষয়ের সম্যক উপলক্ষিকে সহজ ভাবে অহুভব করতে শেখায়। ইহা গ্রহণ কর, ইহা গ্রহণ করিও না এরূপ বলার পরিবর্তে দুটি বিষয়ের ভাল-বন্দ, দুটি দিকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে দেখতে ভারতীয় দর্শন আমাদের উৎসাহিত করে এবং ভালটি গ্রহণ করতে শেখায়। অর্থাৎ মানবোচিত বুদ্ধি-বিশেষতাকে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণাত্মক আয়তন দান করতে, জাগ্রত করতে ভারতীয় দর্শন সদাই আগ্রহী। তাই ভারতবাসীকে ভারতীয় দর্শনের সেই ভাবশক্তিকে সর্বদা অন্তরে জাগ্রত করে রাখা আবশ্যক। গোড়ামী, সংকীর্ণতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাত্যাভিমান আদির ভ্রমাত্মক পরিস্থিতি থেকে উক্ত বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা পরিজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবো। ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যতা, প্রকৃত ব্যাখ্যা উপলব্ধি করলে সমাজে শ্রুতি, শান্তি বৃদ্ধি হবে। অস্থিরতা লুপ্ত হবে। প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করে যদি আমরা ধর্মকে রক্ষা করি, তাহলে ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে। ধর্মের নামে অনর্থের সৃষ্টি তা’হলে আর হবে না।

এই ক্ষেত্রে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবক সম্প্রদায় ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষেপে অতি আবশ্যকীয় পুনরুজ্জাগরণের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু নৈতিক ও সামাজিক প্রমূল্যগুলোর পুনরুত্থানের জন্তে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করুন। আপনাদের মানবীয় মূল্য-বোধের তৃপ্তিজনী জীবন-বীক্ষা আজকের সমাজের সকল অগ্রাঘ, অধর্ম এবং অর্ধের পুষ্টিগত দূর করক। ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মের জীবনী সঙ্গমে ভারতীয় জনজীবনকে অবগাহন করিয়ে আর্ন্ত, নিঃস্ব, জনসাধারণের জন্তে মুক্তি-মার্গ প্রাপ্ত করার নিঃস্বার্থ সেবা-রীতিতে আপনারা পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করুন—ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। ভারতীয় সমাজের অতি কঠিন মুহূর্ত বা সম্বাদের সময়ে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান-গরিমা বাহাতে উপাচার এবং নিদানের কাজ করতে পারে আর এরই আলোকে ভারত-বাসী বা’তে সহজাত জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে সকল সমস্যা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, সে প্রেরণার বাণী আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে প্রোথিত হোক—এটিই আমার একান্ত আশা। আপনাদের এই সম্মেলনের সর্বতোপ্রকার সফলতার জন্তে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম। সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সঙ্ঘের মূক্তন টেলিফোন নম্বর

কলিকাতা প্রধান কার্যালয়—	405-178
হায়দরাবাদ সেবাশ্রম—	61-2284
নিউদিল্লী সেবাশ্রম—	683-9757
	684-8181
পুরী সেবাশ্রম—	3227
বারাণসী সেবাশ্রম—	62913

সম্মান বাঙালী

প্রধান কার্যালয়ে শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ জয়ন্তী ও শিবরাত্রি মহোৎসব উদ্‌যাপিত

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ও ২রা মার্চ ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দীয় নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গুষ্ঠানের মাধ্যমে কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্যালয়ে শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ জয়ন্তী ও শিবরাত্রি মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারী একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। বিভিন্ন স্তরের প্রায় চার হাজার মানুষ এই শোভার অংশ নেয়। ১লা মার্চ অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা মহোদয়গণ গঠনে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর অবদান বিষয়ে ভাষণ দেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উচ্চ স্তরের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী ভাষণে সজ্জ্বর প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ যুগাচার্যদেবের নির্দেশিত ধর্মাদর্শ—ভ্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের আদর্শে ব্যাটী জীবন গঠনের ভিত্ত্যই বলিষ্ঠ আতিগঠন সম্ভব বলে যুক্তব্য কবেন।

অন্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন যে সনাতন হিন্দুধর্মের জাতীয়তাপ্রাণ স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব। ধর্ম সংস্থাপনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ বিকাশ যুগাচার্যের জীবনে মূর্ত হয়েছিল।

সভাপতির অভিভাষণে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত সেন বলেন যে চরিত্রই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই চরিত্র গঠনের জন্যই যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব; বনঃ-সংযম, সেবা, জনকল্যাণ, শরীর গঠন কোন কিছু সম্ভব নয় যদি চরিত্র ঠিক না থাকে। স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর মহান জীবনের শিক্ষা দিয়ে জাতীয় চরিত্রগঠনে প্রগামী হয়েছিলেন। ভারতের মহান ঐতিহ্য অব্যাহত। আচার্যদেব এই অগাধ ভাবধারার পুষ্টি যুগিবেছেন মানুষের নৈতিক চরিত্র

গঠনের ভিত্ত্য দিয়ে। আজ তাঁর আদর্শে আমাদের অঙ্গুপ্রাণিত হবে।

স্বামী হিরণ্যরানন্দজীও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

শিবরাত্রি সম্মেলন

২রা ফেব্রুয়ারী রাজস্থান উচ্চ স্তরের মাননীয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেশ্বর শইকিয়া অঙ্গুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা, প্রকৃত ব্যাখ্যা উপলব্ধি করলে সমাজে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি হবে। অস্থিরতা লুপ্ত হবে। প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করে যদি আমরা ধর্মকে বন্ধা করি, তবেই ধর্মই আমাদের বন্ধা করবে। (শ্রীহিতেশ্বর শইকিয়ার ভাষণ ৪৮৬ পৃষ্ঠায়)

অসম সরকারের পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশিবশঙ্কু ওকা ও বাঙালী শ্রীঅর্জুন দেবও ভাষণ দেন। আলোচ্য বিষয় ছিল—“ধর্ম ও অধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে ভারতে জাতি গঠন”।

সভাপতির ভাষণে মাননীয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানার্জী বলেন যে,—মানুষের সেবাই বড় ধর্ম। আমবা ভারতবাসী। ধর্মই আমাদের কুণ্ডি। অপর ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সকলকে ভালবাসার ভিত্ত্য দিয়ে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে।

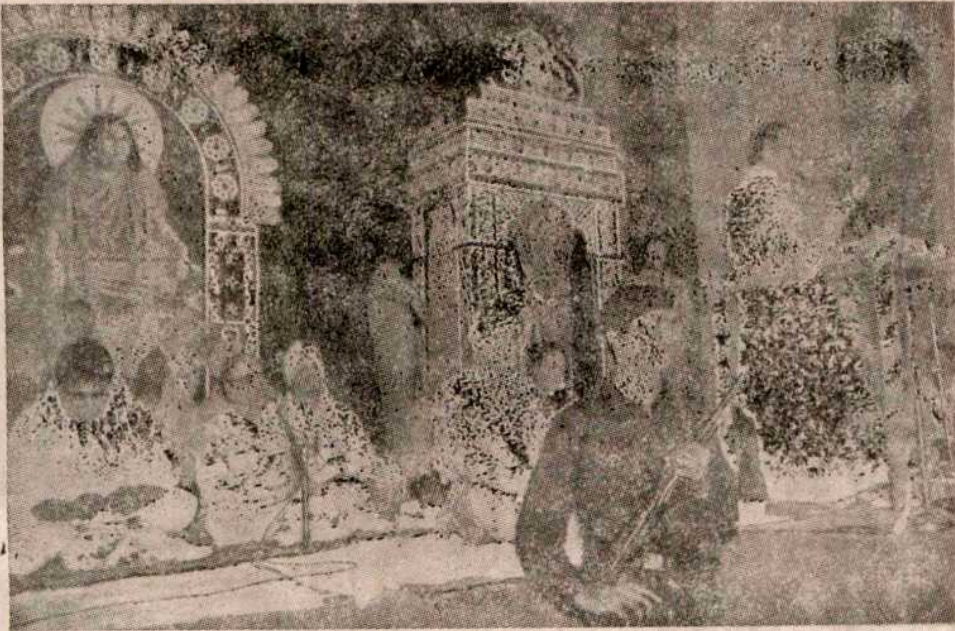
অগ্রাহ্য বক্তৃগণের মধ্যে ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রেম্যানন্দজী ও স্বামী বিজয়ানন্দজী। উভয় দিবস উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বিশ্বানন্দজী।

সম্মেলনের শুরুতে শ্রীহিতেশ্বর শইকিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগী ও ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেন।

শ্রীশইকিয়াকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী। উভয় দিবস কলিকাতায় বিশিষ্ট শিল্পীরা ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীতে অংশ নেন—সর্বশ্রী স্বরাজ রায়, সৈকত মিত্র, সন্দীপ ঘোষ, মাষ্টার প্রমেনজিৎ, সৌম্যকান্তি দে, সবিতাব্রত দত্ত, শুভংকর দত্ত প্রমুখ। নিমাই ভারতী ও সম্প্রদায় কীর্তন পরিবেশন করেন। পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ আশ্রম-ভবনে সমাগত দর্শনার্থীদের আশীর্বাদ প্রদান করেন।

পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতিজী মহারাজ ভাষণের শুরুতে প্রয়াত সঙ্ঘ-সন্তানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক সঙ্ঘগঠনে তাঁদের বিশেষ অবদান ও জীবনাদর্শ অহুসরণের জন্য সঙ্ঘ-সন্তানদের অহুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান করেন।

পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজী সঙ্ঘ-সন্তানগণকে তাঁর ভাষণে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের মহান আদর্শে জীবন গঠন পূর্বক দেশ ও জাতির সেবার আত্মনিয়োগে ব্রতী হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, হৃদয়ের আকুলতা ব্যাকুলতা নিয়ে গুরুমুখী হয়ে চলাই সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের জীবনের ব্রত। দেশ চায়



আসামেরমুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেশ্বর শইকিয়া শবরাত্রি সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন।

সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী সম্মেলন

৩রা মার্চ প্রধান কার্যালয়ে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী-সম্মেলন অহুষ্ঠিত হয়। পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও সঙ্ঘগীতা থেকে সঙ্ঘ-সন্তানগণের কর্তব্য ও জীবন গঠনমূলক কিছু কিছু বিষয় ও আচার্য্যদেবের কয়েকটি পত্র পঠিত হয়।

আত্মিক শক্তিতে অহুভূতি সম্পন্ন মানুষ—সে ভাবেই সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের তৈরী হতে হবে।

আচার্য্যদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—আত্মসমীক্ষা কর। তাঁকে অহুসরণ করে চল। প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ-মনন কর, অহুমুখী হও। এভাবে জীবন গঠন করে—তাঁর আদিষ্ট কর্ম ও ভাবধারা প্রচারের ভিতর দেশের কল্যাণ। শুধু কাজের ভিতর ডুবে থাকলে হবে না—তাঁর মহাভাবে ডুবে থেকে

গুরুমুখী হলে তাঁর মহান আশীর্বাদ তোমরা পাবে। নাম, বংশ, প্রতিষ্ঠা তোমাদের জন্ত নয়। শ্রীগুরু পাদপদ্মের দিকে লক্ষ রেখে, তোমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। তাঁর অদ্রাস্ত কর্মকোশল, তাঁর জনকল্যাণকর মহৎ আদর্শ, তাঁর অভীক্ষিত কর্ম তোমাদের জীবনের পাথর ও সাধনা হোক।

প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘ-সভানদের সঙ্ঘের প্রতি আহুগত্য ও সঙ্ঘের নির্দিষ্ট আদেশ নির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে চলার উপদেশ দিয়ে ভাষণ দেন।

শ্রীগুরুপূজা আরতির পর পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতিজী মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করেন।

সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ৫ই মার্চ, ১৯২২ তারিখে কলিকাতা প্রধান কার্যালয়ে সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্য সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সারা ভারতের অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্যগণ এতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রারম্ভিক ভাষণে পূজ্য সভাপতিজী মহারাজ বলেন যে, জাতীয় জীবনে আজ প্রয়োজন আত্মিক উন্নতি। নৈতিক দুর্বলতা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। দেশকে এই অবক্ষয় থেকে রক্ষার জন্ত নৈতিক চরিত্র গঠনের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের দেওয়া আদর্শে জীবন গঠন আজ অপরিহার্য। সেই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আত্ম-সমীক্ষার দ্বারা সদস্যগণকে সঙ্ঘের কাজে ব্রতী হওয়ার আহ্বান করেন পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজী।

সম্পাদকীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে সঙ্ঘের ১৩২৭ বর্ষাব্দের (ইং ১৯১০-১১) জনসেবা, তীর্থ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার, সমাজ কল্যাণ, বহির্ভারতে প্রচার প্রভৃতি কার্যাবলী সভার সামনে তুলে ধরা হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

পরম পূজনীয় সভাপতি মহারাজ ও সমাগত সদস্যবৃন্দ।

এক বৎসর পর আমরা পুনর্মিলিত হয়েছি। সকলে আমার

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। প্রথা পরম্পরায় সাধারণ সমিতির বার্ষিক সভার সঙ্ঘের ১৩২৭ সনের বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করছি। সঙ্ঘনেতা আচার্যদেবের নির্দেশিত পথে তদীয় জনক্যাণমুখী কর্মবোজনা আমরা বথাসাধ্য রূপায়ণের চেষ্টা করে চলেছি। আলোচ্য-বর্ষে সঙ্ঘের বহুমুখীন কর্মধারা নিম্নরূপ :

ধর্মপ্রচার—সঙ্ঘের ধর্মপ্রচারের বিশেষ মাধ্যমটি হ'ল—চারণ-দল। সঙ্ঘের ৭টি চারণদল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশা, অসম, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে দ্বারা বৎসর নানা স্থানে অস্থায়ী শিবিরের মাধ্যমে ত্রিসন্ধ্যা, পূজা-প্রার্থনা, ধর্মীয় প্রবচন, ধর্ম-সম্মেলন, বৈদিক বজ্র প্রভৃতি ধর্মাহুষ্ঠানের সাথে সাথে সঙ্ঘের জনহিতকর কার্যের জন্ত অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়।

সঙ্ঘ-প্রবর্তিত ও অনুমোদিত ৩০০ শতাধিক হিন্দু মিলন-মন্দির সঙ্ঘের অন্ততম প্রচার মাধ্যম। আলোচ্য বর্ষে সারা দেশে ১৬৬০টি বৈদিক বজ্র, ৩৫৫০টি সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক সম্মেলন ছাড়াও বিভিন্ন বিশিষ্ট পর্বাঙ্কে যেমন নববর্ষ অক্ষর তৃতীয়া, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, মাঘীপূর্ণিমা, শিবরাত্রি, রাসপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, কালীপূজা প্রভৃতি ধর্মাহুষ্ঠান ও উৎসবগুলি বিবিধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় সহ ৩২টি বিভিন্ন শাখা আশ্রম, চারণদল ও হিন্দু মিলন-মন্দিরগুলি এই ধর্ম প্রচার কার্যে নিয়োজিত হয়েছিল।

সঙ্ঘের প্রকাশন বিভাগ থেকে বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক পুস্তক ও লক্ষাধিক প্রচারপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া কলিকাতা প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রণব, সুরাট থেকে গুজরাটীতে হিন্দু মিলন মন্দির, হায়দরাবাদ থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা ইংরাজীতে হিন্দু রিজেনারেশন, বোম্বাই থেকে একটি ইংরেজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহে, ডায়মণ্ডহারবার ও গড়িয়া সেবাশ্রমের ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দিরে এবং অন্যান্য আশ্রম থেকে নিয়মিত প্রখ্যাত ধর্ম

প্রবক্তা পণ্ডিত ও সঙ্ঘ-সম্মাসিগণ স্বাম্যরণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতিজী মহারাজ, সহ-সভাপতিজী মহারাজ, প্রধান সম্পাদকজী মহারাজ ও অন্যান্য প্রবীণ সঙ্ঘ-সম্মাসিগণের সংস্পর্শে এসে হাজার হাজার ধর্ম-পিপাসু গৃহী, ছাত্র, যুবক ও তরুণগণ ধর্মজীবন গঠন ও নৈতিক চরিত্র গঠনের উপদেশ গ্রহণ করেছে।

ভীর্ষ-সংস্কার—সঙ্ঘের গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরী, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, গৌরীকুণ্ড, কেশবনাথ নবদ্বীপ, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি ভীর্ষ-সেবাশ্রমগুলি থেকে আলোচ্য বর্ষে—২ লক্ষ ৭০ হাজার, ৬২৫ জন ভীর্ষধাত্রী আশ্রম, ১ লক্ষ ৭০ হাজার, ৩২০ জন আহার এবং দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র থেকে ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৫১৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়েছে। ৮টি লাইব্রেরী, ৪টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া ভীর্ষকেন্দ্রগুলিতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান হয়েছে ৭৫০টি, কাপড় ও কলম বিতরিত হয়েছে ৫ হাজার ১০৫টি, দ্রবিত্ত নারায়ণসেবা হয়েছে ৬৫ হাজার ৮২০ জনের মধ্যে।

শিক্ষাবিস্তার—আলোচ্য বর্ষে সারা দেশে বিভিন্ন আশ্রমের মাধ্যমে ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়ার হাইস্কুল, ১টি জুনিয়ার বেসিক স্কুল, ২৫টি ছাত্রাবাস—ছাত্র সংখ্যা দেড় হাজার), পাঠাগার ও গ্রন্থাগার ১০টি, বুক ব্যাঙ্ক ২টি পরিচালিত হয়; শিক্ষা-সম্মেলন হয় ১৫টি। আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়। ডায়মণ্ডহারবার সেবাশ্রমে উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুরাট সেবাশ্রমে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, (বালক ও বালিকা বিভাগ সহ), জামসেদপুর সেবাশ্রমে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজী মাধ্যম মাধ্যমিক, মিডল এবং প্রাইমারী বিদ্যালয়, গয়া সেবাশ্রমে হাইস্কুল, আমেদাবাদ সেবাশ্রমে হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, হায়দরাবাদ সেবাশ্রমে হাইস্কুল, পুরী সেবাশ্রমে হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল সেবাশ্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম সেবাশ্রমে জুনিয়ার

হাই ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল, দুর্গাপুরে ইংলিশ মাধ্যম হাইস্কুল ও নার্সারী স্কুল পরিচালিত হয়েছে।

ছাত্রাবাসগুলি নিম্নলিখিত আশ্রমসংলগ্ন—কলিকাতা প্রধান কার্যালয় (বিশ্ব বিদ্যালয়, মেডিক্যাল ছাত্র), হোড়খালি, মহিষাদল, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, ঝাঁকুড়া, রাণীবাঁধ, গড়িয়া, সিউড়ি, রায়গঞ্জ, তিওর (বালুঘাট) গয়া, হায়দরাবাদ, জামসেদপুর, আমেদাবাদ, সুরাট, কুনর (আদিবাসী), পতিরাহ, মালদা, কুমারগঞ্জ, বালুর ঘাট, তোকরা, সুরাট, শিলিগুড়ি।

ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষা—সঙ্ঘ-প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের ৬ হাজার ৩৭১ জন পরীক্ষার্থী স্বাম্যরণ, মহাভারত ও গীতা পাঠ্যসূচীতে আশ্রম, বধ্য ও অন্যান্য এই তিন পর্ধ্যারে লিখিত ও মৌখিক ভাবে পরীক্ষা দিয়েছিল। এছাড়া ২৫টি পরীক্ষাকেন্দ্রে খোলা ময়। লিখিত পরীক্ষায় অন্যান্য পর্ধ্যারে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে স্বর্ণপদক দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অন্যান্য কৃতী পরীক্ষার্থীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

শিক্ষাবিস্তার কেন্দ্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে প্রথম মহিলা কলেজের উদ্বোধন।

জনসেবা—জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সঙ্ঘের জনসেবা বেশ ব্যাপক। বস্ত্রা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও সঙ্ঘ থেকে আত্মসিদ্ধিত ও নিরস্ত্রের মধ্যে সেবাকার্য নিষ্ঠা সহকারে পরিচালিত হয়েছে।

আলোচ্য বর্ষে ২৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সাড়ে ষোল লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

নিম্নোক্ত ধর্মীয় মেলায় সেবাকার্য পরিচালিত হয় :

- (১) স্বথধাত্রী মেলা—পুরী, মহিষাদল গড়িয়া, ঘাঁচি ঝাঁকুড়া, মেদিনীপুর।
- (২) পিতৃপক্ষ মেলা — গয়া,
- (৩) হরিহর চত্ব মেলা — শোণপুর
- (৪) সূর্যগ্রহণ মেলা — কুরুক্ষেত্র,
- (৫) অন্নকুল মেলা — বারাণসী,

(৬) রাসযাত্রামেলা — নবদ্বীপ ও কোচবিহার,

(৭) গঙ্গাসাগর মেলা — সাগর দ্বীপ,

(৮) মাঘমেলা — এলাহাবাদ

(৯) একতের মেলা — বাকুড়া।

অগ্নিকাণ্ডে সেবাকার্য—দম দম ও মধ্যমগ্রামে এবং বাকুড়া ও ভোকার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য বস্ত্র ও অর্বাধি সাহায্য দান করা হয়।

অন্নদান—সজ্জের প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন আশ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে সহস্রাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করা হয়েছে।

বস্ত্রাসেবাকার্য—আলোচ্য বর্ষে, মেদিনীপুরের সবং ও অন্যান্য হাইলাকান্ডিতে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র, বাসনপত্র দিয়ে ত্রাণকার্য চলছিল।

ঘূর্ণিঝড়—অল্প প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে, উড়িষ্যার গঙ্গাযে দুর্গতদের মধ্যে সেবাকার্য করা হয়।

ঋণাত্মক—মেদিনীপুরের ময়নায় ঋণাত্মক করা হয়।

শরণার্থী সেবা—জম্মু ও নয়াদিল্লীতে কেন্দ্র খুলে কাশ্মীরের গোলযোগের জন্য পলায়িত শরণার্থীদের মধ্যে সেবাকার্য করা হয়। কাপড়, কবল, খাদ্যাদি বিতরণিত হয়।

ছাত্রদের সাহায্য—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছাত্র কল্যাণ তহবিল খোলা হয়েছে। আলোচ্য বর্ষে ২০০ ছাত্রকে মাসিক আর্থিক সাহায্য দান করা হয়। এ ছাড়া ৪০ জন ভাস্করী ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ছাত্রকে বৃত্তিদান করা হয়।

আই অপারেশন ক্যাম্প—গঙ্গাসাগর সেবাপ্রম থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প খোলা হয়। এ ছাড়া, জামসেদপুর সেবাপ্রম থেকেও আই অপারেশন ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে।

আমোদাবাদ সেবাপ্রমের মাধ্যমে একটি ভ্রাম্যমান দাতব্য চিকিৎসালয় ডেডরাপাড়া আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করে চলেছে।

কুমার প্রমথ নাথ রায় পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট থেকে সজ্জের মাধ্যমে ডায়মণ্ডহারবার, হরিদ্বার ও নবদ্বীপে চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত দাতব্য ফাণ্ড সজ্জের মাধ্যমে কুমার প্রমথ নাথ রায় মহাশয় সজ্জের বিভিন্ন ভীষণপ্রম যে সমস্ত গৃহাদি নির্মাণ করে দিয়েছেন—শেইওলির রক্ষাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যের জন্য কুমার প্রমথ নাথ রায় বিল্ডিং মেনটেনেন্স ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এ জন্য সজ্জ উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কৃতজ্ঞ।

কুষ্ঠ প্রকল্প—কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সজ্জের জামসেদপুর শাখা থেকে কুষ্ঠ নিবারণ প্রকল্প ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছে। জামসেদপুর শহর ছাড়াও পটকা ব্লক ও রায়নগর ব্লকের ৪২ বর্গ কিলোমিটার সহরাকল এবং ১১০০ বর্গ কিলোমিটার গ্রামাকল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) কুষ্ঠরোগী এই প্রকল্পে চিকিৎসাধীন। সাত বৎসর মেয়াদী এই প্রকল্পে তিনটি ইউনিটে কাজ চলেছে। ৫২টি চিকিৎসা-কেন্দ্রের মধ্যে সহরাকলে এবং গ্রামাকলে ৬১২টি গ্রাম নিয়ে এই বিরাট কুষ্ঠ নিবারণ প্রকল্প।

আদিবাসী অধ্যুষিত দাবাকিতে একটি, লৌহনগরীয় সিদগাড়া ও বার্মামাইনসে অপর ২টি আধুনিক স্বল্পপাতি সমন্বিত স্বদক্ষিত মোট ৩টি হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে সজ্জের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এ পর্যন্ত ৩৬০০ জন কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন ও জীবিকাকর্জনের জন্যও পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। তাঁতের কাজ, হাতো তৈরীর কাজ, ব্যাগেজ প্যাকিংএর কাজ ইত্যাদি চালু হয়েছে। ৫১টি সাইকেল চিকিৎসা এবং রিক্সা ভাণ্ডান দিয়ে তাদের জীবিকাকর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুষ্ঠ কলোনির শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছে।

জামসেদপুর সেবাপ্রমের বিশ্ব স্বাস্থ্য-সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জামসেদপুর সেবাপ্রমের মাধ্যমে চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প খোলা হয়ে থাকে। এখানে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়েছে।

সমাজ কল্যাণ প্রকল্পে—আদিবাসী অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে কল্যাণমূলক কাজ চলেছে।

আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সমবেত প্রার্থনা, পবিত্রভোজন, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার কুফল বিষয়ে সম্মেলন, ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি কাজ চলেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে। দুঃস্থদের সাময়িক সাহায্য, কাপড় কলম বিতরণ, দাতব্য চিকিৎসা প্রভৃতি সেবামূলক কাজ চলেছে।

প্রধানতঃ মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, পুর্নালিয়া, বাঁকুড়া, জামসেদপুর, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ, উত্তর প্রদেশের বারাণসী প্রভৃতি স্থানে কাজ চলেছে।

কেন্দ্রগুলি হল—ঝাড়গ্রামের ডোকরা, পুর্নালিয়া, তমলুক মহকুমার হোড়খালি সেবাশ্রম, বাঁকুড়া ও রাণীবীর সেবাশ্রম, তিওর, বালুঘাট, পতিয়া, কুনর, কুমারগঞ্জ, শিলিগুড়ি, পুর্নালিয়া, মালদহ প্রভৃতি স্থানে কাজ চলেছে। হরিজনদের মধ্যে সেবাকার্য ও প্রচার—উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলার কারখানা অঞ্চলে সন্তের হরিজন কল্যাণ কাজ চলেছে। হরিজনদের মধ্যে কাপড় কলম ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্মেলনে একথা প্রচার করা হয় যে হরিজনরা অস্পৃশ্য নয়। হিন্দু সমাজের তারা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বহির্ভারতে প্রচার—গাওন, গায়না, কানাতা, নিউ-ইয়র্ক আশ্রমের মাধ্যমে সন্তের ভাবধারা তথা হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি প্রচার নিষ্পত্তি চলেছে। সন্ন্যাসিগণ স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আহূত হয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তাহাড়া, হুর্গোৎসব, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি পর্বাহে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে বহির্ভারতে বসবাসকারী হিন্দু ও তৎসংস্থানের অবিবাসীদের অঙ্গপ্রাণিত করেছেন।

শারীর চর্চা—সন্তের উদ্যোগে বিভিন্ন আশ্রমের মাধ্যমে শরীর চর্চা ও আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে যোগাসন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। সন্তের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও গড়িয়া, প্রদ্বানন্দ পার্ক, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, হোড়খালি, পয়া, সুরাট, আমেদাবাদ,

জামসেদপুর, সিউড়ি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যচর্চা শিক্ষাদান কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

সভার মোট ছয়টি প্রস্তাব আলোচনার পর সর্বমুখ্যতঃ ক্রমে গৃহীত হয়।

শৌক প্রস্তাব

প্রথমে স্বামী পরমহংসানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দজী, স্বামী সত্বদানন্দজী ও ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মল্লের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী। সমর্থন করেন শ্রীমৎ স্বামী অক্ষয়ানন্দজী ও শ্রীঅনিমেষ মহম্মদার।

পূর্ব সভার কার্যবিবরণী অমুমোদন

পূর্বসভার কার্যবিবরণী অমুমোদন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী। অমুমোদন করেন শ্রীকুলাল দত্ত ও শ্রীপ্রভাত পাল।

আয়ব্যয়ের হিসাব

সন্তের বাৎ ১৩৭২ (ইং ১৯২০-২১) সেবা ও সাধারণ বিভাগের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পূজ্য সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ। সমর্থন করেন—শ্রী এম কে দাশ চৌধুরী, শ্রীরবীন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীকিশন লাল সাত্তরওয়াল, অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন গাঙ্গুলী। আয়-ব্যয় ছিল নিম্নরূপঃ সেবা বিভাগ—

আয়—টাকা ৩০.০২, ০৪২-২৫ পঃ

ব্যয়—টাকা ২৪, ৫৫, ২১০-২৪ পঃ

সাধারণ বিভাগ—

আয়—টাকা ৩, ১৪, ৬৪, ৪২৪-০১ পঃ

ব্যয়—টাকা ২, ৮২, ২২. ৫২২-৫৬ পঃ

হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ

সন্তের পূর্বতন হিসাব পরীক্ষক মেসার্স এম সি দত্ত এও কোং চার্টার্ড একাউন্ট সংস্থাকে বাৎ ১৩২৮ (ইং ২০-২১) বৎসরের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন স্বামী নির্মলানন্দজী। সমর্থন করেন ডঃ দীপেন রাহা, শ্রীরবীন্দ্র নাথ মল্লিক ও শ্রীঅজিত বোষ।

পুরস্কারকে ধন্যবাদ

সভ্যের প্রধান কার্যালয় ভবন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি মন্দির-ভবনের বার্ষিক পৌরস্বয় ও জলকর মকুবের জন্ম কর্ম্মাদি পুরস্কার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ডঃ সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সমর্থন করেন স্বামী বুদ্ধানন্দজী, ডাঃ এ বাগচী ও সুনন্দকুমার দত্ত।

যুগাচার্য শতবার্ষিকী

সম্মত প্রতিক্রিয়া যুগাচার্যদেবের আসন্ন জন্ম শত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্ম পরিচালক সমিতিতে অনুরোধ করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা উত্থাপন করেন স্বামী বিজ্ঞানন্দজী। সমর্থনে ভাষণ দেন স্বামী বুদ্ধানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীহরিশঙ্কর মৈত্র, স্বামী বিশ্বানন্দজী, স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী অশোকানন্দজী ও স্বামী হিরণ্যদানন্দজী।

পূজা সভাপতিত্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে অধিবেশন শেষ হয়। শ্রীশ্রী পূজা আরতির পর পূজা সম্বন্ধ-সভাপতি মহারাজ সদস্ত গণকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

ডায়মণ্ড হারবার সেবাস্রমে বার্ষিক উৎসব ও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

২ ও ১০ ফেব্রুয়ারী দু'দিন ব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য অহুষ্ঠানের মাধ্যমে ডায়মণ্ডহারবার সেবাস্রমের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনের দুটি অধিবেশন হয়। সম্বন্ধ-প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী উভয় সভার সভাপতিত্ব করেন। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে স্থানীয় বিচারপতি শ্রীকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ নিমাই সাধন বহু। বিভিন্ন বক্তা ভাষণ প্রসঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে জাতিগঠনের আহ্বান করেন। অন্ত্যস্ত বক্তৃতাগুলোর মধ্যে ছিলেন স্বামী অশোকানন্দজী, অধ্যাপক কমলাকান্ত বসু, শ্রীযাত্রাক্ষ প্রদান, শ্রীকামদেব শাসনাল প্রমুখ। ডঃ নিমাই সাধন বহু কৃতী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি ডঃ ক্ষেত্র প্রসাদ সেন শর্মা ও বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে জাতিগঠনের বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অন্ত্যস্ত দ্বারা বক্তৃতা করেন তারা হলেন স্বামী বিজ্ঞানন্দজী ও স্বামী পূর্ণানন্দজী।

উভয় দিবস উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বিশ্বানন্দজী। চারপদলের নেতা স্বামী জ্ঞানীশ্বরানন্দজী ও কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শোভাযাত্রা, ক্রীড়া প্রদর্শন, পূজা-আরতি, অন্নকূট ভোগের প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অহুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। গীতার শ্লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন, শ্রীগুরুপূজা, শিবপূজা, পার্বদারথির পূজা, পদ্মাবলী কীর্তন, নাটকান্ধিন প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ।

বর্ধমান আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বর্ধমান সেবাস্রমের বার্ষিক মহোৎসব ৩১শে জানুয়ারী, ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী ৩ দিন ব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য অহুষ্ঠান সহ সুসম্পন্ন হয়। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, হিন্দু ধর্ম-সম্মেলন, বৈদিক শাস্ত্রবজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ, প্রবন্ধ ও অন্নপ্রতিযোগিতা, গীতাপাঠ, নাটকান্ধিন, কীর্তন, পুরস্কার বিতরণ, দুঃস্থ ছাত্রদের অহুদান প্রদান, কল বিতরণ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ।

প্রতিদিন শুরুতে লাঠি, ছোঁচা খেলা, যোগব্যায়াম ইত্যাদি দেখানো হয়।

দু'টি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ ও স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডঃ আদিত্য প্রসাদ মজুমদার। স্বামী প্রণবানন্দের শিক্ষাভাবনা ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে ভাষণ দেন উদ্বোধক শ্রীহরী কুমার দাঃ (সি এম সি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক), স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানন্দজী, স্বামী শাখতানন্দজী, শ্রীশৈল কুমার মিত্র, উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীময়ী চৌধুরী প্রমুখ।

প্রায় ২০ হাজার মানুষ বসে প্রসাদ পেয়েছেন। আশ্রম

সকালক স্বামী জ্ঞানীশ্বরানন্দজীর তদারকিতে অস্থানগুলি
সুসম্পন্ন হয়।

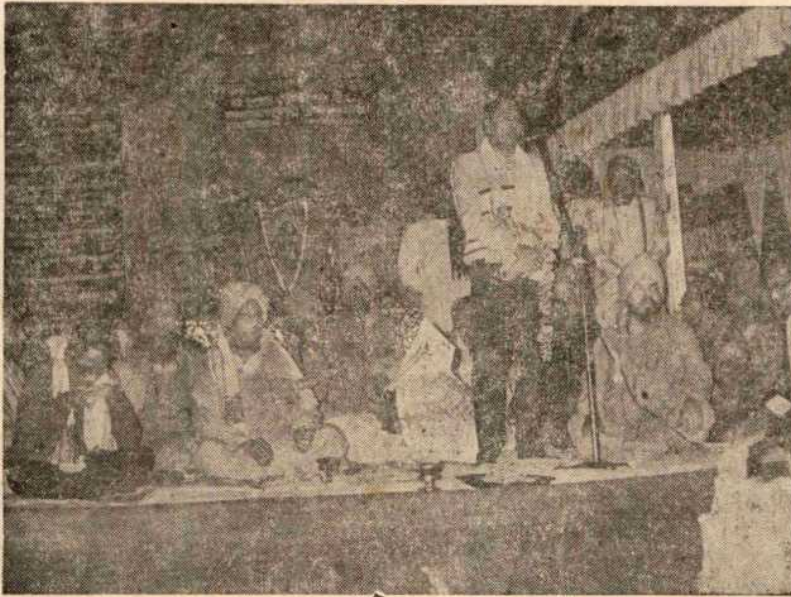
অসম রাজ্যে চারণদলের প্রচার

স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজীর নেতৃত্বে অসমে প্রচাররত
চারণদলের উদ্যোগে গত ১লা ডিসেম্বর '২১ তারিখে ডিব্রু-
গড় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক
যজ্ঞ অস্থাপিত হয়। সমাজসেবায় আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী
মহারাজের অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি

২২শে আচার্যবরণ, ২৩শে সম্মেলন ও ২৪শে বৈদিক
যজ্ঞ ও মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

সম্মেলনের সভাপতি যারঘেরিটার মহকুমায় শাসক
শ্রীপুপ নাথ ভূঞা, প্রধান অতিথি বিডিও শ্রীহরন সানোয়াল
শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী, স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী প্রমুখ
হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সম্মেলনে আচার্যদেবের জীবনদর্শ
বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পূজাভিষেক ও
অন্নকুটের প্রসাদ বিতরণিত হয়।

নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮



অসমের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমুকুট শর্মা নগাঁও-এ চারণদল আয়োজিত একটি সভায় ভাষণরত।

শ্রীইশ্বেশ্বর শর্মা (অধিকর্তা ডিব্রুগড়), উদ্বোধক শ্রীঅনাদি
ভূষণ রায় (অধিকর্তা ডিব্রুগড়) প্রধান অতিথি অধ্যাপক
শ্রীহরন কুমার বড় ঠাকুর (ডিব্রুগড় কান্টন মহাবিদ্যালয়),
বিরাজ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বানগোবিন্দ পরমপদী, স্বামী
বিশ্বপ্রেমানন্দজী প্রমুখ।

ডিব্রুগড় হিন্দু মিলন-মন্দিরের উদ্যোগে ২২, ২৩ ও ২৪
ডিসেম্বর বার্ষিক উৎসব সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞও চারণদল
অংশ গ্রহণ করে। সজ্জার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী
অরুণানন্দজী মহারাজ এই অস্থানে যোগদান করেন।

ডিসেম্বর সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞ অস্থাপিত হয়। প্রতিদিন
সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ভজ্ঞ-কীর্তন, পূজা,
আরতি, ধর্মীয় প্রবচন প্রভৃতি অস্থানে বিপুল জনসমাবেশ
হয়। ২৭শে তারিখের সম্মেলনে যুব-কল্যাণে আচার্য
স্বামী প্রণবানন্দজীর অবদান বিষয়ে ভাষণ দেন অস্থানের
সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ, উদ্বোধক
নগাঁও এর অতিরিক্ত উপযুক্ত শ্রী পি. সি. দে, প্রধান অতিথি
রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমুকুট শর্মা, কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রদীপ
শইকিয়া, স্বামী প্রেমানন্দজী ও অন্যান্য।

এছাড়াও বিভিন্ন তারিখে নিম্নোক্ত ভক্তগৃহে আয়োজিত ধর্মাহুতানেও চারণদল অংশ গ্রহণ করে।

সর্বশ্রী রণজিৎ কুমার দাস। (কার্বি আংলং বোকাডান), কাজল কুমার দে (গ্রাম বাজার ডিক্রগড়), ডিক্রগড় হিন্দু মিলন-মন্দিরের নতুন গৃহ উদ্বোধন অহুতান, মাধন লাল দত্ত, (বগেশ্বর রোড, তিনসুকিয়া), বিনয় ভূষণ ভদ্র (শ্রামাপদী তিনসুকিয়া), ডুরাগাঁও, নগাঁও এ গ্রামবাদীদের অহুতান।

হিন্দু মিলন-মন্দির সংবাদ

দক্ষিণ শহরভুলী (টালিগঞ্জ)—মিলন-মন্দিরের পরিচালিত রমা শিশু সন্মোচন কে জি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে গত ১২শে জানুয়ারী টালিগঞ্জ স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে এক আকর্ষণীয় শিশু অহুতানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের রেক্টর স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ও ফুটবল কোচ শ্রীহনীল ভট্টাচার্য। ভারতীয় প্রখ্যাত চন্দন তিলক পরিষ্কার বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের অভ্যর্থনা আপনের পর স্বামীজী কর্তৃক স্কুলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অহুতানের সূচনা হয়। অধ্যক্ষা শ্রীমতী বীণা মিশ্র বিভিন্ন পর্যায়ের ২৫টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অহুতানগুলি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। প্রতিটি ইভেন্টে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন অহুতানের সভাপতি, প্রধান অতিথি পরিচালক সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ এবং স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক।

সভাপতির ভাষণে স্বামীজী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান অতিথি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের নির্দ্বারিত পাঠ অভি্যাসের সাথে সাথে শারীর চর্চার অহুশীলনের জ্ঞাত বিদ্যার্থীদের আহ্বান করেন। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শ্রীলা সেন জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এবং পারিতোষিক বিতরণে সাহায্য করেন। শিশু প্রতিযোগী ছাড়াও দুটি ইভেন্টে মা-অভিভাবিকা ও অভিভাবকগণও অংশ নেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী রামেশ্বরানন্দজীও উপস্থিত ছিলেন।

আগাপুর—গত ১৮ ফেব্রুয়ারী মন্দিরের সহকারী সভাপতি শ্রীব্রজেননাথ হীরার বাড়ীতে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব অহুতীত হয়। শ্রীশ্রীসঙ্গীতা পাঠ, প্রণবে প্রকাশিত “৩মাঘী পূর্ণিমার মহাপ্রকাশ” পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন, গুরুপূজারতি প্রভৃতির মাধ্যমে মাঘী পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন অহুতানে অংশ নেন—সর্বশ্রী শ্রামাপদ সাহা, হরিপদ বাহা, ডাঃ পুলিনবিহারী বিশ্বাস, আদিত্য কুমার রায়, কুমারী কাকলি দে, শ্রামস প্রসাদ হালদার প্রমুখ। তিন শতাব্দিক ভক্ত পংক্তিভোজে বিচ্ছুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করে।

সমস্তিপুর—১৮ই ফেব্রুয়ারী, মাঘী পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে নিত্য পূজারতির সাথে দরিদ্র নারায়ণ সেবা ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী অধ্যাপক আশিস সেন সভাপতি বন্দোপাধ্যায় আশিস মজুমদার ও বিভূতি বন্দোপাধ্যায়।

নববারাকপুর—(উঃ চব্বিশ পরগণা) দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন অহুতানের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রন সরকার। শেষে পূজারতি ও প্রসাদ বিতরণিত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতি সপ্তাহে শতাধিক রোগী চিকিৎসিত হয়। বয়স্ক শিক্ষার জ্ঞাত বৈশ বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত চলেছে।

তিনসুকিয়া—মাঘী পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে অধিবাস বাল্যভোগ, উষাকীর্তন, ভক্তবৃন্দের অভিষেক বারি আনায়া এবং হাজার হাজার ভক্তের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার সংস্কৃতিক অহুতান পূজারতি ও নামকীর্তন অহুতীত হয়।

বেলপাহাড়ী—১৮ ফেব্রুয়ারী নানা ধর্মীয় অহুতানের মাধ্যমে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে গুরু মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। অহুতানে উষারতি, সিদ্ধনাম সংকীর্তন, হোম, বীর ভাবোদ্দীপক আগতি এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অহুতানটি পরিচালনা করেন শ্রীলোকনাথ পাণ্ডা ও শ্রীমঙ্গল নাথ গীট।

মরিয়াণি—এবারও মাঘী পূর্ণিমা উৎসবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পূজারতি, গুরুনাম সংকীর্তন এবং ভক্তদের বিচ্ছুড়ী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রণব

বর্ষসূচী—১৩৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীযুগাচার্য—বৃন্দাবনী— ৩, ৪৩, ৮৪, ১২৩, ১৬৩, ২০০, ২৪৩, ২৮৩, ৩২৩, ৩৬৩, ৩৬৪, ৪০৩, ৪৪৩,		অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	অবোধা—১৩,
শিত্তের গুরুদর্শন— ৮৮		শ্রীমন্তাগবত বর্ণিত সেকালের খেলাধুলা—৮২,	
সম্পাদক—নমো ব্রহ্মণে— ৪,		ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—পুণ্য জলাধার—২৫২, ২৮৮	
জীবনের বাণী—৪৪, ৮৪, ১২৪, ১৬৪, ২০৪,		শ্রীমতী ধীমা দেবী—ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাব— ২১	
২৮৪, ৩২৪, ৪৪৪		জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী—২৩, সদগুরু শয়নং	
সহস্রাব্দী পুরুষ— ২৪৭, নববর্ষ প্রসঙ্গে—৫, সাম্প্র-		গচ্ছাবি—১৮৭, সঙ্গীতে আরাধনা—৩০৫	
দায়িকতা প্রসঙ্গে—৪৫, সজ্জের প্রকৃত ধর্ম, নীতি ও		শ্রীমদ্বীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
নিয়ম—৮৫, আমার উৎসব: জোয়ার উৎসব—১৩৬,		শ্রীমন্তগবদগীতার প্রথম অধ্যায়—২৩	
স্বামী প্রণবানন্দেয় হিন্দু সংগঠন—১৬৬, শ্রীশ্রীচূর্ণা-		ডঃ সত্যেন্দ্র দে—সনাতন বৈদিক ধর্ম কি আদৌ সাম্প্র-	
পূজা: অরুণ রাজা ও বৈষ্ণব সমাধির—২০৬		দায়িক—২৬, ভক্তি-চিত্তার রূপকল্প ও মানস উত্তরণ—	
ভারতের সমাজ ও সাম্য—২৪৬, হিন্দু চূর্বল কেন—		৬০, শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্বরূপ চিন্তা: পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যে—	
২৮৫, শিবনামের আবির্ভাব—৩২৬, ৮মাব্দী পূর্ণিমার		২৭০, আচার্যের জীবনাবশেষে রাষ্ট্র, সমাজ ও	
মহাপ্রকাশ—৩৬৫. জন্মশত বার্ষিকী প্রসঙ্গে—৪০৫,		ধর্মচিন্তা—৪১৩	
ভারতের একতা—৪৪৫.		শ্রীরণজিৎ কুমার সেন—রবীন্দ্র শিকারদর্শ ও বর্তমান সমাজ-	
স্বামী বেদানন্দ—হিন্দু জাতিগঠন কোন্ পথে ৩৪২		মানস—২৮	
স্বামী আত্মানন্দ—শ্রীশ্রীযুগাচার্য সঙ্গ ও উপদেশায়ত ১৮২		শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী—পদযাত্রার পথিকৃৎ মহাপ্রভু	
২১০, ৩৩০.		শ্রীচৈতন্য—৬১, ভারত পরিক্রমায় আচার্য শঙ্কর—৪৬০.	
স্বামী সুকানন্দ—স্বামী প্রণবানন্দ পরিপূর্ণ জীবন প্রসঙ্গে ৪৮,		শ্রীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বকীর্ত্তার উজ্জল ভারতবর্ষ— ৮১	
সম্মুখপ্রচারে স্মৃতিকথা ৩৮২		অধ্যাপক সাধনার ভারতবর্ষ—৪৫২	
স্বামী ত্যাগীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর আদর্শ ও স্বামী		শ্রীমতী গীতানাথ—আত্ম-জিজ্ঞাসা— ৬৭, ১০২, ১৪৭,	
প্রণবানন্দ ৪৩৭		ডাঃ দীপেন রাহা—হরিভক্ত হসেন আলি—৭৫, ভক্ত	
স্বামী কৈবল্যানন্দ—করুণাষণ আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ৪১২		হরিদাস—২২, হিন্দু মেলা ও হিন্দু মিলন-মন্দির—২২৯	
স্বামী শান্তানন্দ—যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর জাতিগঠন		দেবী সরস্বতী—৩২২, ভবিষ্যৎবেত্তা আচার্য	
পরিকল্পনা—৪৩০.		প্রণবানন্দ—৪২৮	
ডঃ বোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী—কালোত্তীর্ণ অমর সংস্কৃত ভাষা ও		ডঃ বলরাম মণ্ডল—কপাল মোচন তীর্থ—৫৭	
সাহিত্য—৮, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোটিলীয় অর্থ-		শ্রীনরনারায়ণ চক্রবর্তী—অক্ষয় তৃতীয়া—৫৪, শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা	
শাস্ত্র—১২২, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ— ৪১০.		প্রসঙ্গে—১১৩, সংসারী জীবের মতিগতি—১৭২	
ডঃ নীতানাথ গোস্বামী—কঠোপনিষৎ—২৬, ১৩৮, ১৭২,		তীর্থযাত্রা-প্রয়াগ—২১৭, উপবাস—৩০৩, গঙ্গাসাগর	
২২৬, ২৬৭, ৩১০, ২৪০, ৩৮৭, ৪৪২		পূণ্যস্থান—৩৪৭	

বিষয় গুষ্ঠা
 শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী—ত্রিবিধ স্বপ্ন—১১৬, শাস্ত্রে
 তুলসী মাহাত্ম্য—১২০
 শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক—কৃষ্ণক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার
 সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ—১০৫, ১৪১, ১৬২, ২১৩, ২২২,
 ৩৩৩, ৩৭২
 শ্রীদ্বিপাল—হতাশা ও তাহার প্রতিকার—১০৮
 শ্রীঅজিত কান্তি সরকার—হে পার্শ্ব সাগরি তুমি আবার
 এসো—১৩২, বর্ষশেষের চিন্তাভাবনা—৪৬৪
 শ্রীগোপাল সেন—ন হস্তি ন নিবধ্যতে—১৩৫
 শ্রীমুকুল নিরোগী—মানস চঞ্চল রাজিহিনে—১৪৭, পথ-
 প্রদর্শক—২১৫
 ডঃ শ্রীহরী কুমার রায়—পরিবার কল্যাণ—১৫১, সংস্কৃতি—
 ৩৪৩, ৩৭৪
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর—রজনীগন্ধা—১৭৩
 শ্রীবাক্সিরাও সেন—দেবতার দীপ হাতে—১৭৬, ৩৩৭, ৪২২
 শ্রীনিখিল রঞ্জন পাল—আত্মবেদ আবার কি—১২২, আত্মবেদ
 চিকিৎসা—২৭২
 শ্রীঅমর প্রসাদ ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীরাসলীলার আধ্যাত্মিক
 তাৎপৰ্য—২২০, ২৫২
 শ্রীহান্স ভাইট্রিক—ভারতে মুসলিম সংখ্যা বিপদ সীমার
 বাইরে—২৩১
 শ্রীঅজিত কুমার মাইতি—হিন্দুধর্মে সৃষ্টিভঙ্গ ৫১
 শ্রীহরিশান্ত সরকার—বাংলা তথা ভারতের গৌরব ১৮৫
 শ্রীমনোমোহন দেবনাথ—গীতোক্ত কর্মবাদ ও আচার্য
 স্বামী প্রণবানন্দ ৪৬৭
 শ্রীমনোরঞ্জন পাল—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ২৬৩
 ডঃ স্বপ্নময় সরকার—হিন্দুভূমি নেপাল ও ভগবান
 পশুপতিনাথ ২২৬
 মহাপাত শ্রীনীলনাথ গাঙ্গ—যুগধি স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁর
 আদর্শ ৪৬৫
 শ্রীবামাপদ ভট্টাচার্য—বিদ্যুৎ কি ? ৩০৮
 শ্রীহিতেশ্বর শইকিরা—ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে ৪৬৮
 শ্রীঅশোক কুমার বসু—তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা ৩৭৯
 শ্রীমতী পারিষদাত আশুভ—গঙ্গাসাগর ৩২০

বিষয় গুষ্ঠা
 অধ্যাপক ভূষার গিরি—স্বামী প্রণবানন্দের হিন্দু চিন্তা :
 ডঃ সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্মানেতা আচার্যদেবর
 প্রশাসন নীতি ৪২৫
 শ্রীহজিত কুমার রায়—অতি নিকটে ৪৫৮

কবিতা

শ্রীহরীর গুপ্ত—অভয় ভেরী—৭, ভরসা—৫০, খেল
 শেষে—২৫, অভিনব লীলা—১২৮, প্রাণগদ্যা—২০
 কাঁদো কেন ?—২৫১, করুণা—৩৩২, শূন্য
 প্রণবানন্দ স্মৃতি—৪১৬, চৈত্র-চিন্তা—৪৬৭
 শ্রীমদন মোহন মুখোপাধ্যায়—
 অভিমান—৭, জননী জন্মভূমি—৩২১
 ডক্টর সত্যেন্দ্র দে—মৃত্যু থেকে অমৃত—১০১
 শ্রীকুলদা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়—স্বার্থের দান—১৪৪
 শ্রীশান্তলীল দাস—জন্মভূমি আমার—২২৪
 শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুপ্ত—শ্রীশ্রী প্রণাম—১৪৪, দাঁও মোট
 শুভদৃষ্টি—২৫১
 শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য—শক্তি সাধনা—৩০৪
 শ্রীশশীক শেখর চক্রবর্তী—প্রাণের কোরক ফুটবে না
 শ্রীঅর্ধা পালিত—রেখা তোমারি চরণপ্রান্তে ৩৭১
 শ্রীজগন্নাথ সামন্তাল—ঝরে আনন্দধারা ৩৭১
 শ্রীমতী মণিদীপা—শ্রুত ৩৭৮
 কুমারী রীণা ভক্ত—হে প্রভু প্রণবানন্দ ৪১২
 শ্রীহর্যাংক ভূষণ নায়ক—প্রিয়তম ১৭৮
 শ্রীঅজিত কান্তি সরকার—নববর্ষের আনন্দে ২০
 জননী জন্মভূমি ৬৬, দাঁও পরিচয় ১১৬
 প্রার্থনা—২৭১, খেলা—২৮৭, করুণা—৩৩৬
 শ্রীমিহির কুমার চট্টোপাধ্যায়—জীবনের সার ৪৫৬

বিবিধ

হিন্দু জগৎ—৩৫৩
 সম্মবাস্তা—৩৪, ৭৬, ১১৭, ১৫৫, ১২৩, ২৩৪, ২৭
 ৩১৪, ৩৫৪, ৩২৩, ৪৩২-৪৭০
 স্বামী পরমাত্মানন্দজীর মহাপ্রাণ—২৩৩
 উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা-আবেদন—২৩৩,

শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচর্য্যম্

শ্রীশ্রী বেদানন্দ

কণ সমাজের দরদী, মরমী, বাধার-বাধী,
উর্ধ্বরেতা, অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন
শ্রীমৎ আচার্য্যাদেবের অমৃতোপম সাধনো-
পায় ও শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র
বালক, যুবক ও ছাত্রছাত্রীগণের অবশ্য

মূল্য—পাঁচ টাকা

জীবন সাধনার পথ

শ্রীশ্রী আত্মানন্দ

দিন জীবনের গতিপথে যে সমস্ত বাধাবিপন্ন
দুঃসাহসে তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে
হইবার জন্য শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট
কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ। বালক
ও ছাত্রছাত্রী, গৃহী-সন্ন্যাসী, দেশসেবক
যে প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই
নিজ নিজ কর্তব্য নির্দ্ধারণে পথের সন্ধান

মূল্য—দশ টাকা

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

মূল্য ৪০ টাকা

ঐ ইংরেজী সংস্করণ :

Essence of Hinduism

Price —Rs. 75/

লিখেছেন—আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন
বিশেষজ্ঞ ও কলিকাতা উচ্চ আদালতের ভূতপূর্ব
মাননীয় বিচারপতি ডঃ দুর্গাদাস বসু, সরস্বতী
প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক
এই গ্রন্থটিতে বিদগ্ধ গ্রন্থকার 'হিন্দুধর্ম কি? হিন্দু-
ধর্মের স্বরূপ ও মর্মবাণী কি?—তা' বহু গাণ্ডীয়
তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিবৃত
করেছেন। জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির
স্বত্বাধিকার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে অর্পণ
করেছেন।

শ্রী শ্রীযুগাচার্য্যাদেব বিষয়ে গবেষণা ধর্মী ও

তথ্যপূর্ণ দুটি অমূল্য গ্রন্থ

সম্পাদনা—শ্রীশ্রী নির্মলানন্দ

আচার্য্য শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ

মূল্য আট টাকা

শতাব্দীর নবজাগরণ ও শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মূল্য এক টাকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০১২

ঐশ্বর্যগাচার্য্য জীবনচরিত

ঐশ্বর্য বামী বেদান্তমতী সম্পাদিত

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের
তপোভক্ত দ্বিষা জীবনের বৈচিত্র্যমূল্য ঘটনা প্রবাহ, তদীয় বর্ননাক্রমে জাতিগঠন তথা ভারত-
সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার নৃত্য থেকে ক্রমবিকাশের দ্বারা সম্বন্ধিত সাবলীল ভাব-
নৃত্যমূলক জীবন-আলোচ্য। অবশেষে মুদ্রিত নবকালেবরে প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠার এই ৪৫ টাকা

ঐশ্বর্যগাচার্য্যের বিস্তারিত প্রবন্ধমালা ও তত্পূর্ণ দ্রষ্ট পুস্তক

মহাত্মীর নবজাগরণ ও আচার্য্য বামী প্রণবানন্দ দ্রষ্ট—৪৫ টাকা PR

আচার্য্য বামী প্রণবানন্দ ও ঐশ্বর্যপ্রণবমঠ দ্রষ্ট—৪৫ টাকা

সঙ্ঘের নূতন গ্রন্থ

শ্রীগুরুসঙ্গ : শ্রীগুরু প্রসঙ্গে

অবশেষে ছাপা

মুদ্রণ বাধাই ৪০.০০

অন্য ৪০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের প্রথম পর্ধ্যায়ের
এগারোটি অধ্যায়ে আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত
আচার্য্যদেবের পুত সঙ্গ লাভের কথা এবং আচার্য্য-
দেবের অমৃত উপদেশাবলী। গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে
আছে সম্বন্ধেতা ঐশ্বর্যগাচার্য্যদেবের মহাজীবনের
উপর লিখিত ৩৮টি স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধ এবং তার সঙ্গে
আছে সঙ্ঘের দীক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও জপবিধি,
শ্রীগুরুপূজারতি প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ক বিবিধ
আলোচনা। প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে আনন্দ
দিবে এবং সঙ্ঘ ও সম্বন্ধেতার দ্বিষা মহাজীবনের
উপর নূতন আলোকপাত করবে।

ঐশ্বর্যগাচার্য্য সঙ্গ ও

উপদেশাবলী

ঐশ্বর্য বামী আচার্য্যমতী রচিত

(তৃতীয় সংস্করণ)

ঐশ্বর্যগাচার্য্যদেবের অন্ততম আবালা
সহচর ও মরনী সঙ্গ-সাধক ঐশ্বর্য বামী
মহাজী তদীয় সাধন-জীবনের উদ্যোগে পা
সঙ্গ-সঙ্ঘের তত্ত্ব সন্নিবেশে এসে যে কিন্নরসিপি
করেছিলেন, আলোচ্য দ্ব্যন্যায় একটি তারই
প্রকাশন। তদন্ত, নূবক ও বিভাব্যদের
জীবন মঠের অমূল্য উপদেশাবলী একটি
হয়ে তাবলম্বীর ও সুখপাঠ্য ভাবার দৃষ্টে

দ্রষ্ট—৪৫ টাকা বাজ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

২১১, হানবিরহাটী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯

ফোন-৪০৫-১৭৮

প্রণব কাণ্ডাচার্য্য : ২১১, হানবিরহাটী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, ফোন : ৪০৫-১৭৮ হইতে বামী ভাষিক

কর্তৃক প্রকাশিত এবং অমূল্য দ্রষ্ট প্রণব, ২১, পট্টাচলোদা মেম, কলিকাতা-১৯ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক—বামী কির্দানন্দ